অবিস্মরণীয়

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র

উৎসর্গপত্র

পরমারাধ্য পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

দেশ বিভাগের ফলে যে সমস্ত অসহায় লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী নির্মম ভাবে নিজেদের জীবন, ধন, মান, সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বই লেখা হ'ল।

গ্রন্থকার

"এসেছে সাম্রাজ্য লোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল ;
বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলি জাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
শূন্য পথে চাই,
আজ তার কোন চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়—সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ বাঁধা পথে
অনল নিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছ তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়া জাল
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্ক লোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"

—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থকারের নিবেদন

অবিস্মরণীয় প্রথম খণ্ড লেখার পর পাঠক পাঠিকা বর্গের কাছ থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে অনুরোধ আসতে আরম্ভ করে। তাঁদের সে ইচ্ছে পূরণের জন্যে দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হ'ল। উৎসাহ দিয়েছেন আমার মাষ্টার মশাই অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযাদু-গোপাল মুখোপাধ্যায়। ভারতের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ যখন শেষ হয়ে এসেছে এবং ইংরেজের কূটনীতির সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা সংগ্রাম করে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, কম্যুনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করছেন সেই সময়ের বিবরণ এ গ্রন্থে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়—কাজেই প্রধান প্রধান ঘটনা গুলি এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সেদিনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের সম্বন্ধে যা' কিছু লিখেছি তার প্রায় সমস্তই মিঃ মশলের The Last days of British Raj, মিঃ এডওয়ার্ডসের The Last years of British India, ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের History of Freedom Movement, মৌলানা আজাদের India Wins Freedom, মিঃ টয়েস রচিত The Leaping Tiger, শ্রীতারিণী শঙ্কর চক্রবর্তীর India in Revolt, আর ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ও History of Congress, Bunch of letters প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এ বিষয়ে আমাকে অক্লান্ত ভাবে সাহায্য করেছেন আমার ছাত্র শ্রীসুহৃৎ গোপাল দত্ত ও শ্রীনিখিল কুমার রায় ও বিপ্লবী বন্ধু শ্রীকালিচরণ ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মল-রঞ্জন মিত্র। প্রচ্ছদ পট এঁকে দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরাসবিহারী

দত্ত ও বইখানি প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন সমবায় প্রেসের কর্মিবৃন্দ। ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন অগ্নি-যুগের বিপ্লবী সাধক শ্রীবিভূতি ভূষণ সরকার।

আজ সে কংগ্রেসও নেই—নেতারাও আজ অনেকেই পরলোকগত, পড়ে আছে শুধু খণ্ডিত ভারত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকেরই চিন্তাধারা আজ ভিন্নমুখী। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের কর্মধারা ও আদর্শের সঙ্গে আজকের দিনের কর্ম পদ্ধতির মিল পাওয়া সম্ভব নয়। পাঠক-পাঠিকাবর্গের কাছে অনুরোধ যেন তাঁরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-বিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানি লেখা হয়েছে বলে মনে না করেন। সে যুগের সংগ্রাম ইতিহাসের নিছক ঘটনাগুলি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই স্বাধীনতা লাভের সময় যে সমস্ত নিরপরাধ অসহায় নরনারী বলি পড়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা। বইখানি স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় কিছুমাত্র সহায়তা করলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

৫৯নং গ্রে ষ্ট্রীট (অরবিন্দ সরণি)
কলিকাতা-৬

নিবেদক—
গ্রন্থকার

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশ উৎপীড়ণের মাঝে কেমন করে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছিল তারই কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে বইখানি লেখা। গ্রন্থকার তাঁর অবিস্মরণীয় প্রথমখণ্ডে ভারতের বিপ্লবীদের দুর্জয় চেতনার ও অপরাজিত বীর্য সম্পদের ইতিহাস লিখেছেন আর দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩৫ সন থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রেরণার ঐতিহাসিক বিবরণ যথাযথ দেবার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত ইসিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থকার তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে উদাসীন শাসকদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন নেতাদের সাধারণের অজ্ঞাত কার্যাবলী সম্বন্ধে সাবলীল ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি যা' বিশ্বাস করেন তা' নিঃসংশয়ে প্রকাশ করেছেন।

সেদিনের সংগ্রামমুখী কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী; কর্মেরও বিরাম ছিল না। সেদিনের নেতাদের প্রায় সকলেই আজ লোকান্তরিত। গ্রন্থকার তাঁদের কাজের ভালো মন্দ দু'টো দিকই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যে ভাবে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ আজ অনেক গ্রন্থেই প্রকাশিত হয়েছে। যে যে গ্রন্থ থেকে সেগুলি সঙ্কলন করা হয়েছে তার তালিকার সঙ্গে পুরানো ইতিহাস গ্রন্থকার সুনিপুনভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় নতুন করে প্রকাশ করেছেন। পুরানো জিনিসকে নতুন রূপ দিয়ে সাজানো লেখকের কৃতিত্ব। দেশে দেশে যুগে যুগে পুরানো সংস্কৃতি, পুরানো আদর্শকে নতুন রূপ দিয়ে চলেছেন মহাপুরুষের দল। সেদিনও পৃথিবীর নবীনতম জাতকে প্রাচীনতম ধর্মের নবীন সন্ন্যাসী ভোগের মধ্যে ত্যাগের মহিমার নতুনরূপ দিয়ে জাগ্রত করে এলেন।

মহাত্মাজী সারা জীবন দু'টি আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন—'অহিংস অসহযোগ' আর 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য'। লেখক দেখিয়েছেন 'দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে' তাঁর সাধনার এ দু'টির কোনটিও যে কোন কারণে হোক্ সফল হয় নি। লেখক মহাত্মাজীর কার্য বিশেষকে দেবতার আসন দিয়েছেন। ইংরেজের কূট-বুদ্ধির কাছে আমাদের নেতাদের বার বার ঘটেছে পরাজয়।

ইংরেজকে বিশ্বাস করতে গিয়ে নেমে এসেছে দেশবাসীর অদৃষ্টে নীরন্ধ্র আঁধার —তারা যে কত রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার শেষ নেই। ইংরেজ তার কূটনীতির খেলায় দেশের নেতাদের বিভ্রান্ত করে অসহায় অবস্থার মধ্যে এনে দেশ ভাগ করে চিরদিনের জন্যে রেখে গেছে বিবাদ ও অশান্তির আগুন— দিয়ে গেছে দুর্ভাগ্যের অশান্ত পরিচয়। অথচ সেদিনের নেতারা লেখকের ভাষায় জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়— ছিলেন অপরিসীম কল্যাণ চিন্তা ও অপ্রতিহত কল্যাণ কর্মের সাধক। সামান্য একটু ভুলের জন্যে কত দুঃসীম যন্ত্রণা, কত অনর্থ—ঘটে গেছে লেখক নির্ভয়ে সেটি প্রকাশ করেছেন। সেদিন ভারতের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবহারের কথাও এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরও আভাস লেখার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেদিনও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ পুরাতন কর্মী প্যারেলাল নিঃসঙ্কোচে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানের কাছে স্বীকার করেছেন "গীতায় যাকে বন্ধু ও সহযোদ্ধার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার মহাপাতক বলা হয়েছে সেই পাতক ভারত স্খালন করতে পারবে না।"

লেখক পরোক্ষভাবে দেখাতে চেয়েছেন "মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তার সমস্ত শক্তি পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রগত কেননা সেটা আত্মারই শক্তি—পরিপূর্ণতাই তার স্বভাব। আধ্যাত্মিক শক্তিই মানুষকে বীর্যদান করে। সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপর জয়লাভ করে। তাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের ঊর্ধে মহীয়ান করে তোলে।" নেতাজীর জীবনে তারই মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠা।

স্বভাবের মূল থেকে উঠে আসে পরস্পর প্রতিবাদশীল চিন্তার ধারা—তার থেকে জন্ম নেয় নতুন চিন্তার নবাঙ্কুর। এই দ্বন্দ্ব প্রগতিই সৃষ্টি করে চলে ইতিহাসের ধারা। অকুণ্ঠ প্রশংসা ও কঠোর সমালোচনার সংঘাতে বইখানি সত্যিই অবিস্মরণীয়। বিশ্বকবির ভাষায় "মহাকালের ধর্ম সমস্ত জিনিস ছেঁকে নেওয়া। তাঁর চালুনির ভেতর দিয়ে যা' ছোট যা' জীর্ণ তা' গলে ধূলোয় পড়ে ধূলো হয়ে যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সব জিনিসই টিকে থাকে যার মধ্যে সকল মানুষই নিজেকে দেখতে পায়। এমনি

করে বাছাই হয়ে যা' থেকে যায় তা' মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন। এ ভাবেই নিত্যকালীন আদর্শ নিজ থেকে সঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আমার কৈশোর ও যৌবনের অনেকখানি সময় কেটেছে আন্দামানের বন্দীশালায়। তখন সব সময়েই কল্পনা করতুম কতদিনে আমার জন্মভূমির পাণ্ডুনীল আকাশে স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়ে আলোয় আলোয় আকাশ ভরে যাবে। তার সেই আলোয় আমার নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্ট গতি শাসন পীড়িত দেশ-বাসীদের নব চেতনার হিরন্ময় ঐশ্বর্যে হবে জাগ্রত-আবির্ভাব। আজ শুধু-মনে হচ্ছে সেদিন সেটা ছিল নিছক কল্পনা মাত্র। ভারতের এ অবস্থা কোনদিন চিন্তা করতে পারি নি। লেখকও একদিন আমারই মত বৈপ্লবিক কর্মধারার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন—তাঁর জীবনের দীর্ঘ প্রহর কেটেছে রাজরোষে কারাভ্যন্তরে। তাই হয়ত অগ্রজ ও অনুজের চিন্তাধারা একই পথে চলেছে। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ যখন আমার উপর এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার ভার দিলেন তখন আমার মনে বাক্যহীন ব্যর্থ বেদনার এই চিন্তাই উঠেছিল—'কি চেয়েছিলুম আর কি পেয়েছি।'

ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। সেদিনের নেতারা আজ জীবিত নেই—তাঁরা নিন্দা স্তুতির বাইরে। প্রতিষ্ঠান গুলিরও কাঠামো ও উদ্দেশ্য আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তাই লেখক বলতে চেয়েছেন যে ঐতিহাসিক ঘটনার ভেতর থেকে নিছক সত্যটির তাৎপর্য তত্ত্বানুসন্ধানী পাঠকদের উপরই নির্ভর করবে।

সেদিনের দেশ নায়কেরা ইংরেজের ঔদার্যের উপর ছিলেন আস্থাবান। সে সহজাত দুর্বলতা ও আত্মগত বিশ্বাসই একদিন তাঁদের কর্মশক্তিকে ব্যাহত করে এনে দিয়েছিল ক্লিষ্ট জীবনের গ্লানি। অতীত দিনের ইতিহাসের জটিল কুটিল আবর্তনের ভেতর থেকে উত্তরসূরীরা যাতে মানুষের নিষ্কলুষ সত্তার মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠা ও দেশের সত্যিকারের ইতিহাসের সন্ধান পায় সেই উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা—সেই প্রয়াসের জন্যে লেখক অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার যোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় এ গ্রন্থ যে বহুলাংশে সাহায্য করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থকারের মত যাঁরা সে যুগের নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখায় অগ্রণী হয়েছেন, আমাদের স্বাধীন সরকার থেকে তাঁদের তথ্যানুসন্ধানের সম্পূর্ণ সুযোগ দিলে ইতিহাসটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে বলে আমার বিশ্বাস। জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতার

বিবর্তন পরিধি শুধু স্থান কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সমস্ত সীমা অতিক্রম করে সে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে চিত্তের ঐশ্বর্যকে চিরদিনের জন্যে উদ্‌ঘাটন করে দেয়। সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য। আজ যা' অপ্রিয় কাল তা' মানুষের হৃদয়গ্রাহী—কোন জিনিসই জীবনের শেষ নিবেদন নয়। সত্যঘটনার বিশদ বিবরণে ও সুললিত ভাষার কমনীয় মাধুর্যে বইখানি সত্যিই অবিস্মরণীয়।

জয় হিন্দ্

১ নং লালবাজার
বাঁকুড়া।
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৬।
৯ই মাঘ, ১৩৭২ সাল।

শ্রীবিভূতি ভূষণ সরকার।

অবিস্মরণীয়

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

মনে পড়ে আজও হারিয়ে যাওয়া অতীতের ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। বিস্মৃতির আবরণের মাঝে আজও তারা অমলিন।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি দুর্গের রুদ্ধ দ্বারে বহুদিন কাটাবার পর ভারতের ভাগ্যবিধাতা একদিন তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন মুমূর্ষু জাতকে শক্তিমান করে তোলবার জন্যে। দেশের শক্তিমানেরাই সেদিন তাঁদের আঙ্গুল কেটে স্বামী বিবেকানন্দের ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল রক্ত-তিলক। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর বজ্রনির্ঘোষ সেদিন এনেছিল জাতির জাগরণের দিন। অন্তরের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, মনের সংকোচ, যুক্তিহীন আচার বিচারের মোহ কাটিয়ে সেদিন দেশ সন্ধান পেয়েছিল নতুন শক্তি উৎসের। শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল দেশের ছেলেরা দুঃখের দুর্গম পথে, দুঃসাধ্য কীর্তিতে, আত্মদান সাধনার মাধ্যমে। জীবনের নতুন জিজ্ঞাসায়, অদৃষ্টের অবজ্ঞাকে অস্বীকার করে ফাঁসি-মঞ্চের জয়গানে দেশ জেগেছিল বন্ধন মুক্তির নতুন আদর্শে। সেই ভয়হীন স্বাতন্ত্র্যের কঠিন বীজমন্ত্র সেই মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর দীপ্তি কি আজ দুর্বল প্রাণের দৈন্য-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে?

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও জাতির কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তখনকার দিনে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের বীর সন্তানেরা অহিংসবাদে বিশ্বাস না করে দিনের পর দিন এগিয়ে যেতে

চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। জাগ্রত চিত্তবৃত্তির অন্তরে তখন নব বিশ্বাসের বসন্ত, সঞ্জীবনী শক্তির ফল্গু ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় এ আন্দোলন ছাড়া অন্য কে উপায় তাঁরা চিন্তা করতে পারেন নি। বিপ্লবী জীবনের সেই মহৈশ্বর্য, মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের সে আত্মদান, সব তুচ্ছতার উর্ধে ধারাবাহী শতাব্দীর অন্তহীন ইতিহাসের পাতায় অনির্বাণ দীপশিখার মত আজও সমুজ্জ্বল। আজও মনে পড়ে সেই সব নাম ধামহীন সংকটময় দুর্গম পথের তরুণ পথিকদের মহৎ ত্যাগের মহত্তর প্রয়াস।

বিপ্লবীদের সে অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি না দিয়েও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রেমের মন্ত্রশক্তি সোনার ফসল ফলাতে পারে নি। দেশের জনগণকে জাগাবার কৃতিত্ব অবশ্য তাঁর আছে। দেশবাসীর সম্মান তিনি পেয়েছেন অকুণ্ঠ ভাষায়, শ্রদ্ধার নৈবেদ্য তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী। মানুষের জন্যে তাঁর প্রেম, দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগ, কল্যাণের জন্যে তাঁর সারা জীবনের প্রয়াস তাঁকে বসিয়েছে দেশের গৌরব সিংহাসনে। তবুও ঘরে ঘরে চরকা ঘোরাবার আশীষ মন্ত্রেও শাসনবদ্ধ দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বরাজ জগন্নাথের রথ দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসে নি।

১৯৩৫ সনে এল ভারত সরকার আইন। সে আইন দেশের লোক গ্রহণ করবে কি না তা' নিয়ে সমস্যা। আপাতঃ দৃষ্টিতে সে আইনে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উদ্দেশ্য ছিল পরিস্ফুট। ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন বিধান আর ছিল ব্রিটিশ সরকারের নতুন ভাবে প্রাদেশিক ভৌগলিক সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা, বিহার ও উড়িষ্যার পৃথকী করণ, সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে ও ব্রহ্মকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা আর প্রাদেশিক দ্বৈতশাসনের অবসান। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে সেদিনের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে

৻ভেদ। গান্ধীজির ইচ্ছে থাকলেও পণ্ডিত মদনমোহন
৴ ও শ্রীঅ্যানে এটা কোন রকমেই মানতে পারলেন না—তাঁরা
গ্রসের ঐতিহ্যমণ্ডিত সুনাম রক্ষে করতে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
শেষ পর্যন্ত নিরুপায় পণ্ডিত মালব্য কংগ্রেস সভাপতির পদ ও
শ্রীঅ্যানে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

দেশের চিন্তাশীল শক্তিমান যুবকেরা তখন বন্দী; সে সুযোগে সাম্প্রদায়িক দলগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠল। উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আরম্ভ করল পরম উৎসাহে সভ্য সংগ্রহ। ১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ পালন করলেন "সাম্প্রদায়িক বিরোধী দিবস"—ঘোষণা করলেন "ভারত কেবল হিন্দুর জন্যে।" (১)

এদিকে যা'হোক করে শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হয়ে যাবে এই মরীচিকালুব্ধ দুরাশায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বেনারস অধিবেশনের প্রস্তাবের শেষে "সম্মতিক্রমে মীমাংসা" কথাটা যোগ করে দিলেন। কিন্তু গান্ধীজি তা' স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন যে সাধারণ মুসলমান সমাজ এতে মত না দিলে বা স্বীকার না করলে তিনি কোন মীমাংসাই মেনে নেবেন না—কংগ্রেসেরও নেওয়া উচিত নয়। একথা বললেন বটে কিন্তু কাজের বেলা ঠিক তা হ'ল না। অনেকের মতে ভারতের জাতীয়তা বোধের ঐক্যের এভাবে অনেক সময় ক্ষতি করা হয়েছে। (২) মালব্যজী আপ্রাণ চেষ্টা করেও তদানীন্তন কংগ্রেস নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন করাতে পারলেন না।

পরে অনেক চেষ্টায় আহ্বান করা হ'ল একটা ঐক্য সম্মেলন। সে অধিবেশনে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় কে

(১) A. Curren—Militant Hinduism in Indian Politics (New york 1951) p 5

(২) R. C. Majumdar—History of Freedom Movement III 536.

কতগুলি আসন পাবে তা নিয়ে প্রায় এক রকম মীমাংসায় তাঁরা পৌঁছুলেন। মুসলমানেরা কেন্দ্রে শতকরা বত্রিশটা আসন মেনে নিতে রাজী হয়েছেন এমন সময় অধিবেশন শেষ হবার ঠিক আগে ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর জানালেন যে মুসলমানরা বত্রিশটা আসনে সম্মত হ'লেও তাদের শতকরা ৩৩'৩টি আসন দিতে হবে। ইংরেজ চিরদিনই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিরোধী। ভারতসচিবের এ আদেশের পেছনে কোন যুক্তি থাক বা না থাক মীমাংসা পণ্ড হয়ে গেল। বাইবেলের ভাষায় "শয়তান সেখানে আসন জুড়ে ভগবানকে দুর্বল বলে বিদ্রূপ করে বসল।" ইংরেজের খাতায় হিসেবের অঙ্কে সেদিন অমুসলমানেরা মস্ত বড় একটা শূন্য।

১৯৩৪ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্দায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হবে স্থির ছিল। তার আগেই ১৭ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজি একটি বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ করলেন তাঁর কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ ত্যাগ করার কথা। অনেক অনুরোধের পর কংগ্রেসের অক্টোবর মাসের সাধারণ অধিবেশন পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত মুলতুবী রাখলেন। অধিবেশনের শেষে সভ্যপদ ত্যাগ করে জীবনের সব চেয়ে গোপন কথাটি প্রকাশ করে বললেন যে তিনি থাকলে কংগ্রেসের অনেক বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল সদস্য তাঁদের স্বাধীন মতামত অসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারবেন না। (১) পণ্ডিত নেহরু প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন যে গান্ধীজি ইচ্ছে করলেও তাঁর কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে পারেন না তাই সভ্যপদ ত্যাগ করছেন। (২) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক সময় দুঃখ করে বলেছিলেন "তাঁর স্বভাব বদলাবার নয়। আমরা কেমন করে গান্ধীজিকে বোঝাব যে তাঁর সে অভ্যেস ত্যাগ করা উচিত।"

(১) Michael Edwardes—The last years of British India 64.
(২) Ibid

মিঃ জিন্নার মত কূটনীতিবিদ হয়ত এই কারণেই কংগ্রেসে থাকতে পারেননি।

মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার ও শ্রীমোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর পিতামহ ছিলেন কাথিয়াবাড়ের এক-সম্প্রদায়-ভুক্ত গুজরাটি হিন্দু। কোন বিশেষ কারণে মিঃ জিন্নার পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে করাচিতে বসবাস করেন। ১৮৭৬ সালে বড়দিনের দিন মিঃ জিন্নার জন্ম। গন্ধীজির মতই অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ। পনের বছর বয়সে তিনি এগার বছরের এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। পরের বছর আইন পড়তে চলে যান লণ্ডন। কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ফিরে এসে সুরু করেন বোম্বাইয়ে আইন ব্যবসা। লণ্ডনে থাকবার সময় তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়। গান্ধীজিও তের বছর বয়সে দশ বছরের বালিকা শ্রীমতী কস্তুরবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের কথায় তিনটি পুত্র কন্যার পর তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের দিকে মনোনিবেশ করেন। (১)

মিঃ জিন্না ত্রিশ বছর বয়সে কংগ্রেসে যোগ দেন তখন তাঁর আইন ব্যবসায়ে বেশ সুনাম হয়েছে। তিনিও গান্ধীজির মত হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। হিন্দু মুসলমানের অনৈক্যের জন্যে দায়ী করতেন ইংরেজকে। ১৯২০ সনে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। তিনি অহিংস অসহযোগ নীতি সমর্থন না করে বললেন আইনসঙ্গত উপায়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম। সে অধিবেশনে কোন মুসলমান কংগ্রেস সদস্য করলেন তাঁর এই মত নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। তিনি পরিহাস করে একটা পুরানো গল্প বললেন যে রক্ষণশীল দলের এক যুবক কার্লটন ক্লাব থেকে এক সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে পিকাডেলী স্কোয়ারে গিয়ে দেখলেন যে সেখানে স্যালভেশন আর্মির একটি সভা

---

(১) M. K. Gandhi—The Story of my Experiment with Truth

হচ্ছে। একজন বক্তা বলছেন যে তাঁর নির্দেশ মত পথে চললে ভগবানকে পাওয়া যাবে। যুবক জিজ্ঞাসা করলেন যে কতদিন তিনি এই মর্মে প্রচার চলাচ্ছেন? উত্তর হ'লো কুড়ি বছর। টোরী যুবক বললেন কুড়ি বছরে মাত্র পিকাডেলী স্কোয়ারে এসে পৌঁছুতে পেরেছেন তবে ত কোন আশাই নেই। সভামণ্ডপে হাসির ধুম পড়ে গেল। (১)

কেউ বললেন মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। গান্ধীজি এ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপভোগ করলেন কোন প্রতিবাদ করলেন না। মিঃ জিন্না ক্ষোভে দুঃখে কংগ্রেস ছাড়লেন। তিনি বুঝলেন যে গান্ধীজি থাকতে তিনি কোনদিনই হিন্দু কংগ্রেসে প্রাধান্য পাবেন না। কিছু দিন পরে তিনি যোগ দিলেন মুসলিম লীগে। কংগ্রেস ও লীগে তখন ব্যক্তি প্রাধান্যই মুখ্য, দেশপ্রেম ছিল গৌণ।

দাম্পত্য জীবনে অসুখা মিঃ জিন্নার প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর তাঁর জীবনে এলেন কংগ্রেস কর্মী এক বিদুষী বাঙ্গালী মহিলা কবি। বহু ইংরেজী কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রেম নিবেদন করলেন কিন্তু মিঃ জিন্না তাঁর শীর্ণ শরীরের মতই নীরস মানুষ, কবিতা মোটে সহ্য করতে পারতেন না। শ্রীমতীর প্রেম ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেল। কিন্তু সে অবহেলিত প্রেমের অব্যক্ত বেদনার ছায়া মিঃ জিন্নাকে চিরদিন ঘিরে রইল। ৪১ বৎসর বয়সে তিনি এক সপ্তদশী সুন্দরী পার্শী বন্ধু কন্যাকে দেখা মাত্র তাঁর প্রেমে পড়লেন। কন্যার মাতাপিতার অমতে তাঁরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ধর্মান্তর ও বিয়ের খবর বের হ'তে কন্যার অভিভাবকেরা জানলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ক্ষমা করলেন কন্যাকে কিন্তু জামাতাকে কোন দিনই ক্ষমা করতে পারলেন না। শ্রীমতী রুটেন পেটিটেরও দাম্পত্য জীবনের শাপমোচন হ'ল না কোন দিনই। একটি কন্যার জন্মের পর শ্রীমতী

(১) Hector Bolitho—Jinnah.

রুটেন জিন্নার বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি অর্ধরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। তিনি স্বামী সংস্রব ত্যাগ করে শিশু কন্যা নিয়ে বাস করতে লাগলেন বোম্বাইয়ের অভিজাত তাজমহল হোটেলে। পরে বাপমার সঙ্গে গেলেন লণ্ডন। মিঃ জিন্নাও প্রিভি কাউন্সেলে আইন ব্যবসা করবেন বলে গেলেন সেখানে। ভাঙ্গা কাঁচ কিন্তু জোড়া লাগল না। প্যারিসে শ্রীমতী জিন্না আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন—ছুটে গেলেন মিঃ জিন্না। সে যাত্রা জীবন রক্ষে হ'ল কিন্তু নিষ্করুণ সংসারে সর্বনাশা প্রেম রাহুগ্রস্তই রয়ে গেল। শ্রীমতী রুটেন হয়ত বুঝেছিলেন যে বাপমায়ের অন্তর বেদনা ও অভিশাপের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেমে কল্যাণ নেই, মঙ্গল নেই। নৈরাশ্যে ধুলিধূসর অন্তর ও বিড়ম্বিত নিরানন্দ জীবন নিয়ে ফিরে এলেন আবার তাজমহল হোটেলে। মিঃ জিন্না রয়ে গেলেন কিছু দিনের জন্য লণ্ডনে। ১৯২৮ সনের একদিন খবর পাওয়া গেল যে শ্রীমতী জিন্নার দুঃখময় জীবনের অবসান হয়েছে। মিঃ জিন্নার মতই তাঁর মৃত্যুর কারণ আজও অজ্ঞাত। (১)

মিঃ জিন্না তাঁর ভগিনী কুমারী ফতিমার কাছেই বাকি জীবনটা কাটালেন। রুক্ষ স্বভাব ও বদরাগী বলে তাঁর যে দুর্নাম ছিল তার জন্যে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবন হয়ত অনেকটা দায়ী। মুসলিম লীগের তখন অত্যন্ত দুরবস্থা। মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বিবাহের পর মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে যখন লণ্ডনে তখন তিনি মিঃ জিন্নাকে লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাকে শক্তিশালী করে তোলবার অনুরোধ করেন। মিঃ জিন্না ভারতে তখনকার লীগের সঠিক অবস্থা জেনে মিঃ লিয়াকৎ আলিকে খবর দিতে বললেন। মিঃ লিয়াকৎ বোম্বাইয়ে ফিরে এসে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে শুধু "আসুন" বলে তার. করলেন। ফিরে এলেন মিঃ জিন্না। গান্ধীজির কর্তৃত্ব ও লোকপ্রিয়তা নষ্ট করবার

(১) Leonard Mosley—The last days of the British Raj—65-68

উদ্যম ও উদ্দেশ্য নিয়ে বসলেন লীগের কর্ণধার হ'য়ে। (১) অনেকের মতে মিঃ জিন্নার মত লোক কংগ্রেসে থাকলে আজ ভারতবর্ষের চেহারা অন্য রকম হ'ত। কারণ যাই হোক্ গান্ধীজি কিন্তু সভ্যপদ ত্যাগ করেও কংগ্রেস ছাড়লেন না। বরং নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতায় সব সময় সতর্ক ও সচেষ্ট হয়ে রইলেন যেন কোনমতে বামপন্থী কর্মীরা বা অন্য কেউ কংগ্রেসে প্রাধান্য না পায়।

অন্য দিকে এ সময় বামপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে একে একে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ১৯৩৫ সনের এপ্রিল মাসে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। পরে তারা কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে একযোগে কাজে নেমে পড়ল। তখন ছোট ছোট আরও অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে তার মোট সংখ্যা প্রায় ২৪৮। (২)

১৯৩৫ সনের প্রথম দিকে ফিরোজাবাদে সরকারের গোপন চেষ্টায় বেধে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—১৯৩১ সনে কানপুরের অশান্তির চেয়েও এর তীব্রতা অনেক বেশী। সাম্প্রদায়িক কাল ভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প মনুষ্যত্বের যে কতদূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটাতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। ডাঃ জীবরাম নামে এক নিরীহ ভদ্রলোক সপরিবারে জীবন্ত দগ্ধ হলেন। চলল ধর্মের নামে অন্তহীন চক্রপথে মানুষের অন্ধ হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডব নৃত্য। ইসলামের অপমান করা হয়েছে এই অজুহাতে আবদুল কোয়ায়েম নামে জনৈক মুসলমান একজন হিন্দুকে খুন করায় তার প্রাণদণ্ড হয়। তার মৃত-দেহ নিয়ে শোভাযাত্রার সময় ১৯৩৫ সনের ১৯শে মার্চ করাচিতে অশান্তি আরম্ভ হ'য়ে যায়। ২৯শে জুন লাহোর শহীদগঞ্জে গুরুদ্বার নিয়ে হাঙ্গামা বেধে ক্রমে উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে

(১) Leonard Mosley—The last days of the British Raj 65—68
(২) V. V. Balabushevich—A Contemporary History of India. p. 304

পড়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্ধপথে আত্মকলহ ও অপঘাত মৃত্যু পরাধীন দেশের ভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধু সংকল্পের শীর্ণ কঙ্কালে আকীর্ণ করে দিল। সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজ্রাহত দৈত্যের মত কেঁদে উঠল আর্তস্বরে। সে আত্মঘাতী কলঙ্কের জন্যে দায়ী শাসক, শুধু শাসিত নয়। এদেশে শাসয়িতা ও শাসিত চিরকালই পরস্পর অসংলগ্ন।

১৯৩৬ সনের এপ্রিলমাসে লক্ষ্ণৌএ পণ্ডিত নেহরু সোসালিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বললেন "অর্থনীতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদই পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।" কংগ্রেস সভাপতির সে বক্তৃতা অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। তখন রাশিয়ায় সাম্যবাদের আদর্শে নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। সেই নব চেতনার মাঝে পণ্ডিত নেহরু দেখলেন যুগ যুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা কেমন করে মানুষের মধ্যে মিশে গেছে। মানুষের পরিচয়ের সিংহদ্বার বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে চিরদিনই উন্মুক্ত। সেখান থেকে তাদের আশা আকাঙ্খার নিত্য নতুন অমৃতধারা অবাধে বয়ে চলেছে পরিপূর্ণতার পথে মহৎ সার্থকতার দিকে। পণ্ডিত নেহরু সেদিন এই নতুন ভাবধারার উন্মেষে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হয়ত সেই অনুপ্রেরণায় তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীনরেন্দ্র দেও ও শ্রীঅচ্যুত পট্টবর্ধনকে সদস্য হিসেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের প্রাধান্যে পণ্ডিত নেহরু কিছুই করতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত তিনি অভাবিত ব্যর্থতার বেদনা ও ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে নতি স্বীকার করে বসলেন গান্ধীজির কাছে। ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বাম পন্থীদের অনেকেই আশা করেছিলেন যে সভাপতি রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসকে সেই পথেই চালিত করবার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু দেখা গেল লক্ষ্ণৌএর সেই

নেহরু তখন সবরমতি স্কুলের পাঠ শেষ করেছেন আর তাঁকে সে মূর্তিতে দেখা গেল না। কোথায় গেল তাঁর সে কথা যে ধর্মবিশ্বাসের সামিল সমাজতন্ত্রবাদের বলিষ্ঠ নীতি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তিনি তাঁর আভিজাতিক অভিভাষণে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের মত পরোক্ষ ভাবে জানালেন তাঁর মত অন্য। (১) এরই নাম নতুন জীবনের নতুন সামঞ্জস্য। কোথায় গেল "কোথায় ভারত" Whither India র প্রবন্ধ—কোথায় গেল তাঁর ১৯৩৩ সনের ১৮ই ডিসেম্বরের বক্তৃতা যে তিনি কম্যুনিজিমের আদর্শে একান্ত বিশ্বাসী। একদিন দেশের তরুণেরা তাঁকে ইংরেজ আভিজাত্যের কার্বণ কপি বলে জানতেন—। তাঁর এ কথা শুনে প্রথমে তাঁদের বিস্ময় জেগেছিল আবার এই নতুন পরিবর্তনে তাঁরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। জীবন তখনই বড় কাজ যখন সেই জীবনকে ছাড়িয়ে উপরে ওঠে।

১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইনকে তখন সকল দলই বিমাতৃ সুলভ চোখে দেখছিলেন। কেউ কেউ বললেন দাসত্ব আইন, আর একদল বললেন পরাধীনতার নতুন সনদ। (২) ইংরেজ বোঝাল এটা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের পূর্বাবস্থা। বামপন্থীরা তখন কাজে নেমে পড়েছেন। সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৩৬ সনের মোট ১৫৭টি ধর্মঘট হ'য়ে গেল। বাংলার পাটকলগুলিতে হ'ল কয়েকবার অবস্থান ধর্মঘট। মাদ্রাজ, বিহার, যুক্ত প্রদেশে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের শ্রমিক ও কর্মীরা ধর্মঘট করে তাদের দাবী স্বীকার করিয়ে নিল। (৩) ডিসেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে ১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইন বর্জন ও কিষাণদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবী প্রস্তাবাকারে গৃহীত হ'ল। (৪)

(১) History of Congress II—6
(২) Edwardes p. 64
(৩) Bombay Labour Gazette June, 1939
(৪) N. G. Ranga Kishan Handbook (Madras) p. 28

১৯৩৬ সনের ২৩শে আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রচার করলেন তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহার। তাতে ছিল ভূমি আইন সংস্কার, শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি, স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার, অস্পৃশ্যতা বর্জন, কুটির শিল্পের উন্নতি, রাজবন্দীদের মুক্তি, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান আরও অনেক বড় বড় গালভরা কল্যাণের কথা।

মিঃ জিন্না ১৯৩৫ সনের ভারত আইনে লক্ষ্য করলেন বর্ণ হিন্দুর প্রাধান্য। ভোট নির্বাচনের আগে মিঃ জিন্না দেখলেন যে মুসলিম লীগ বাদে আরও অনেকগুলি দল মুসলমানদের স্বার্থের জন্যে দাবি জানিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পাঞ্জাবে মিঞা ফজল-ই-হোসেনের নেতৃত্বে ইউনিয়নিষ্ট দল, বাংলায় মৌলভী ফজলুল হকের কৃষক প্রজাদল, যুক্ত প্রদেশে ছত্রীর নবাবের কৃষকদল নির্বাচনে অবতীর্ণ। বিহারের সৈয়দ আবদুল আজিজ, সিন্ধুতে স্যার আব্দুল্লা হারুণ, ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের লাল কোর্তা দলের নেতা খান আব্দুল গফুর খাঁ, মিঃ জিন্নার সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। কাজেই ১৯৩৭ সনের ২রা মে মিঃ জিন্না নিজে গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য সমস্যার সমাধানের জন্যে। পর্বত এল না, কাজেই আসতে হ'ল মহম্মদকে। আলোচনা চলতে লাগল। মিঃ জিন্না কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের লীগের আওতায় আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এক বছরের মধ্যে সফলও হলেন কিছু পরিমাণে। পণ্ডিত নেহরু যেমন বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ বেমালুম ভুলেছিলেন মিঃ জিন্নাও তেমনি ১৯৩৮ সনে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের অনুরোধের কথা ভুলে গেলেন। এ সাময়িক বিস্মরণ বোধ হয় রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি ১৯৩৮ সনের ২রা আগষ্ট শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জানিয়ে দিলেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্যে কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করবে তাতে যেন কোন মুসলমান সদস্য না থাকে।

১৯৩৭ সনের নির্বাচনের ফলে দেখা গেল যে মাত্র কয়েকটা প্রদেশে মুসলমান সদস্যেরা প্রাধান্য পেয়েছে। ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭১৫টি আসন পেয়েছে। (১) কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে পণ্ডিত নেহরু প্রথমে বলেছিলেন যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মত মারাত্মক ভুল কংগ্রেসের আর হবে না। মন্ত্রিত্ব নেওয়া মানে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করা। যাই হোক্ তিনি শেষে বললেন যে ভোট নির্বাচনের আগে কোন রকম বিবৃতি সরকারি ভাবে দেওয়া হবে না। তবে মন্ত্রিত্ব না-নেওয়া মানে এই নয় যে ভোট নির্বাচন বয়কট করা। ভোট শেষে দেখা গেল যে কংগ্রেস অনেকগুলি প্রদেশে আশাতীত ভাবে ভোট পেয়েছে এমন কি মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও। মুসলমানদের ৪৮২টি আসনের মধ্যে লীগ ১২৩টি আসন পেয়েছে।

তখন গান্ধীজি প্রকারান্তরে রাঁচি অধিবেশনের প্রস্তাব মত জানালেন যে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব নেওয়া উচিত। তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ সদস্য একমত হয়ে বললেন মন্ত্রিত্ব না নিলে ইংরেজের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে হবে। ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নেবে দেশকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দেবার জন্যে—১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইনকে কার্য্যকরী করবার জন্যে নয়। দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণই কংগ্রেসের লক্ষ্য। তবে মন্ত্রিত্ব নেবার আগে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ কোন কিছুতে নামঞ্জুর করার ক্ষমতা ভিটো প্রয়োগ করতে পারবেন না। (২)

মিঃ জিন্না কয়েকটা প্রদেশে মুসলমান সদস্যের প্রাধান্য দেখে ও কয়েকজন কংগ্রেস-বিরোধী সিভিলিয়ানের গোপন ইঙ্গিতে ১৯৩৫

(১) R. Palme Dutt—India to-day 484

(২) Edwardes p 65

সনের ভারত সরকার আইন মেনে নিলেন। তখনকার কংগ্রেস নেতারা বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু বাদে অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিত্ব নিয়ে বসলেন। গান্ধীজির নির্দেশ মত লোক গণনা বয়কট করার বিষময় ফল জুটল বাংলা ও পাঞ্জাবের অদৃষ্টে। মিঃ জিন্না বুঝলেন যে লীগের উপর তখন মুসলমানদের তত আস্থা নেই।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একদিকে যেমন জেদী অন্য দিকে তেমনি 'লৌহমানব' বলে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড গঠন করে কৌশলে সকলকে তার প্রাধান্য স্বীকার করিয়ে নিলেন। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়েও তাঁরা পারলেন না দেশকে কল্যাণের পথে বেশী দূর এগিয়ে দিতে। জাতীয় জীবনের উন্নতির প্রধান সোপান যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তার বিধান তাঁদের কাছে কোন প্রাধান্যই পেল না। আগের মতই তা' শূন্য গর্ভ সান্ত্বনা বাক্যের মূঢ়তার ভারে অকিঞ্চিৎকর রয়ে গেল। সুযোগ সুবিধে পেয়েও নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি মত কোন গঠন মূলক কাজ তাঁরা করতে পারলেন না।

তার আসল কারণ সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না আর প্রতিকাজেই ছিল স্বার্থ সংঘাতের সম্ভাবনা। কৃষিকার্যের সংস্কার বা কৃষকদের কল্যাণের জন্যে আইন প্রণয়ন জমিদারদের স্বার্থের পরিপন্থী। শ্রমিকদের সমাজিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি শিল্পপতিদের স্বার্থের বিরোধী—আর এই জমিদার ও শিল্পপতিরাই কংগ্রেসের স্তম্ভ। মোমবাতির দু'দিকে আলো একসঙ্গে জ্বালানো চলে না। তাই কংগ্রেস শাসনে বিশেষ কোন উন্নতির চিহ্ন না দেখে দেশের জনসাধারণ নিরানন্দের জড়ভার আশাহীন অকর্মণ্যতার দুঃখে কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। এক কথায় সেদিন কংগ্রেস-নেতারা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে রইলেন—দেশ গৌণ হয়ে গেল। 'মেদের যেখানে প্রাচুর্য মজ্জার সেখানে দৌর্বল্য।' তাঁরা মন্ত্রিত্ব নিয়ে কোথায়

দেশকে জ্ঞানে. বুদ্ধিতে, প্রেমে, কর্মে, ত্যাগে সমৃদ্ধ করে তুলবেন, তাঁরা তা' না করে ডুবে রইলেন ক্লিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝে। সুষমার পরিবর্তে এনে দিলেন আকার আয়তনহীন কুশ্রীতার জঞ্জাল। দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধা থেকে রক্ষে করতে পারলেন না। তারা আগের মতই মলিন জরাজীর্ণ হয়ে রইল। বন্ধুর দুর্গম জীবন ক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে লজ্জিত ভগ্নাবশেষ ভারতবাসীরা আবার অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের সৌভাগ্যের আশায় দিন কাটাতে লাগল। কংগ্রেসের স্বল্পস্থায়ী মন্ত্রিত্বের মধ্যে আগামী ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লক্ষ্য করবার বা সে বিষয়ে চিন্তা করবার নেতাদের অবসর ছিল না। তাঁরা ভুলে গেলেন যে ভারতবাসী দরিদ্র ও দুর্বল, তারা বিভক্ত, বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র। তাদের উন্নত করার দায়িত্ব তাঁদেরই।

তাঁরা একটু চেষ্টা করলেই হয়ত বাংলা দেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারতেন। মৌলভী ফজলুল হক্ ও তাঁর কৃষক-প্রজা-দল রাজি ছিলেন তাতে হয়ত সাম্প্রাদায়িক সমস্যার অনেকটা সমাধান হ'ত। কিন্তু কংগ্রেসের লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে সে দিকটা অস্পষ্ট রয়ে গেল। একই ভাবে কংগ্রেস-প্রধান যুক্তপ্রদেশে পুরাতন কংগ্রেস কর্মী চৌধুরী খালিকুজ্জমান ও নবাব ইসমাইল খাঁকে অনায়াসে মন্ত্রিসভায় নেওয়া যেতে পারত কিন্তু পণ্ডিত নেহরু মন্ত্রি-সভায় একজনের বেশী মুসলমানকে স্থান দিতে কোন মতেই রাজী হলেন না। (১)

মিঃ জিন্না কংগ্রেসের প্রতি কাজ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি দেখলেন যে কংগ্রেস মুসলমানদের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনেও রাজী নয় তখন তিনি প্রচার আরম্ভ করলেন যে কংগ্রেস ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না। পণ্ডিত নেহরু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উত্তেজনার অমোঘ অন্ধ অহংকারে বললেন যে ভারতে মাত্র দু'টি দল একটি কংগ্রেস ও অন্যটি গভর্ণমেন্ট বাকি সকলে শুধু

(১) Hiren Mukherjee—The Gentle Colossus p 97

তাদের অনুগামী। (১) এ কথার পিছনে শুধু তিক্ততা বাড়ানো ছাড়া কোন যুক্তি ছিল না। এ দম্ভোক্তি শুনে মিঃ জিন্না শুধু হাসলেন। সে বাঁকা হাসির পিছনে অনেকখানি ব্যঙ্গ মেশানো ছিল। অনেকের মতে পণ্ডিত নেহরুর রাজনীতি জ্ঞানের মতই হিন্দু মুসলমান সমস্যার কোন বাস্তব জ্ঞান ছিল না। (২)

এ সময় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ থেকে ফিরলেন। তিনি দেখলেন যে কংগ্রেসের সমস্ত কিছুর পিছনে গান্ধীজির অদৃশ্য হাত কাজ করছে। তিনি সভ্য না হয়েও কংগ্রেসের একনায়ক ডিক্টেটর। কংগ্রেস বলতে গান্ধীজি ছাড়া আর কিছু নয়। (৩) গান্ধীজির সভ্যপদ ত্যাগ করার পিছনের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। পণ্ডিত নেহরুর গান্ধীজির কাছে নতি স্বীকারে, নিজের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বিসর্জনে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। অহিংস কর্মীদের মানসিক দারিদ্র্যের এ চরম দুর্গতি তখন তাঁর কাছে অসহ্য। কংগ্রেসের বামপন্থীদের নিয়ে আরম্ভ করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী শক্তিশালী দল গঠনের চেষ্টা। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কর্মের মধ্যেই মানুষের বিরাট আত্মপ্রকাশ, তাব নিরন্তর আত্ম-নিবেদন—জীবনের চরম সাধনা। তিনি আরও দেখলেন যে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের পিছনে গান্ধীজির ইচ্ছেই কাজ করছে। বিদেশে থাকার সময় ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি আলাপ আলোচনা করেছেন ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষিদের সঙ্গে। রোমা রোঁলা করেছেন তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা। আলোচনার মাধ্যমে তাঁর স্পষ্ট অনুভূতি হয়েছে যে প্রতিটি মানুষের উপর ভগবান সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপন করেছেন —তাই মানুষের ব্রত এত কঠিন। স্বার্থের গণ্ডীটুকুর মধ্যে থেকে তার কোনমতেই নিষ্কৃতি নেই। "বিশ্ব মানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের

(১) Majumdar III P 563 : Mukherjee P 97
(২) Ibid (৩) Nehru on Gandhi P 78

সাধনা, কর্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের ভেতর নিজেকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এই জন্যেই মানুষের এত ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসংবরণ। যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে এ নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।" ঋষির সান্নিধ্যে সেদিন তাঁর হৃদয় তীর্থ সমৃদ্ধ। জীবনের সমস্ত রুদ্রতা তখন প্রসন্নতায় দীপ্যমান। সেখানের কোন বাধাই তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি।

সর্দার বিঠল ভাই প্যাটেল তাঁর উইলে বিদেশে প্রচারকার্যের জন্য সুভাষ বাবুর নামে দান করেছিলেন এক লক্ষ টাকা। যে কোন কারণেই হোক্ সে টাকা তিনি পান নি। কেউই আশা করেনি যে এ উইল নিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আইনের মোকাবিলায় টাকা না দেবার চেষ্টা করবেন। টাকা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ইউরোপ থেকে ফেরবার কয়েকদিনের মধ্যেই আবার তাঁকে কিছুদিনের জন্য বন্দী থাকতে হ'ল। যখন মুক্তি পেলেন তখন দেখলেন যে বামপন্থীদের কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভেতরের কোন পরিবর্তন হয় নি। দক্ষিণ-পন্থী পরিচালিত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড সকলের উপর যথেচ্ছ কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

পণ্ডিত নেহরুর জন্ম ১৮৮৯ সালে এলাহাবাদে। পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি। বাল্যকালে পণ্ডিত নেহরুর সংস্কৃত বা হিন্দীতে কোন মেধা না দেখে পণ্ডিত মতিলাল পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষাতেই মানুষ করবেন বলে স্থির করলেন। আজীবন ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত পণ্ডিত জহরলালের তাই শিক্ষা ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে। মিঃ জিন্নার মত পনর বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হ'ল ইংলণ্ডে—হ্যারো স্কুলে পড়বার জন্তে। সেখান থেকে এলেন কেমব্রিজ। ১৯১২ সনে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরলেন। তিনি তখন পুরাদস্তুর ইংরেজ বনে গেছেন—চাল চলন কথাবার্তা আচার

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—পৃ ১৬

শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ—পৃ ১৮

ব্যবহারে দেখা গেল তিনি যেন ভারতের লোক নন—। লোকে বলল ইংরেজ আভিজাত্যের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। বাপ চাইলেন ছেলে ব্যারিষ্টার হিসেবে লোকবরেণ্য হোক্, কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হ'ল না। পণ্ডিত নেহরু আইন ব্যবসায়ে মোটেই সুবিধে করতে পারলেন না। ১৯১৬ সালে তিনি শ্রীমতী কমলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি সস্ত্রীক সিমলেয় ছিলেন। তাঁর হোটেলে সে সময় আফগান ডেলিগেশনের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে ইংরেজ সরকার শান্তি ও সন্ধির সর্তাদি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ইংরেজ সরকার পণ্ডিত নেহরুর সে হোটেলে থাকা পছন্দ করলেন না। পণ্ডিত নেহরু তখন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের হোমরুল লীগের সদস্য। একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এসে তাঁকে বললেন যে এ হোটেলে থাকতে গেলে তাঁকে একটা মুছলেখা দিতে হবে যে তিনি আফগান ডেলিগেশনের সঙ্গে দেখা করবেন না বা পরোক্ষভাবে কোন আলোচনা চালাবেন না। তিনি রাজী হলেন না কাজেই চার ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সিমলে ছেড়ে যাবার হুকুম হ'ল।

ট্রেনে ফেরবার সময় তিনজন ইংরেজ অফিসার তাঁর কামরায় ছিলেন। তাঁরা জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তার মধ্যে একজন বললেন "This will teach the bloody browns a lesson" রাগে দুঃখে অপমানে তিনি সেদিন থেকে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এক বছরের মধ্যেই তাঁর একবার কারাদণ্ড হ'ল।

১৯২৩ সনে নাভারাজ্যে একটা গোলমালের তদন্ত করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ধরা পড়ে জেলে যান। তাঁদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাধারণ কয়েদীর মত রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। জেলের যে ঘরে তাঁদের রাখা হ'ল সে ঘর শুধু অন্ধকার নয় সেখানে বড় বড় ইঁদুরের গর্ত। পরের দিন ইংরেজ রেসিডেন্ট

দেখা করে তাঁদের বললেন যে সর্বসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে। তাঁরা রাজী হলেন না—কাজেই বিচারে ১৮ মাসের জেল হ'ল—ইংরেজ রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশে বসে বিচারের প্রহসন দেখে দণ্ড মকুব করে তাঁদের নাভারাজ্য থেকে বের করে দিলেন। সে সময় পণ্ডিত নেহরুর ইংরেজ প্রীতিতে কিছু দিনের জন্যে ভাটা পড়ল। তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বটে কিন্তু অন্তরে অকৃত্রিম ইংরেজ প্রীতি থেকেই গেল (১)

মিঃ নরীম্যান ছিলেন সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় বহুদিনের নির্য্যাতিত কংগ্রেস কর্মী। তিনি বহুদিন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও ছিলেন। গান্ধীজি যখন লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আবেদন করেছিলেন তখন মিঃ নরীম্যান তাতে মত দিতে পারেন নি। পুণা কনফারেন্সে ১২ই জুলাই প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন "সাক্ষাৎ না মৃত্যু ?"

১৭ই জুলাই বড়লাটও সে আবেদন নামঞ্জুর করলেন। কিন্তু মিঃ নরীম্যানের সেই ঔদ্ধত্য ও নির্ভীক সমালোচনাই এনে দিল তাঁকে সর্বনাশের নৈরাশ্য। গান্ধীজির সমালোচনা তখনকার কংগ্রেসকর্মীরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর সম্ভ্রমে আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ নরীম্যানের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ও অদ্ভুত অসঙ্গত ভাবে তাঁকে বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী না করে মিঃ বি. জি. খেরকে প্রধান মন্ত্রী করলেন। মিঃ নরীম্যান আশা করেছিলেন যে পণ্ডিত নেহেরু মুখে নিজেকে সব সময় নীচতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে বলে গর্ব করেন তিনি হয়ত এর সুবিচার করবেন। হায়রে, অন্ধ প্রত্যাশা! এদিকে মুসলমানেরা প্রচার আরম্ভ করলেন যে মিঃ নরীম্যান পার্শি আর মিঃ খের হিন্দু, তাই মিঃ নরীম্যানের মন্ত্রিত্ব জুটল না—কংগ্রেস হিন্দুর সংস্থা। পণ্ডিত নেহেরুর কাছে কোন প্রতিকার না পেয়ে মিঃ নরীম্যান গান্ধীজির কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু যাঁর

(১) Mosley P. 78

জন্যে এ শাস্তির ব্যবস্থা তিনি কিছুই করলেন না। কর্তৃত্বের অন্ধ অহমিকার কাছে ন্যায়শাস্ত্রের অকাট্য যুক্তি চিরদিনই দুঃসহ স্পর্দ্ধা। মৌলানা আজাদও এ অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলেন না। মর্ম্মদহন দুঃখ শিখায় ও অনুকম্পাহীন ঔদাসীন্যে মিঃ নরীম্যানের বহুদিনের রাজনৈতিক জীবন-সাধনা ছিন্নমূল গাছের মত স্বার্থপরতার নির্দয় বন্যার মুখে ভেসে গেল। (১)

এর কিছুদিন আগে থেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা লক্ষ্য করছিলেন যে কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থীদের জন্যে বামপন্থীরা বা কংগ্রেস বিরোধীরা কিছুই সুবিধে করতে পারছে না। তখন তাঁরা নিজেরাও কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। কাজেই পার্টির নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন যে তাঁরা আস্তে আস্তে কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়বেন—তাদের নীতি পালনের জন্যে নয় কংগ্রেসকে ভেতর থেকে ভাঙবার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রথমে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে হাত মেলালেন। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি নিঃসন্দেহে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গঠন করলেন একটা যুক্ত ফ্রণ্ট। প্রবর্তিত হ'ল নতুন নিয়ম। স্থির হ'ল কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একযোগে কাজ করবে। সরকার তখন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছে। কাজেই কর্ম্মীরা ছদ্ম উপায়ে কাজে নেমে পড়লেন। এই ছদ্ম পরিচয়ে অনেকেই কংগ্রেসের সভ্য হয়ে গেলেন। ১৯৩৭ সনে লক্ষ্ণৌ এগ্রিমেণ্ট' নামে একটা চুক্তিও হয়ে গেল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীর দোষে কতকগুলো গোপন কাগজ পত্র প্রকাশ হয়ে পড়ল। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির নেতারা বুঝলেন কম্যুনিষ্টদের আসল উদ্দেশ্য। ১৯৩৮ সনের নির্বাচনের সময় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রস্তাব করলেন যে কমুনিস্টদের মাত্র এক তৃতীয়াংশ আসন দেওয়া হবে। আরম্ভ হ'ল মতভেদ—দু'বছর

(১) Azad—India wins freedom P. 85

পরে যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে গেল। কেবল অন্ধ্র, তামিলনাদ ও কেরালায় কম্যুনিস্টরা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখলেন।

মিঃ নরীম্যানের সঙ্গে সেদিনের কংগ্রেসের ব্যবহারে ও বিচারে মিঃ জিন্না শুধু মর্মাহত নয় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন যদি কোন দিন ফেডারেশন হয় ত কেন্দ্রের ক্ষমতা এমনি করেই কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড অপপ্রয়োগ করবে। কাজেই মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকমে সহযোগিতার সম্পর্ক রাখতে সম্মত হলেন না। এমনি করেই সেদিনের কংগ্রেস নেতারা করলেন পাকিস্তান সৃষ্টির সহায়তা। আর জীবন-দেউলে-করা নতুন নতুন বিধি নিষেধের আড়ালে ব্রিটিশ শাসন তন্ত্রের গুরুভার বোঝা জগদ্দল পাথরের মত দেশের বুকের উপর চেপে বসে গেল।

গান্ধীজি ১৯২৮ সন থেকে সুভাষ বাবুকে দেখে এসেছেন সন্দেহের চোখে। সুভাষ বাবুর মত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ কংগ্রেসের বামপন্থীদের আয়ত্বে এনে আপোষহীন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবেন এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তখন কংগ্রেসই বড়, দেশের কল্যাণ কিছু নয়। গান্ধীজি কংগ্রেসের এ অন্তর্বিরোধের সমাধানের উপায় হিসেবে স্থির করলেন যে সুভাষবাবুকে সভাপতি করলে হয়ত তিনি তাঁকে আপন ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এনে পণ্ডিত নেহরুর মত তাঁর মত পরিবর্তন করাতে পারবেন। তাঁর চেষ্টা যে কোন কারণেই হোক সফল হ'ল না। তিনি বুঝলেন যে মানুষের যথার্থ রূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তি সম্পন্ন প্রকৃতিতে—রাজনীতির দাবা খেলায় নয়। মনই মানুষের সম্পদ। ছোট্ট একটি বীজের মধ্যে অলক্ষ্যে যে জীবনটুকু ধুক ধুক করে, উদ্ধত ঐশ্বর্যের প্রাচীর বিদীর্ণ করে সারা দুনিয়াকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে অসংশয়ে নিয়ে আসে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তিই তাকে এনে দেয় সৃষ্টিশীল কর্মচেতনার আলো, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকার, সহজাত প্রবৃত্তির অপরিহার্য আহ্বান।

দুই

গান্ধীজির নির্দেশমত ১৯৩৮ সনের ১৮ই জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন যে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৩৭ সনে কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয় নি। কিছুদিন পরেই গান্ধীজি বুঝলেন যে সুভাষ বাবুকে আয়ত্বে আনা ততটা সহজসাধ্য নয়। দু'জনের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য অনেক। আরম্ভ হ'য়ে গেল বদ্ধমূল ব্যাধির মত কংগ্রেস নেতাদের গোপন হস্তের নির্মম ইঙ্গিত। কাজ করতে গিয়ে তিনি অহেতুক সন্দেহ ও অশোভন প্রতিকূলতার মুখে বাধা পেতে লাগলেন পদে পদে। কিন্তু সুভাষ বাবুর বিরাট কর্মপ্রতিভা ও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্যকে তখন তেমন ভাবে ক্ষুণ্ণ করতে পারল না। তাঁর অন্তরে তখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যাহ্ন সূর্যালোক।

১৯৩৮ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে বিঠল নগরে তিনি নির্ভয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করে দেশের লোককে আপোষহীন সংগ্রামের জন্যে তৈরী হবার আহ্বান জানালেন। বললেন ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোন পক্ষ হতে পারে না, ব্রিটিশের স্বার্থের জন্যে ভারতীয় লোকবল ও সম্পদ শোষণ করতে দেশবাসী দেবে না। আজও মনে পড়ে মহাকালের মঙ্গল শঙ্খ নির্ঘোষের মত সেদিনের সেই দৃপ্ত ভাষণ "ক্ষমতার লোভে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত দুর্নীতি ও দুর্বলতা এসেছে, নির্মমভাবে তার মূলোচ্ছেদ করবার জন্যে আমাদের উপায় নির্ধারণ করতে হবে। ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে।"

তখন বাংলার বিপ্লবীরা একে একে মুক্তি পাচ্ছেন। সে সময় অবশ্য তাঁদের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে।

গণবিপ্লবের বিপুল সম্ভাবনার আশায় তখন তাঁরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের নীতি বা সাম্প্রদায়িক দলগুলির কর্মপদ্ধতিতে তাঁরা আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। কংগ্রেসের অসহযোগ তাঁদের কাছে দুর্বলের ব্যর্থ বিলাপ, অহিংসা শক্তিহীনতার অনুকৃতি। তাই তাঁদের অনেকেই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। বাংলার এই নির্ভীক তরুণেরা তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তি স্বরূপ হয়ে উঠলেন। যাঁরা যোগ দিলেন না তাঁরা লক্ষ্য করতে লাগলেন ভারতের রাজনীতি কোন্ পথে চলেছে। মন ও মতের দিক থেকে তাঁরা সেদিন কোন দলের সঙ্গে মিলতে পারলেন না। যাঁরা একেবারে বিপ্লবের আদর্শ ত্যাগ করলেন তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিলেন। প্রাক্তন বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা হয়ে উঠলেন। এদিকে বহুদিনের দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে কৃষকদের অবস্থা তখন চরমে। ম্লান চেতনার আবর্জনা কাটিয়ে তখন তারা আস্তে আস্তে দলবদ্ধ হ'য়ে আরম্ভ করেছে গ্রামাঞ্চলে অন্দোলন। পদে পদে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ আরম্ভ হ'তে লাগল—অবাঞ্ছিত শঙ্কার ভয়াবহ বিকাশ। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীরা এ সুযোগে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন।

এ সময়ে বোম্বাইয়ে ঘটে গেল একটা অপ্রাতিকর ঘটনা। কংগ্রেস সরকার শ্রমিক ধর্মঘটিদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দিল। সুভাষবাবু এ মর্মান্তিক বীভৎসতা সমর্থন করতে পারলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে অশান্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল। কংগ্রেসের অপকীর্তিকে ঢেকে জনমতকে অন্য পথে দিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজি রাজকোটে অনশন আরম্ভ করে বসলেন প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গাওয়ারের 'রোয়েদাদের' অপেক্ষায়। অনেকে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করে সন্দেহ করলেন যে এ কাজ ১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইনকে কার্যকরী করার পরোক্ষ চেষ্টা। এই আইনের

ফেডারেল অংশটা কংগ্রেসই স্বীকার না করে সংগ্রাম চালাবে বলে স্থির করেছিল—গান্ধীজি পরোক্ষ ভাবে তার অন্তেষ্টিক্রিয়া করে দিলেন। (১) বোম্বাইয়ের ঘটনার আর কোন প্রাধান্য রইল না।

কাথিয়াবাড়ে ১৪৩টি ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে রাজকোটও একটি ছোট রাজ্য—লোকসংখ্যা ৮০০০০ মাত্র। সেখানে রাজার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা "প্রজা পরিষদ" নামে এক সমিতি গঠন করে ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে ৩০০০০ কিষাণের এক সম্মেলনে দেশ গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী জানালেন। রাজকোটের রাজা এ ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে যখন স্বীকৃত হয়েছেন তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চাপে বাধ্য হয়ে রাজা সে প্রতিশ্রুতি পালনের অক্ষমতা জানালেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারের জন্যে দায়ী করলেন রাজার দেওয়ান শ্রীবীরওয়ালাকে, তাঁকে পদচ্যুত ক'রে তাঁর জায়গায় আনা হ'ল এক ব্যারিস্টার—নাম মিঃ প্যাট্রিক ক্যাডেল।

১৯৩৯ সনের ২৫শে জানুয়ারী সর্দার প্যাটেল আরম্ভ করালেন রাজকোটে আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজি বড়লাটকে লিখলেন যে রাজকোটের রাজার কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিমত কাজ করাই উচিত। কিন্তু বড়লাট সে অনুরোধ রক্ষে করলেন না। গান্ধীজি এর প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করামাত্র সারা ভারতে দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দু'চারটা সর্ত মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। (২) বোম্বাইয়ের গুলিচালনার তদন্ত অতলে তলিয়ে গেল।

সুভাষবাবু বুঝলেন যে দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেস নিয়েই ব্যস্ত দেশের জন-সাধারণ বা কৃষক শ্রমিকরা এঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে। তিনি সেই বছরই ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ ও কৃষকদের উন্নতির মাধ্যমে কৃষিকার্যের উন্নয়ন পরিকল্পনার

(১) Mukherjee—The Gentle Colossus 76
(২) Pratap dt. 19. 3. 39

চেষ্টা করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ কাজেই তার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতিও দেশের মঙ্গলের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু গান্ধীজি সে বিষয়ে একমত হলেন না, বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠল। তবুও সুভাষ বাবু বার বার দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে তৈরী হতে বললেন। পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেসের এ আভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে দূরে থাকবার জন্যে এ সময় কিছুদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ভ্রমণে। এটা সংগ্রামের আসন্ন প্রস্তুতি না সঙ্কট এড়াবার উপায় লোকে তাই চিন্তা করতে লাগল।

বামপন্থীদের মধ্যে কিষাণ সভা ও ছাত্র ফেডারেশন তখন বিশেষ অগ্রণী। ১৯৩৮ সনের ১০ই জানুয়ারী 'কিষাণ দাবী দিবস' পালিত হবার পর মার্চ মাসে ৮০,০০০ কিষাণ পদব্রজে লক্ষ্ণৌ পৌঁছুলেন তাঁদের দাবী যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রিকে জানাবার জন্যে। অন্ধ্র, কেরালা, বোম্বাই, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুরূপ ভাবে কিষাণ আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। তাদের দাবী—জমির খাজনা কমানো ও জমি সংক্রান্ত আইনের সংশোধন। কিষাণ সভার উত্তরোত্তর প্রাধান্য দেখে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা এদের বিরোধিতা করবার জন্যে কতকগুলি সমিতি গঠন করলেন তার মধ্যে "ক্ষেত মজদুর সভা"ই প্রধান। কিন্তু তবুও ১৯৩৮ সনে সর্বভারতীয় কিষাণ সভার সদস্য সংখ্যা ৬০০,০০০ ও সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যসংখ্যা লক্ষাধিকে পৌছুল। (১)

বিদেশ যাবার আগে পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজির পরামর্শমত একবার গেলেন মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপোষের চেষ্টায়। মিঃ জিন্না তাঁর ১৯২৯ সনের চোদ্দ দফার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে কংগ্রেস লীগের প্রস্তাব গুলোর উপর কোন গুরুত্বই দেয় না। তিনি নতুন করে জানালেন যে কংগ্রেস পতাকা ও বন্দেমাতরম্ গান ভারতের

(১) N. G. Ranga—Kishan Handbook 83-84

মুসলমানদের ধর্মবিরোধী, তাতে তাদের ঘোর আপত্তি আছে। গান্ধীজির কানে কথাটা আসামাত্র তার প্রতিকার স্বরূপ হ'য়ে গেল বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ। বঙ্কিম চন্দ্র জীবিত থাকলে কি মনে করতেন জানি না। এত তোষামোদেও কংগ্রেস লীগকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। তাদের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এসে পৌঁছুল গল্পের সেই পিকাডেলী সার্কাস পর্যন্তই। মিঃ জিন্নার সহযোগিতা মিলল না। তাঁর এক কথা -যে কংগ্রেস সমস্ত দেশের প্রতিনিধি নয় এবং গান্ধীজির হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য নীতি ও অসহযোগ এ দু'টো কোন দিনই ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারবে না।

মিঃ জিন্না গান্ধীজির দুর্বলতা খুব ভাল করেই জানতেন। তাই কংগ্রেসের তোষণ নীতির সুযোগ নিয়েই ১৯৩৮ সনের ২০শে মার্চ মুসলমানদের উপর কংগ্রেস সরকার কেমন অন্যায় অত্যাচার করেছে তার তদন্তের জন্যে একটা কমিটি গঠন করলেন। পিতাপুরের রাজা সে কমিটির চেয়ারম্যান। ১৫ই নভেম্বর সেই কমিটি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে প্রকাশ করলেন অত্যাচারের এক বিরাট তালিকা। চৌধুরী খালিকুজ্জমান ও নবাব ইসমাইল খাঁ পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে মনে মনে হাসলেন। যেদিন এদের দুজনকে মন্ত্রি সভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেদিন কংগ্রেসের মধ্যে এমন একজনও বিচক্ষণ লোক ছিলেন না যিনি পণ্ডিত নেহরুকে এর বিষময় ফলটা দেখিয়ে দিয়ে বলতে পারেন যে এর নাম হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য নয়। বাংলায় ফজলুল হক্‌ও এই সুযোগে "কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুর্দ্দশা" (১) নাম দিয়ে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। শুধু তাই নয় সেই সব পুস্তিকার ইংরেজী তর্জমা করে মিঃ জিন্না ইউরোপের দেশ বিদেশের রাষ্ট্রবিদদের কাছে প্রচারের জন্যে পাঠালেন।

কংগ্রেস এ দোষারোপ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উত্তর দিয়ে প্রাদেশিক গভর্ণরদের উপর এর তদন্তের ভার দিল। তখন কিন্তু লীগ

(১) Majumdar-III 571

ভারতের বাইরে তাদের প্রচার আরম্ভ করে দিয়েছে। গভর্ণরেরা অবশ্য এ অভিযোগ মিথ্যা বললেন এবং যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর স্যার হেগ্ প্রমাণ করলেন যে এটি শুধু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন নয় সম্পূর্ণ বিদ্বেষ প্রসূত। মৌলানা আজাদ এই মিথ্যা অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা করলেন কিন্তু কংগ্রেসের বক্তব্য ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। বাইরে কংগ্রেসের দুর্ণাম রটিয়ে লীগ কার্যোদ্ধাব করল। সর্দার বিঠলভাইয়ের দূরদর্শিতা ছিল তাই তিনি লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস উইলকারীর সে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বানচাল করে দিয়েছিল—তখনকার কংগ্রেস নেতারা ভারতেব বাইরে প্রচারের কোন গুরুত্ব দেননি—তার শোচনীয় ফল এখন পেলেন। রাজনীতির চালে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সেদিনের মোহমুগ্ধ আত্মস্থ কংগ্রেস নেতারা সমকক্ষ হ'তে পারলেন না।

অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করেও মিঃ জিন্নাকে থামানো গেল না। তিনি এই মিথ্যেকে সম্বল করেই রাজনীতির জুয়াখেলায় দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদেব কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলেন। দেখালেন যে রাজনীতি বড়লোকের ছেলের ভাবালুতা নয়। তবে এটা ঠিক যে মিথ্যের আশ্রয়ে ও অদ্ভুত নৈতিক শৈথিল্যে যার জন্ম তার আয়ু ক্ষণস্থায়ী—আজকের লীগের অবস্থা তার প্রমাণ।

সেদিনের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ লোক দেখানো লীগকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলেন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল পণ্ডিত নেহরুর অবস্থা দেখে তখন দ্বিধাগ্রস্ত। এ সময়ে কংগ্রেসের এ নীতির বিরুদ্ধে সুভাষবাবু আবার সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তিনি বুঝেছিলেন যে কংগ্রেসকে ঠিক পথে চালিত না করলে আবার সেই কাপুরুষতার পুঞ্জীভূত সর্বনাশ আপোষ-নৈপুণ্য-নাট্যের পুনরাভিনয় হবে। তাঁর কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা তখন দেশবাসীর মন বহুলাংশে জয় করেছে। গান্ধীজি এ জিনিস ভাল

চোখে দেখলেন না। পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজিকে বলতেন "কংগ্রেসের চিরস্থায়ী উচ্চ সভাপতি "Permanent Super President of Congress" (১) গান্ধীজি তাঁর মনোনীত প্রার্থী অন্ধ্রের দক্ষিণ পন্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে দাঁড় করিয়ে সুভাষবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আপন আদর্শ, কর্তব্য বোধ ও দেশ-প্রেম তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সুভাষবাবু জানতেন শত্রুতা বরং শ্রেয়, তবু অন্যায় সহ্য করা ভয়ানক কাপুরুষতার লক্ষণ। ১৯৩৯ সনের ১৯শে জানুয়ারী নির্বাচনে সুভাষবাবু ১৫৮০ আর পট্টভি মাত্র ১৩৭৫ ভোট পেলেন। গান্ধীজি আর সহ্য করতে পারলেন না—বলে বসলেন "সীতারামিয়ার পরাজয়ের চেয়ে আমারই পরাজয় বেশী।" (২) অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে অন্তর্জ্বালার উত্তেজনায় স্বদেশের মঙ্গল সাধনের সিংহাসনে বসে মহাত্মার স্মরণীয় দিনের অম্লান অবিস্মরণীয় বাণী। গান্ধীজির এ শালীনতাহীন উক্তি শুনে দেশের মনীষিরা হতবাক্ হয়ে গেলেন। অনেকে ভাবলেন যে এবার গান্ধীজি কংগ্রেস ছাড়বেন কিন্তু তিনি কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে পারলেন না।

১৯৩৯ সনের ১০ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসে অসুস্থ সভাপতির সঙ্গে সেদিনের অহিংসবাদিরা যে ব্যবহার করলেন সে আলোচনা না করাই ভাল। এ কলঙ্ক কংগ্রেসের ইতিহাসে নিত্যকালের সাক্ষ্য—ভাবীকালের উত্তরাধিকার। দেশের লোক এ আক্রমণাত্মক ঘৃণার মনোভাবকে কলুষের আবর্জনার মত মোটেই ভাল চোখে দেখল না। নীচতার সীমা নেই—সেদিনের নেতৃবৃন্দের হীন অপচেষ্টা ও মানসিক দারিদ্র্যের মালিন্য যাঁরা দেখিয়েছিলেন তাঁরাই তখন কংগ্রেসের স্তম্ভ। শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য

(১) Nehru on Gandi 78

(২) D. G. Tendulkar—Life of Mohondas Karamchand Gandhi Vol. V. P, 39

মনোনয়নের নতুন প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাব পাশ হ'ল যে এর পর থেকে সভাপতির ইচ্ছেয় নয়, একমাত্র গান্ধীজির ইচ্ছানুসারে ওয়াকিং কমিটির সভ্য মনোনয়ন হবে। এর মূলে ছিল অবিশ্বাস, অসংযম, অধৈর্য, অশ্রদ্ধা ও অহংকার। পণ্ডিত নেহরু ত গণতন্ত্রের মস্ত বড় পাণ্ডা ছিলেন—তিনি মুখে বললেন এটা অন্যায় কিন্তু কাজের বেলা চুপ করে থাকলেন। আর যারা চিরদিনই গোপনে ইংরেজকে সাহায্য করে এসেছে এমন কি শোনা যায় যে শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ ও শ্রীভগৎ সিং এর মৃত্যু ও ফাঁসির জন্যে যাঁদের দু'একজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দায়ী সেই সব বঞ্চিত দুঃস্থ ভীরুরাই তখন কংগ্রেসের মন্ত্রণাদাতা। পণ্ডিত নেহরু ইচ্ছে করলে এ বিরোধের সমাধান করতে পারতেন কিন্তু মনে বুঝেও ভয়ে কাজে কিছু করতে পারলেন না। ভয়ই কাপুরুষতার লক্ষণ। কঠিন বীর্য নির্ভীক সুভাষবাবু আপন কর্তব্যবোধে গান্ধীজির বিরুদ্ধে যেতেও পশ্চাৎ-পদ হন নি। অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে আত্মাভিমানকে একান্ত করে তোলবার লোক তিনি ছিলেন না। পণ্ডিত নেহরুর জীবনের এ কলঙ্ক রাজনীতির স্বার্থ-নিষ্ঠুর আবর্জনার মত চিরদিনের জন্যে রয়ে গেল। (১) মানুষকেই প্রমাণ করতে হয় যে সে মহৎ। মাটিকে হাজার পোড়ালেও আঘাত সহ্য করবার শক্তি তার নেই—ইস্পাত সব অবস্থাতেই সব রকম আঘাত সহ্য করতে পারে।

পন্থজীর এ প্রস্তাবে গণতন্ত্রের পাণ্ডাদের অনেকেই বিস্মিত হলেন। গান্ধীজিও বুঝলেন তাই লজ্জার খাতিরে তিনি কোন নাম দিলেন না। বাধ্য হয়ে সভাপতি নিজের বিবেচনা মত সভ্য মনোনয়ন করলেন। তার মধ্যে বারজন অর্থাৎ মনোনীত সভ্যগণের শতকরা ৮০ জন পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। অনেকেই বললেন সভাপতিকে অপদস্থ করবার জন্যেই পন্থজী এ প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন। আবার কেউ-কেউ বললেন পন্থজীর এ পাটোয়ারী

(১) A Bunch of Old Letters 358-59

বুদ্ধিটা ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে দেশ অনেকদূর এগিয়ে যেত। বাকি সকলে পন্থজীকে ধন্য ধন্য করলেন। সেদিনও হয়ত ভগৎ সিং-এর ক্ষুধার্ত আত্মার নিঃশব্দ কান্না, মরু নীরস অভিশাপ ও প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার অব্যক্ত বেদনা আর একবার শূন্যে মিলিয়ে গেল। দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতার হ'ল জয়।

সুভাষবাবু বুঝলেন কংগ্রেসের দুঃসহ অবস্থা। তখন কংগ্রেস অনুষ্ঠান-সর্বস্ব নিষ্ফল রাজনৈতিক ঠাঠ ছাড়া আর কিছু নয় বলে অনেকেরই ধারণা। অনেকেই বুঝলেন যে দক্ষিণপন্থীরা আপোষের নতুন আর্জি ইংরেজদের দরবারে পেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কংগ্রেস স্যোসালিষ্ট পার্টি এ সময় নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে পারল না। অসামঞ্জস্যের পীড়ন সুভাষবাবুর পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠল। বাধাহীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতা এনে দেয় তখনই হয় সব চেয়ে সংকটের কারণ। সেদিনের দক্ষিণপন্থীরা অন্ধ অহংকারে অসহযোগ আরম্ভ করলেন, তবে সেটা ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে। যারা শক্তিমান তারা চিরস্থায়ী অধিকার কায়েম রাখবার জন্যেই ব্যস্ত। মুখে এক, কাজে অন্য পণ্ডিত নেহেরু চুপ করে থাকলেন। হায়রে ঈর্ষা-দগ্ধ-স্বার্থ-গৃধ্নু দলীয় চক্র। কিন্তু রাজনীতি চিরদিন ক্ষমাহীন, নির্মম, নিষ্ঠুর। শেষ পর্যন্ত অসহযোগেরই জয় হ'ল। ১৯৩৯ সনের ২৯শে এপ্রিল সুভাষবাবু পদত্যাগ করলেন। সেদিন কংগ্রেসের এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যিনি এই অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতিকার করতে পারেন। তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবার জন্যে কোন অনুরোধ এল না। দেশের সেই দুর্দিনের পত্রাদির আদান প্রদান কংগ্রেসের ইতিহাসে দূরপনেয় আবর্জনার মত বিশ্বগ্রাসী অহমিকার চিরকালের সাক্ষী হয়ে রয়ে গেল। রিপু অন্ধ—সে অতি-প্রত্যক্ষ বর্তমানকেই বড়ো করে দেখে, নিগূঢ় অনাগতকে উপেক্ষা করে চলে।

পদত্যাগ পত্র দাখিলের পর অহিংসবাদিরা গান্ধীজির জয়ধ্বনি

করলেন। শুধু তাই নয় তাঁকে কংগ্রেসের একনায়ক ডিক্টেটার বলে তাঁরা গণতন্ত্রের শেষকৃত্য করে তার বদলে আনলেন জঘন্য একনায়ক-তন্ত্র। পরিণামে কংগ্রেসের কাঠামো যে গণতান্ত্রিক নয়, এটা একটা হিটলারী ব্যবস্থা এ সমালোচনা কংগ্রেসকে অনেকদিন শুনতে হ'ল। মিঃ জিন্না শুধু কংগ্রেসের ও পণ্ডিত নেহরুর কার্য্যকলাপ দেখে হাসলেন।

"চাতুরি হচ্ছে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম। চাতুরির দ্বারা যে নীতি চালিত সে নীতি বন্ধ্যা।" গান্ধীজি এক সময়ে মিঃ জিন্নাকে খুসী করবার জন্যে তাঁকে সাদা চেক blank cheque দিতে রাজী ছিলেন। সেদিন মিঃ জিন্নার মুখের কোন পরিবর্তন হয় নি। তিনি গান্ধীজিকে খুব ভাল করে চিনতেন গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন "চেক নয় আমার সেই চোদ্দ দফা।" বিরাট ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত অসহায় গান্ধীজিকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এদিকে সুভাষবাবুর পদত্যাগের পর পণ্ডিত নেহরু বলে বসলেন "সুভাষ ফ্যাসিষ্ট।" উত্তরে সুভাষ বাবু বললেন "যদি ফ্যাসিষ্ট বলতে হিটলার, মহান্ হিটলার বা ক্ষুদে হিটলার বোঝায় তা হ'লে সে রকম অনেক লোকই কংগ্রেস দক্ষিণ-পন্থীদের মাঝে পাওয়া যাবে।" (১) সুভাষবাবুর দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা আসন্ন হয়ে এসেছে। এ সুযোগ আর হয়ত কোনদিনই আসবে না। এ সুবিধে দেশের লোকের ছাড়া উচিত নয়।

১৯৩৯ সনের ২৫শে আগষ্ট স্বাক্ষরিত হ'ল রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। সুভাষবাবু বুঝলেন যুদ্ধ আসন্ন। তিনি আপোষ-হীন সংগ্রামের পথে জনমত গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন। দেশের লোকের বুঝতে বাকি রইল না যে তাঁর নেতৃত্ব অভ্রান্ত। তিনি চেয়েছিলেন সেই সব দৃঢ় সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিপ্লবীদের যাঁরা দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। কিন্তু তখন তাঁদের অনেকেই

(১) Michael Edwardes—The Last year of British India p 67.

কম্যুনিস্ট পার্টিতে কাজে নেমে পড়েছেন। একদিকে ইংরেজ অন্য দিকে কংগ্রেস—তাঁর ঘরে বাইরে শত্রু তবুও তিনি নির্ভীক। তিনি গড়ে তুললেন ফরওয়ার্ড ব্লক। বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা তখনও কোন দলে যোগ দেন নি তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন। কংগ্রেস নেতারা সুযোগ খুঁজছিলেন এ সুযোগে তাঁরা দলীয় রাজনীতির মোহে তাঁকে তিন বছরের জন্যে বিতাড়িত করলেন। ক্ষমতার কি নির্মম অপব্যয়? বাংলার রাজনৈতিক নাট্যশালার নেপথ্যবিধান ঘরে তাঁরা অভিষেক করলেন এড্ হক্ কমিটি—বিক্রমের চটকদার আস্ফালন। সুধী সমাজ ব্যঙ্গ করে তার নাম দিলেন ঢক্ ঢক্ কমিটি। কিন্তু সুভাষ বাবুর ত কর্মের বিরাম ছিল না। তিনি একটার পর একটা আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ আন্দোলনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নারায়ণগঞ্জে ছাত্রনেতা শ্রীজ্যোতির্ময় ভৌমিক ও ঢাকায় সূত্রাপুর থানায় শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস প্রাণ দিলেন।

তখন ভারত সরকার কৃষক ও শ্রমিক সংঘের উপর চণ্ডনীতি চালাচ্ছে। পাঞ্জাব ও বিহারে দলে দলে শ্রমিক ও কৃষকনেতারা বন্দী হলেন। বোম্বাইয়ের গিরনি কামগড় ইউনিয়নের সমস্ত কর্মীরাই কারাবরণ করলেন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মীরা তখন আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছেন। ১৯৩৪ সনে যখন বামপন্থীদের অনেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী তখন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেও ও শ্রীঅশোক মেটার চেষ্টায় জন্ম হয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির। ১৯৩৪ সনের অক্টোবর মাসের বোম্বাই অধিবেশনে পার্টির নীতি ও কর্মপরিষদ গড়ে ওঠে। তাঁরা স্থির করেন যে কংগ্রেসের ভেতর থেকে সমাজতন্ত্রবাদী হিসেবে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাবেন। (১)

(1) V. V. Balabushevich—A Contemporary History of India p294-95

এ সময় শ্রীমাসানি, শ্রীপট্টবর্ধন, শ্রীঅশোক মেহতা ও শ্রীরামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ কর্মীরা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। তার ফলে পাঞ্জাব যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্যদের অনেকেই দল ছেড়ে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। (১) শেষে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি, শ্রীএম. এন. রায় পরিচালিত র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস লীগ ও সর্বভারতীয় কিষাণ সভার সমন্বয়ে একটি বামপন্থী যুক্ত কমিটি গঠিত হ'ল। (২) তাঁরা কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট পরিচালিত নীতি অনুমোদন করলেন না।

১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। নাৎসী ব্লিৎস বাহিনী চলল একটার পর একটা দেশ জয় করে। একে একে পোলাণ্ড, ডানজিগ হ'ল হের হিটলারের করায়ত্ব। জার্মান সাবমেরিণের আক্রমণে ব্রিটিশের যুদ্ধ জাহাজ একে একে জলের তলায় নিল আশ্রয়। গান্ধীজি মানস চোখে ইংরেজের শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করে চোখের জল ফেললেন—শেষ পর্যন্ত একটা করুণ বিবৃতিও দিলেন। ইংরেজের সে দুর্দিনে ইংরেজ প্রেমে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। কিন্তু সে সুযোগে পরাধীন ও দরিদ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের কোন পথই তিনি বা সেদিনের কংগ্রেস নেতারা চিন্তা করতে পারলেন না। বিশ্বাস পরায়ণ ঔদার্যে বেমালুম ভুলে গেলেন হরিপুরা অধিবেশনের কংগ্রেস প্রস্তাব যে আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত ইংরেজকে কোন রকম সাহায্য করবে না। কোথায় গেল তাঁর সে সংকল্পের বন্ধন—নির্মোহ মনের সে গৌরব আহ্বান ?

তখন ভারতের শিল্পপতিদের সঙ্গে বিটিশ বণিকদের স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারতের শিল্পোন্নতি ইংরেজ বণিকদের

(1) V. V. Balabushevich—A Contemporary History of India p 344:45
(2) Ibid

সেসময় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। ১৯৩৭ সনের মে মাসে ২১টি দেশের চুক্তিমত ভারত সরকার সব রকম প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নিয়ম করল যে ভারত একমাত্র ব্রহ্মদেশ ছাড়া আব কোথাও চিনি রপ্তানি করতে পারবে না। (১) তবুও দেশে দিন দিন যৌথ কারবার গড়ে উঠতে লাগল। ভারতীয় বণিকেরা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদ করলেন। ইংরেজ বুদ্ধিমান জাত তারা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে দেশীয় শিল্প-পতিদের সহযোগিতায় ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। দেশীয় নৃপতিবর্গের অনেকেই সেদিন ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। তখন দেশের শিল্পপতি, রাজন্যবর্গ ও ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতির দিক থেকে এ সহযোগিতার মূল্য অনেক বেশী। সঙ্গে সঙ্গে দেশের আমানতের শতকরা ৬৬ ভাগ ভারতের পাঁচটি বড় বড় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গেল। (২)

ভারতের বড়লাট ঘোষণা করলেন যে আইনের চোখে ভারতবর্ষ জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বড়লাট হিসেবে সে কথা বলার তাঁর অধিকার ছিল। একে একে পাশ করান হ'ল অনেকগুলি অর্ডিন্যান্স। গভর্ণমেণ্ট এর কাছে তাদের ভারত সম্বন্ধে মনোভাব স্পষ্ট করে জানতে চাইল কংগ্রেস। মিঃ জিন্না তখন প্রচার আরম্ভ করেছেন যে লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি। কাজেই তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে যেন কোন রকমের ব্যবস্থা না করা হয়। ইংরেজ চিরদিনের ধূর্ত জাত। তারা বলে বসল যে যুদ্ধের পর ১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইনের অনেক রদ বদল করা হবে—সুবিধে দেওয়া হবে ভারতকে অনেক কিছু বিষয়ে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বললেন যে বড়লাটের মন্ত্রণা সভায় ভারতের

(1) Balabushevich - 280

(2) B. C. Ghose—A study of Indian money market London 1934—109.

দলগুলির প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সেই সভাই পরে প্রণয়ন করবে দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান।

এই ভুয়ো আশ্বাসে কংগ্রেস রাজী হতে পারল না। সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীরা ১৯৩৯ সনের ২৭শে অক্টোবর থেকে একে একে পদত্যাগ করলেন—কেবল মুসলিম লীগ গদি আঁকড়ে রইল। মিঃ জিন্না বুঝতেন যে দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথই হ'ল আসল পথ। ভারতের বিপ্লবীরা ও কংগ্রেস অর্ধ শতাব্দী ধরে নির্যাতন সহ্য করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যা পাবে তিনি তাঁর বুদ্ধি ও প্রচারের জোরে কোন রকম নির্যাতন বা কষ্ট সহ্য না করে ইংরেজের দয়ায় তার চেয়ে কোন অংশে কম পাবেন না। তাঁর কথা আর কাজে অবশ্য শেষ পর্যন্ত পার্থক্য ছিল না। তিনি জানতেন যে মুসলিম লীগ ইংরেজের সাহায্যে ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় সৃষ্টি হয়েছে কাজেই তার দাবী মেটাবার ভার ইংরেজের। যেদিন কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন সেদিন মিঃ জিন্না বক্র বাকচাতুর্যের আনন্দে বললেন "আজ মুক্তির দিন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবার দিন।"

তখন সুভাষবাবু ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সভাপতি ও পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবিশের সহ-সভাপতি। তাঁরা স্থির করলেন বাংলায় কিষাণদের উন্নতির জন্যে আরম্ভ করা হবে সত্যাগ্রহ। কংগ্রেস করল এর বিরোধিতা। ফরওয়ার্ড ব্লক ৯ই জুলাই প্রতিবাদ দিবস পালন করে অক্টোবর মাসে নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করল। যুদ্ধের আগে ভারতে বৎসরে অনুমান ১,৫০০,০০০ থেকে ২,০০০,০০০ টন খাদ্যশস্য আমদানি হ'ত। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে আমদানির হার অনেক পরিমাণে কমিয়ে ফেলা হ'ল। আরম্ভ হয়ে গেল ভারতবর্ষ থেকে দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে লোক নেওয়া। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী বাদেও দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা ও চীনা সৈন্যদের ভারতে মোতায়েন রাখা হ'ল আর

ভারতবর্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশের জন্যে সৈন্য ও খাদ্যশস্য রপ্তানি আরম্ভ হয়ে গেল। ফরওয়ার্ড ব্লক এই সৈন্য সংগ্রহ ও খাদ্যশস্য রপ্তানির প্রতিবাদ জানাতে চাইল কিন্তু কংগ্রেস দেখাল অসৌজন্য।

এই অবসরে গান্ধীজি ২২শে জুলাই হিটলারকে একখানা পত্র লিখে বোঝাতে চাইলেন শান্তির বাণী ও অহিংসার মাহাত্ম্য। লিখলেন অস্ত্রবলে ইউরোপ জয় করায় কোন গৌরব নেই—তাঁকে দিলেন আধ্যাত্মিক শক্তিতে দেশ জয়ের পরামর্শ। মূঢ় দাম্ভিক হিটলার সে কথা শুনলেন না। ইংরেজদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন দু'খানা খোলা চিঠি—বললেন অস্ত্রবলে হিটলারকে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। বাধা দেওয়া উচিত ঐশ্বরিক শক্তি ও অহিংস পদ্ধতিতে। এ উপদেশের তাৎপর্য বোঝবার মত লোক তখন ইংলণ্ড বা জার্মানীতে ছিল না। সত্য যুগে সেটা হয়ত সম্ভব হ'ত কিন্তু এ যুগে যে হাস্যকর তা' গান্ধীজি স্বীকার করলেন না। কোন উত্তর না পেয়ে গান্ধীজি ছুটলেন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোব কাছে। বললেন সেই একই কথা, বোঝালেন সত্য, অহিংসা ও প্রেমের শাশ্বতবাণী। তাঁব এই উপদেশামৃত বর্ষণে বড়লাট বিস্মিত, স্তম্ভিত, বিমূঢ়, হতচেতন ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন—কি বলবেন কথা খুঁজে পেলেন না। তাঁর দেশের সেই সঙ্কটময় দারুণ দুর্দিনে গান্ধীজির একথা উপহাস না সত্যিকারের মনোভাব সেটা বড়লাট বুঝে উঠতে পারলেন না। ভুলে গেলেন সাধারণ শিষ্টাচার। (১) ভুলে গেলেন যে ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবিদ্যার পীঠস্থান।

গান্ধীজি ফিরে এলেন, সহকর্মীদের বললেন যে বড়লাট সাধারণ শিষ্টাচারও ভুলে গেছেন। (২) নিষ্ফল গৌরবের মহিমায় তাঁর মুখে হাসি। তাঁর চিরদিনের ধর্মনীতি ও রাজনীতির অপূর্ব সমন্বয়ের ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য বোঝবার ক্ষমতা বড়লাটের ছিল না।

---

(1) Azad—India wins freedom 36

(2) Ibid

তিন

আজও মনে পড়ে ইংরেজের সেই মর্মান্তিক দুর্দিনে ভারতের জনগণের কত আশা যে ইংরেজের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসবে ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ইংলণ্ডের কথা স্মরণ করে গান্ধীজি মনে প্রাণে যুদ্ধে ইংরেজের জয় কামনা করতে লাগলেন। মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন—সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেস মণ্ডপের পাশেই কিষাণ নগরে সুভাষবাবু সর্বভারতীয় কিষাণ সভার আয়োজন করে দেশের তরুণ মুক্তিকামীদের জানিয়েছেন আহ্বান। প্রকৃতি দাঁড়ালেন বিরুদ্ধে। আরম্ভ হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি। বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল কংগ্রেস মণ্ডপ—কোন বিশেষ লোক সমাগম হ'ল না। ছাতা মাথায় শূন্য মণ্ডপে সভাপতি মৌলানা আজাদ পূর্ণস্বাধীনতা প্রস্তাবের সারাংশটুকু পড়লেন—সেটুকু পড়া হতেই প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হ'ল। এদিকে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কিষাণ নগরে তিল ধারণের স্থান নেই। সুভাষ বাবু তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও কর্মব্যস্ত। পাশে আছেন শুধু তাঁর সহায় এক সব-ত্যাগী সন্ন্যাসী—স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, আর অন্যদিকে তাঁকে সাহায্য করছেন রামগড়ের তরুণ রাজা। সেই সর্বভারতীয় কিষাণ সভার সভ্যবৃন্দ সমেত বিপুল জনতা অসঙ্কোচে তাদের পূর্ণ সমর্থন জানালেন সুভাষ বাবুর নির্ভীক নেতৃত্বে। সর্বভারতীয় আপোষ বিরোধী সম্মেলনের দিকে ম্লান আলস্যে বিপন্ন ব্যথিত ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ক্লান্ত কৌতুহলে চেয়ে রইলেন, বুঝতে বাকি রইল না জনমত কোন্ দিকে। সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ হ'ল যে তাঁদের সংগ্রাম হবে নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন।

১৯৪০ সনের ৬ই এপ্রিল সুভাষ বাবু বাংলা দেশে আরম্ভ করলেন আইন অমান্য আন্দোলন। মুসলিম লীগ ২২শে মার্চ লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাব মত পাকিস্তানের দাবী নিয়ে তখন আন্দোলন আরম্ভ করেছে। ইংরেজের অবশ্য লীগের এ আন্দোলনের জন্যে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। যুদ্ধের অবস্থা উত্তরোত্তর চলেছে বিপর্যয়ের দিকে। এপ্রিল মাসের মধ্যে নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করলেন হিটলার। ১০ই মে মিঃ চেম্বারলেনের জায়গায় মিঃ উইনষ্টন চার্চিল নিলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব। মে মাসের মধ্যে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবার্গ হয়ে গেল জার্মানীর করায়ত্ব। ইংলণ্ডের তখন উঠেছে নাভিশ্বাস—দেশ যায় যায়—২৮শে মে থেকে ৩রা জুনের মধ্যে ডানকার্ক ছেড়ে ইংরেজ সৈন্য প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হ'ল। এ বার ফ্রান্সের পালা। ৫ই জুন ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সের উপর নাৎসী বাহিনী। কোথায় গেল অপরাজেয় ম্যাজিনো লাইন? তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল জার্মান সৈন্যেরা—ফ্রান্স হয়ে গেল হিটলারের পদানত।

এ সময় সুভাষ বাবু গান্ধীজির কাছে একটা আবেদন জানালেন যে ভারতের জনগণের এ সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু কংগ্রেসের রাজপ্রাসাদে সে আবেদন বিফল হয়ে গেল। সেদিনের সেই শ্রীভ্রষ্ট দিনে গান্ধীজি ইংরেজের শোকে মুহ্যমান। বললেন "ইংরেজকে ধ্বংস করে আমরা স্বাধীনতা চাই না—অহিংস সংগ্রামের নীতি এ নয়।" (১) তাঁর শিশু প্রতিনিধি পণ্ডিত নেহরু ২০শে মে দেশবাসীকে শোনালেন যে যে সময় ইংলণ্ড জীবন মরণ সমস্যায় উপনীত হয়েছে তখন আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের সম্মানের পক্ষে হানিকর। কথাগুলো যেন স্বপ্নের মত অবিশ্বাস্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা বলে যাঁদের গর্বের সীমা ছিল না তাঁদের মুখে এই উক্তি? সর্দার প্যাটেল অবশ্য কম কথা বলতেন। বাইরে

(1) The Indian struggle III 34

থেকে দেখে মনে হ'ত যেন তিনি সর্ববিষয়ে উদাসীন। কেউ কেউ বলতেন যে তিনি যেন 'একটা প্রকাণ্ড হিসেবের খাতা।' যাই হোক্ এ অহিংস যোদ্ধাদের মনোভাব অবশ্য দেশের লোকের বোধগম্যের অতীত। যে ইংরেজ সুদীর্ঘকাল ধরে দেশকে শোষণ ও শাসন করে এসেছে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ভারতীয়দের সাধারণ পশুর মত মেরেছে, তাদের ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাদের দুর্দিনের সুযোগে দেশের স্বাধীনতা চান না এমন স্বদেশ প্রাণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁরা তখন আকাশ কুসুমের কুঞ্জবনে—ভাবছেন যে ইংরেজ যেচে স্বাধীনতা দেবে। মনে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে যে এঁরা যে এতকাল ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছেন তাকি শুধ্ লোক দেখানো। সেদিনের কথায় দেশপ্রীতির ছদ্মবেশ ফুঁড়ে প্রকাশ পেল ইংরেজের প্রতি অবিচ্ছিন্ন প্রেম, তাদের জন্যে অবিরাম শুভ কামনা। এ মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্য পরাধীন জাতির পক্ষে অশোভন—শত্রুর কাছে সম্মানের, জ্ঞানের অভিমান আত্ম-গৌরবের প্রকাশ নয়।

সেদিন সত্যিই দেশের তরুণেরা বিস্ময়ে হতবাক্। তাঁদের আজন্ম বিশ্বাস যে মানুষ নিজের বর্তমানের চেয়ে বড়। সে চিরদিন সংগ্রাম করবে হিংসা কণ্ঠকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। মহৎ মনুষ্যত্ব চিরদিনই সম্মুখগামী।

গান্ধীজি ও পণ্ডিত নেহরুর এই কথায় কংগ্রেসের মধ্যে সেদিন এনে দিল দারুণ বিক্ষোভ। অনেকেই এ কথার তীব্র সমালোচনা করলেন। নিরুপায় বিপন্ন মৌলানা আজাদ বললেন এটা আপোষের কথা—স্বাধীনতার কথা নয়। তিনি তখন সভাপতি হিসেবে বলতে বাধ্য হলেন যে কংগ্রেস আপোষ করবার সমিতি নয়—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংস্থা। অনন্যোপায় হ'লে ভারতবাসীর অস্ত্র-ধারণেরও অধিকার আছে। (১) সেদিন কিন্তু অহিংস অসহযোগ বিস্রংস দুঃসহযোগে পরিণত।

(1) Azad—India wins freedom 34

১২ইজুলাই ইটালি যুদ্ধে যোগ দিল জার্মানীর পক্ষে। মুসোলিনী সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসলেন। যুদ্ধের গতি তখন আফ্রিকার দিকে। ইটালিয়ান সৈন্য বাহিণী যখন আফ্রিকা সীমান্তে জার্মানী তখন একে একে আক্রমণ করল গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ও ক্রীট। সমস্ত পশ্চিম ইউরোপ টলমল করে উঠল হিটলারের পদভরে।

১৯৪০ সনের ১৭ই জুন ওয়ার্দায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজি প্রস্তাব করলেন যে মানুষের ইতিহাসের এ সঙ্কটময় সময়ে ভারতবর্ষ অহিংসার পথেই চলবে—বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষে করবার জন্যে সশস্ত্র সৈন্য রাখবে না। ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্য এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ মানতে পারলেন না। ৩রা জুলাই আবার হ'ল দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। সেখানে তাঁরা পাশ করালেন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব। বললেন যে অচিরে স্থাপন করতে হবে কেন্দ্রে অস্থায়ী ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্ট। সে গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। ২৭শে জুলাই পুনায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সমর্থিত হ'ল সে প্রস্তাব। মোট কথা সেদিনের কংগ্রেস ইংরেজকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রস্তুত তবে এই সর্তে যে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি আর উঞ্ছবৃত্তির শেষ হ'ল না।

কম্যুনিষ্ট পার্টির তখন কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌ এগ্রিমেণ্টের যুক্ত ফ্রণ্টের অস্তিত্ব তখন লোপ পেয়েছে। তখনও কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যেরা অন্য দলের ভেতর অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছেন। ষ্টুডেণ্টস্ ফেডারেশনের মধ্যে তাঁরা ঢুকলেন কিন্তু বেশীদিন কাজ করতে পারলেন না। দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর কনফারেন্সে সভাপতি কমরেড হীরেন মুখার্জী ও কমরেড আশরফ বললেন যে কংগ্রেস দারা ভারতের প্রতিনিধি নয়। তাঁরা প্রস্তাব পাশ করালেন যে ভবিষ্যৎ ভারত, প্রদেশগুলির পারস্পারিক আস্থার উপর স্বেচ্ছাধীন

ফেডারেশন বা যুক্তরাজ্য হিসেবে গঠিত হবে। ইংরেজ বুঝল যে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের মত কমুনিষ্ট পার্টির বিরোধ অনিবার্য্য। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ আর একবার মীমাংসার আশায় ছুটলেন মিঃ জিন্নার দরবারে। তখন অবশ্য মিঃ জিন্না পাকিস্তান মুখে চাইছেন বটে কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা বা তার কাঠামো সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেন নি। (১) মিঃ জিন্না এক কথায় কংগ্রেস সভাপতিকে অপমান করে দিলেন। বললেন ' Can you not realize you are made a muslim show boy to give it colour that it is national and deceive foreign countries ? (২)

মিঃ জিন্না তখন থেকেই বলতে আরম্ভ করলেন "মুসলমানেরা একটা নেশন কিন্তু তাদের দেশ নেই।" কংগ্রেসই মুসলমানদের বরাবর প্রাধান্য দিয়েছে। কাজেই তিনি বললেন নেশন হিসেবে মুসলমানদের চাই আলাদা রাজ্য। রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁদের নতুন নীতি 'প্রলেটারিয়ান পাথ' প্রকাশ করেন। সেই নীতির সারমর্ম হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম, বড় বড় কল কারখানায় ধর্মঘট, থানা ও সৈন্য শিবির ধ্বংস, গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে জাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান অকেজো করে দেওয়া। কম্যুনিষ্ট পার্টির এ নীতির মধ্যে দেশের মুক্তিকামী তরুণেরা ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন। তা ছাড়া এ নীতির পেছনে জনসাধারণের ছিল সমর্থন। ইংরেজ শাসন অবসানের জন্যে দেশ তখন মেতে উঠেছে দেশের লোকেদের অভ্রান্ত নেতৃত্বের অভাবে কাজে উৎসাহ ছিল না। এখন অনেকেই কাজে নেমে পড়লেন।

মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে মিঃ জিন্না দু'জাতি তত্ত্ব নিয়ে পাকিস্তানের দাবী নতুন করে

(1) Edwardes 94 (2) Ibid 70

গভর্ণমেণ্টকে জানালেন। কংগ্রেস তার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না—অথচ প্রত্যেক কংগ্রেস সভাপতিই এক একবার মিঃ জিন্নার কাছে গেলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আশায়। মিঃ জিন্না মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও তখন এ নিয়ে কিছু বললেন না। শাণিত অস্ত্র লুকিয়ে রাখলেন সময়মত ব্যবহার করার জন্যে এবং পরে তা করেও ছিলেন। এক সময় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে এ নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটু ব্যঙ্গোক্তি। (১)

যদিও ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান বাদে আরও অনেক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে এবং তাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয় তবুও গান্ধীজি ও কংগ্রেস প্রথম থেকে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের ধ্বনি তুলে দুনিয়াকে ভ্রান্ত ধারণায় ফেলেছিলেন। অন্য দেশের লোকের বোধহয় এ ধারাণাই হয়েছিল যে ভারতে মাত্র দু'টো জাত বাস করে হিন্দু ও মুসলমান। এরা বাদে শিখ খৃষ্টান প্রভৃতি যে সমস্ত সম্প্রদায় ছিল তাদের গান্ধীজি প্রথম থেকেই অপরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে রেখে অহেতুক মুসলমানদের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভূপতিদা—শ্রীভূপতি মজুমদার গান্ধীজিকে বলেছিলেন যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের কথা না বলে 'ভারতের জনগণের ঐক্যের' কথা বলা বোধ হয় শোভনীয়। সেদিন গান্ধীজি তাঁর সে কথার যথাযথ উত্তর দিতে না পারলেও তাঁর মতের পরিবর্ত্তন করেন নি।

১৯৪৯ সনে সুভাষবাবু কলকাতায় মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাজাতি সদনের নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান—কাজে ব্যবহারে ও চিন্তায়। বহুদিনের বিস্মৃত বাণী "ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্' মন্ত্র আবার নতুন করে উচ্চারিত হ'ল, পেল নতুন ভাষা নতুন অর্থ।

২রা জুলাই সুভাষবাবু আবার ভারত রক্ষা আইনে হলেন বন্দী। তখন তাঁর বিরুদ্ধে দু'টো ফৌজদারী মামলা চলছে। জাতীয় মর্যাদা

(1) Mukherjee—The gentle colossus 87 : 100

হানিকর অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ উদ্দেশ্যে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত গণবিক্ষোভ ও সত্যাগ্রহ তখনও চলছে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্যে ইংরেজকে বারে বারে চাপ দিতে আরম্ভ করল। বাধ্য হয়ে ১৯৪০ সনের ৮ই আগষ্ট ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে এল একটা নতুন প্রস্তাব। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বললেন যে বড়লাটের কার্য্যকরী সভায় ভারতবাসীদের প্রতিনিধি থাকবে। তাঁদের নিয়ে একটা যুদ্ধ-পরামর্শ-কাউন্সিল গঠন করে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। যুদ্ধ শেষ হলে নতুন সংবিধান প্রণয়নের ভার তাদেরই উপর থাকবে। মোটকথা এই আগস্ট প্রস্তাবে তিনটি প্রধান জিনিস ছিল। প্রথম—সংখ্যালঘুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের শক্তিশালী কোন অংশের সম্মতি না নিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন রকমের ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। দ্বিতীয়—ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষমতা যুদ্ধের পর ভারতবাসীর উপর থাকবে আর তৃতীয়—সংবিধান রচনাকারী সংসদ গঠিত হবে যুদ্ধের পর। সংখ্যালঘুর কোন সংজ্ঞা অবশ্য সেখানে ছিল না।

ঠিক এগার বছর আগে লর্ড আরউইন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আগষ্ট প্রস্তাব তারই উপর একটু রং চড়ানো। মুসলিম লীগ কয়েকজন সিভিলিয়ানের পরামর্শে সর্ত্তাধীনে সে প্রস্তাব মানতে রাজী হ'ল কিন্তু কংগ্রেস ভাঙ্গা মন্দিরে চুনকাম পছন্দ করল না। গান্ধীজি করলেন একক সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা। তার কারণ ব্যাপক সত্যাগ্রহ করলে বোধহয় সুভাষবাবুকে সমর্থন করা হবে আর ইংরেজের যুদ্ধ জয় প্রচেষ্টার পক্ষে সেটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ রাজনীতির পরিধি নির্ণয় সত্যিই কঠিন। তবে একক সত্যাগ্রহ জিনিসটা হাস্যকরই বটে। এক একজন লোক গলায় মালা পরে একটা আইন অমান্য করে কারাবরণ করবেন দেশ সঙ্গে সঙ্গে

স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাবে। এরই নাম হবে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম। ১৯৪০ সনের ৭ই অক্টোবর প্রথম সত্যাগ্রহী বিনোবা ভাবেজী সত্যাগ্রহ করে তিন মাসের কারাবরণ করলেন। একদিনেই তিনি পরম ত্যাগী দেশকর্মী হয়ে গেলেন আর সেই জোরেই আজও ভূদান যজ্ঞের পৌরহিত্য করছেন আর কংগ্রেস তার পৃষ্ঠপোষক। এর আগে দেশের লোক হয়ত তাঁর নামই জানত না।

কয়েকদিন পরে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হলেন পণ্ডিত নেহরু। তিনি চার বছরের জন্যে কারাবরণ করলেন। প্রমাণ হয়ে গেল যে সেদিনের কংগ্রেস নেতারা নিশ্চেষ্ট কর্মহীন স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট— তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারার কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। গান্ধীজির রবার ষ্ট্যাম্প হিসেবে এঁরা জেলে যেতে আরম্ভ করলেন। অথচ বাইরে থাকলে কত কাজই না করতে পারতেন। এই যুদ্ধের সময় বাইরে থেকে দেশকে সংগ্রামমুখী না করে তাঁরা জেলে যেতে লাগলেন। (১) বিরুদ্ধ-বাদীর অভাব ছিল না। অনেকে ব্যঙ্গ করে বললেন এঁরা জেলে যাচ্ছেন ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্যে। সারা ভারতে মাত্র ২০০০০ সত্যাগ্রহী বন্দী হলেন। সকলেই মনে মনে বুঝলেন যে এ সত্যাগ্রহের কোন অর্থ নেই। শেষ পর্যন্ত ১৭ই ডিসেম্বর সত্যাগ্রহ বন্ধ হ'ল।

ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি তখন বিবৃতি দিতে আরম্ভ করছে। তারা বুঝেছিল যে কাজের চেয়ে কথাতেই বেশী ফল হবে। মিঃ জিন্না শুধু কথার জোরেই তখন লড়ছেন আর কংগ্রেস দিনের পর দিন তাঁর খোসামোদ করে চলেছে। তোষণ নীতির আর শেষ হ'ল না। এ যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করে সব দলই উল্লসিত হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ বলল যে তারাই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি, কংগ্রেস হিন্দুর প্রতিষ্ঠান।

(1) Majumdar III 608

হিন্দু-বাদে যে অন্য লোকেরা ভারতে বাস করে মুসলিম লীগও সে কথা স্বীকার করল না। আর যে সমস্ত মুসলমান জাতীয়তাবাদী বলে পরিচয় দিয়ে কংগ্রেসে আছে তাদের মতে তারা কংগ্রেসের হাতের পুতুল, কেনা গোলাম মাত্র।

হিন্দু মহাসভা দাবী করল যে তারাই ভারতের হিন্দুদের প্রতিনিধি কংগ্রেস নয়। কংগ্রেস অভিজাত সম্প্রদায়ের, সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের যোগ নেই। কংগ্রেসের নীতি শুধু তোষণ নীতি। শিখরা বলল যে মুসলমান যদি পাকিস্তান চায় তারাও শিখিস্থান চাইবে না কেন? সে সময় আচার্য কৃপালিনী ব্যঙ্গ করে লিখলেন যে ভারতের নারীরা এবার জেননাস্তান চাইতে আরম্ভ করুক। তার জন্যে তিনি বললেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের এতে অগ্রণী হওয়া উচিত।

যাই হোক্ শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজ বোঝাপড়া করুক কেউই তা চাইল না। ইংরেজ বুঝল যে কংগ্রেসের শক্তি দিন দিন কমে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। ইংরেজরাই বহু পরিশ্রমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্না, মিঃ রহমৎ আলি প্রভৃতি নেতাদের নিয়ে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল এত দিনে তার ফল ফলল। লীগের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে হিন্দু-মহাসভার জন্ম। ইংরেজ এ দলাদলির সুযোগ ছাড়ল না—বলে বসল সব দল একমত না হলে কিছুই দেওয়া হবে না—ইংলণ্ড ত সব সময় দিতে প্রস্তুত। ইংরেজ ভাল করেই জানত যে তাদের বিভেদ নীতির বিষময় ফল ভারতের উপর বেশ চেপে বসেছে। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন এবং কংগ্রেস পুরানো দল হয়েও এখনও শক্তিহীন। ইংরেজ মুরুব্বী চালে বললে "যুদ্ধের পর ভারতের কথা চিন্তা করা হবে। ইতিমধ্যে ভারতবাসীরা আত্মকলহের অবসান করুক।" তবে মিঃ চার্চিল এ কথাও বললেন যে যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে। তাঁর কথায় ভারতীয়দের শান্ত করা যাবে না ভেবে

ভারত সচিব মিঃ এল. এস. আমেরী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম ভারতের কথা বিবেচনা করা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি বললেন "আগে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাক আমাদের বিবাদ আমরা নিজেরাই মীমাংসা করে নেবো। তাতে যদি রক্তক্ষয় হয় ত হবে।" শেষের কথার মধ্যে মিঃ জিন্না বিবাদের সূত্র খুঁজে পেলেন। মনে পড়ে ১৯২৮ সনের কলকাতা কংগ্রেসে মৌলনা মহম্মদ আলি গান্ধীজিকে বলেছিলেন "ভারতবাসীর শতকরা পঁচিশ ভাগ মুসলমান তবুও আপনি তাদের আইন পরিষদে শতকরা তেত্রিশটা আসন দিতে চান না। আপনি ইহুদী—আপনি বেনিয়া।" (১) অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তি প্রাধান্য বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সেদিন গান্ধীজিকে এ অপবাদ চুপ করে শুনতে হয়েছিল।

সুভাষবাবু সে সময় জেলে বন্দী। তিনি বুঝেছিলেন যে যুদ্ধে ইংরেজ জিতলে সহজে কিছু দেবে না আর হারলে ত দেবার কোন প্রশ্নই নেই। কাজেই যদি ভারতের বাইরে থেকে অথবা ভেতর থেকে আন্দোলনের সৃষ্টি করা যায় ত আমেরিকার চাপে পড়ে অথবা বাইরের শত্রুর চাপে পড়ে ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হবে। তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবার আশায় ১৯৪০ সনের ২৬শে নভেম্বর বাংলার গভর্ণরকে ওজস্বিনী ভাষায় এক চরম পত্র দিয়ে জানালেন যে তাঁকে মুক্তি না দিলে তিনি ২৯শে নভেম্বর থেকে আরম্ভ করবেন অনশন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা যখন জেলে যাচ্ছেন তখন তিনি বাইরে এসে চেষ্টা করেছেন কাজ করবার। চিন্তাধারার কতই না প্রভেদ! তিনি গভর্ণরকে লিখলেন যে তাঁর মৃত্যু দিয়ে যদি দেশের স্বাধীনতা আসে ত আসুক। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন "মানব জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ পরাধীনতা। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ ঘৃণ্যতম অপরাধ। জগতের নিয়ম বাঁচতে হলে জীবন দিতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জীবনের মহোত্তম ধর্ম।"

(1) Mukherjee 96

সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের ব্যবহার, কর্মপদ্ধতি ও ইংরেজ প্রেম তাঁর কাছে ক্ষমার অযোগ্য। সত্যিই সেদিনের নেতারা ভুলেছিলেন ১৭৫৭ সনের কথা—ভুলেছিলেন পলাশী প্রান্তরের ২৩শে জুনের ইংরেজের কপট চক্রান্ত, ক্লাইভের জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কময় পটভূমিকায় ইংরেজ রাজত্বের সূচনা। ভুলেছিলেন মোহনলাল, মীরমদন ও মীরকাশিমের দেশপ্রেমের সত্যনিষ্ঠ সাধনা, মহান্ কর্ত্তব্যলোকের বেদীমূলে তাঁদের দুর্মোচ্য বেদনার দান। ভোলেন নি শুধু মহাকাল—মানুষের স্বার্থবন্ধনের সে অমার্জনীয় অন্যায়। সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মীরজাফরের অহর্নিশ অব্যক্ত বেদনা, আকস্মিক বেত্রাঘাতে মীরণের নির্মম করুণ মৃত্যু, অর্থলোভাতুর উন্মাদ উমিচাঁদের মুর্শিদাবাদের পথে পথে প্রলাপ আর্ত্তনাদ, সপরিবারে জগৎশেঠের বসতবাটির নদীগর্ভে নিমজ্জন নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান—অবিস্মরণীয়।

সুভাষবাবু আরম্ভ করলেন অনশন ২৯শে নভেম্বর থেকে। তাঁর রুগ্ন শরীর তার উপর জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সরকার তাঁকে ৫ই ডিসেম্বর করল স্বগৃহে অন্তরীণ। তাঁর বিরুদ্ধে যে দুটো মামলা চলছিল সেখানেই তাঁর বিচার হবে বলে ঘোষণা করা হ'ল। ১৯৪০ সনের ১৭ই জানুয়ারীর পর তাঁকে আর কেউ দেখে নি। বিচারের দিন দেখা গেল তাঁর ঘর শূন্য। স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব রাত্রে ২৫শে জানুয়ারী পুলিশ প্রথম জানল যে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। নানা জনে নানা কথা বললেন—কেউ বললেন সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন হিমালয়ে—কেউ বললেন সরাসরি গেছেন পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে। সন্ন্যাসে তাঁর বরাবরই অনুরাগ। কিন্তু স্বাধীনতা যজ্ঞের দীপ্ত পুরোহিত সেই প্রতিভা জ্যোর্তিময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি তখন জীবনের সকল বিপদকে তুচ্ছ করে চলেছেন কাবুলের পথে রাশিয়ার দিকে। রক্তক্ষরা প্রতিভার অত্যাশ্চর্য অনুশীলনে পেছনে তাকাবার সময় নেই। জীবনে যাঁদের সবচেয়ে আপন

বলে জানতেন সেই মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া বিভাবতী দেবী যিনি সকল সময়ে তাঁর সকল অভাব পূর্ণ করে এসেছেন ও তাঁর মা—জননী দেশবন্ধু পত্নী বাসন্তী দেবীর কথা হয়ত বার বার তাঁর ঊর্ধগ মনে জেগেছে।

সেদিন হয়ত আর একজনের কথা তাঁর মনে জেগেছিল যেদিন তিনি প্রথম ভারত ছেড়ে লণ্ডনে আই. সি. এস পরীক্ষার জন্যে চলেছিলেন। ওটেন ঘটনার পর ইংরেজ সরকার কোন রকমে পাশপোর্ট দিতে রাজী হয় নি। অনেক চেষ্টার পর সরকার বলল যে যদি উচ্চমর্য্যাদা সম্পন্ন কোন রাজ কর্মচারী ইংলণ্ডে তাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে জামিন হ'ন তাহলে তাঁকে ছাড়পত্র দেওয়া যেতে পারে। সরকারের বিশ্বাস ছিল যে তাদের বিদ্বেষ ভাজন হয়ে এত বড় দায়িত্ব গ্রহণের দুঃসাহস কোন রাজ কর্মচারীর হবে না। কিন্তু সেদিন যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি আই. সি. এস. না হয়েও বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র। এই যোগেন বাবুই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার আগে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনের Arms Act এর প্রতিবাদ করে ২৩ বছর বয়সে প্রখ্যাত সঞ্জীবনী পত্রিকায় ১৮৮৫ সনে "কেন আমরা অস্ত্র পাব না" বলে নির্ভীক প্রবন্ধ লেখেন। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা সংগ্রহ "রবিচ্ছায়া" নামে গ্রন্থ ইনিই প্রকাশ করেন আর করেন একটা মস্ত বড় দুঃসাহসের কাজ—কৃষ্ণনগরের অভিযুক্ত ছাত্রদের মামলায় ব্যারিষ্টার শ্রীমনোমোহন ঘোষ যে সওয়াল করেছিলেন তার ইংরেজী বিবরণ গ্রন্থাগারে প্রকাশ করে।

চার

১৯৪১ সনের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি ১-২৫—গৃহত্যাগ করলেন কর্মপাগল ভারতের শ্রেষ্ঠ সৈনিক—নাম নিলেন মৌলভী জিয়াউদ্দীন। কঠিন দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে সকলের অলক্ষ্যে তাঁর মোটর ছুটল ২১০ মাইল দূরে গোমো রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে। সেখান থেকে একা গেলেন ট্রেণে পেশোয়ার। পিতৃব্যকে গোমো পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশিশির কুমার। সেই বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথে পাথেয় শুধু স্বাধীনতার চরম আকাঙ্খা। পৌঁছুলেন পেশোয়ার—পূর্বনির্দেশ মত শ্রীভগৎরাম নামে এক ভদ্রলোক অতিপরিচিতের মত দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। পেশোয়ারে দু'দিন থেকে চললেন কাবুলের পথে—অন্তরে তখন কল্যাণ চিন্তার অপূর্ব সমাবেশ। ছদ্মবেশ নিলেন পাঠানের—শ্রীভগৎরাম হলেন রহমৎ খাঁ। পুস্তভাষা তিনি জানেন না তাই সাজলেন হাবা ও কালা—অলজ্জ অপৌরুষের চিহ্ন মাত্র নেই। মোটরে চলেছেন—খাইবার গিরিবর্ত্মের প্রবেশ মুখে প্রহরী স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরময় জামরুদ দুর্গ। সেটা পার হয়ে আবেশ মদির লাণ্ডিকোটাল দুর্গকে পাশ কাটিয়ে উপল বন্ধুর পথে বলিষ্ঠ নিঃসংকোচে চলে এলেন গারহি।

এবার বড় রাস্তা ছেড়ে পদব্রজে ধরতে হ'ল গ্রামের পথ। উপজাতিদের এক গ্রামে রাত কাটিয়ে পরের দিন তাঁরা দু'জন সশস্ত্র পাঠান প্রহরী নিয়ে চললেন আফগান সীমান্তের দিকে। কাবুল নদীর সঙ্গম পার হয়ে রাত কাটালেন আড্ডাশরীফে এক মসজিদে। তারপর লালপুরা। চতুর্থ দিনে তাঁরা আবার কাবুল নদী পার হয়ে ধরলেন বড় রাস্তা—অব্যাহতি পেলেন ছাড় পত্র

শ্রীরাসবিহারী বসু—পৃঃ ৫৯
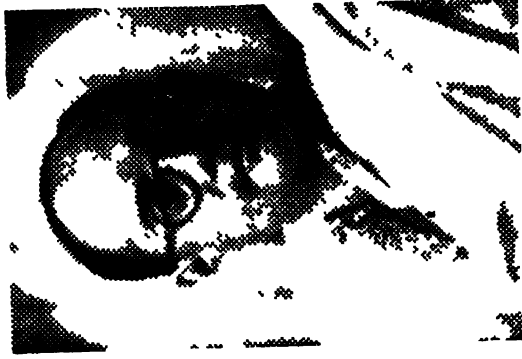
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—পৃঃ ৪৫

দেখাবার দায় থেকে। প্রহরী সঙ্গীরা নদী পার করে দিয়ে ফিরে গেল।

একে উপবাসক্লিষ্ট অসুস্থ শরীর তার উপর পথশ্রমের ক্লান্তি 'দুর্গম পথের যাত্রা স্কন্ধে বহি দুশ্চিন্তার বোঝা'। আশ্রয়ের অভাবে শুয়ে পড়লেন রাস্তার ধারেই। শ্রীভগৎরাম সারাদিন চেষ্টার পর যা হোক্ করে শেষ পর্যন্ত যোগাড় করলেন একটা অনাচ্ছাদিত লরী। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেই লরীতে তাঁরা পৌঁছুলেন লাহোর গেট। রাতের আশ্রয় জুটল লরী ড্রাইভারদের এক সরাইখানায়। মঙ্গলের আয়োজন যেখানে বড় সেখানে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন প্রশ্ন নেই—উদ্‌যোগ পর্বের পূর্বেই ত অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

এদিকে কলকাতায় ২৬শে জানুয়ারী প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশ পেল যে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাবুলে সে সময় এক আফগান পুলিশ লরী ড্রাইভারদের সরাইখানায় দু'জন হজ যাত্রী কেন অপেক্ষা করছে এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে। কিছু কিছু বকসিশ পেয়ে তার লোভ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে তাঁরা শ্রীউত্তম চাঁদ নামে এক ভারতীয়ের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীউত্তম চাঁদ তাঁদের স্থান দিলেন সযত্নে। (১)

সুভাষচন্দ্র আর তাঁর সঙ্গী তিন দিন ধরে রুশ দূতাবাসে ঢোকবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সুবিধে কিছুই হ'ল না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি ভগৎরামকে ইতালীয় দূতাবাসে পাঠালেন। গভর্ণমেণ্টের নির্দেশের অপেক্ষায় ইতালীয় দূতাবাস অনেক দিন টালবাহানা করতে লাগল। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁরা তাঁকে স্বাগত জানালেন—অভিনন্দন ও ছাড়পত্রের প্রতিশ্রুতিও মিলল। সঙ্গে যাবার জন্যে ইউরোপ থেকে কয়েকজন এসে গেলেন। হতাশার সমস্ত মালিন্য ও আবর্জনা মুছে ফেলে ওরলান্দো মাসসোত্তা নামে ছাড়পত্র নিয়ে ১৮ই মার্চ তিনি রওনা হলেন রুশ সীমান্তের দিকে।

(1) Hindusthan Times dated 26-2-46.

কাবুল থেকে বোখারা। গগনস্পর্শী হিন্দুকুশের গিরিপথে রমণীয় তাশকুর গানের গিরিনালা পার হয়ে, হিমশীতল আফগান প্রান্তরের বহু নগরী অতিক্রম করে, প্রাচীন পুণ্যতীর্থ মাজার-ই-শরীফ ও জঙ্গল পরিবৃত সর্বআভরণহীন বিষাদময় অক্সাস অতিক্রম করে, পুণ্যতোয়া পাটাকেশরের পারঘাট হয়ে পৌছুলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমরখন্দে। সেখান থেকে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে মস্কোর ট্রেণ ধরলেন। (১) ২৮শে মার্চ বিমান পথে চলে এলেন বার্লিন। পথের শত শত বাধা-বিপদ অগ্রাহ্য করে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের পূজারী পৌছুলেন গন্তব্য স্থানে। একদিন আওরঙ্গজেবের কারাগার থেকে কৌশলে শিবাজী পালিয়েছিলেন। অনেকের মতে এ প্রত্যয়-ঋদ্ধ দুঃসাহসিকতার কাছে মারাঠা শিবাজীর দুঃসাহসিকতা কিছুই নয়।

মঃ রিবেনট্রপ তখন হের হিটলারের ডান হাত। তিনি ভারতের বিপ্লবীকে জানালেন সাদর সংবর্ধনা। স্থির হ'ল বার্লিন থেকে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আকাশবাণীতে প্রচার কার্য্য চালাবেন-- গঠন করবেন ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের ভেতর থেকে "স্বাধীন ভারত সৈন্যদল"। সেখানের যুদ্ধবন্দীরা ও অন্যান্য ভারতীয়েরা যোগ দিলেন তাঁর সৈন্যদলে। তাঁরা সমবেতকণ্ঠে অভিবাদন জানালেন এই নিঃসংশয়-মূর্তি বিপ্লবী নেতাকে। নাম দিলেন নেতাজী— যুগান্তরের সন্ধ্যাকাশে বিদ্রোহের রক্তনিশান। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ।

জার্মানীর রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধ জয়ের অগ্রগতি দেখে মঃ ষ্টালিন ক্রমেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি হিটলারকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সঙ্গত মনে না করে বাধ্য হয়ে করলেন নিজ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ। হিটলার ১৯৪১ সনের ২২শে জুন হঠাৎ রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে—করে বসলেন রাশিয়া আক্রমণ। ইংরেজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—এবার যুদ্ধের তীব্রতা ইংলণ্ডের উপর কমবে।

(1) Hugh Toyes—The Leaping Tiger.

নেতাজীর পরামর্শে ল্যামসডার্ফ ও সাইরেনাইকার বন্দীশালা থেকে যুদ্ধবন্দীদের আনা হ'ল বার্লিনে। কিছুদিন পরে তাঁদের ভেতর থেকে যে উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া গেল তা সত্যিই অপূর্ব। উৎসাহিত হয়ে বলিষ্ঠ বিশ্বাসে নেতাজী উত্তর আফ্রিকার সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের আনালেন ড্রেসডেনের কাছে অ্যানবুর্গ ক্যাম্পে। অবশ্য প্রথম প্রথম তাঁদের অনেকেই নেতাজীর মতে মত না দিয়ে বিরোধিতা করতে লাগলেন। কিন্তু তখন বিরোধে তাঁর ক্ষতি নেই— এগিয়ে যেতে শ্রান্তি নেই, তাঁর কর্মের মধ্যে আনন্দ, আশঙ্কার মধ্যে গৌরব। তিনি তাঁদের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করলেন আলোচনা। তাঁর সর্বজয়ী প্রাণশক্তি, সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় আর অন্তরের নতুন ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁরা দলে দলে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পতাকার তলে। ফলে এক বছরের মধ্যে জার্মান সরকারের সহযোগিতায় গড়ে তুললেন তুটো সৈন্যদল। হিটলারের ব্যবহার দেখে লোকে তাঁকে স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধির সম্মান দিল। তিনি ক্রমে রোম প্যারিস প্রভৃতি অঞ্চলে গঠন করলেন স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যদল। (১)

১৯৪১ সনের মার্চ থেকে আমেরিকা মিত্রশক্তিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য দিতে আরম্ভ করে। ৭ই মে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অফ স্টেটস্ মিঃ কাডেল হাল ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইংরেজ সরকারকে এ সম্বন্ধে চাপ দিতে লাগলেন কিন্তু তখন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অন্তর্বিরোধের ফলে কিছুই হ'ল না।

সে সময় ভারতে ইংরেজ সরকারকে বিব্রত করে তোলার উদ্দেশ্যে মার্চ মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মিগণ বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে ধর্মঘট করালেন। শ্রমিকদের সম্মিলিত চেষ্টা ও দৃঢ় মনোভাবের ফলে মিল কর্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হলেন সম্মানজনক সর্তে মীমাংসা

(1) H. Toyes—The Leaping Tiger.

করতে। তখন কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাব ভারতে ক্রমে ক্রমে শক্তিলাভ করে উঠছে।

ভারতের বড়লাট মিঃ জিন্নার সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনার পর ২২শে জুলাই বললেন যে বড়লাটের নতুন পরিষদের তেরজনের মধ্যে আটজন থাকবেন ভারতীয় প্রতিনিধি। তাঁদের মনোনয়ন নির্ভর করবে শিক্ষা দীক্ষা ও যোগ্যতার পরিচয়ের উপর। তবে তাঁরা ভারতের আইনসভা বা কোন রাজনৈতিক দলের কাছে কোন বিষয়ে দায়ী থাকবেন না। সকলেই বুঝলেন যে তাঁরা শুধু পরামর্শদাতা হিসেবে বড়লাটের আজ্ঞাবহ। কংগ্রেস নেতারা এ প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারলেন না।

জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ভারতে তার প্রতিক্রিয়া। কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মসূচীরও হয়ে গেল পরিবর্তন। এ যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত কি না এ প্রশ্নই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল।

১৯৪১ সনের আগস্ট মাসে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের যুক্ত স্বাক্ষরে এল "আটলান্টিক চার্টার" নামে এক নতুন সনদ। তার মধ্যে রইল পরাধীন দেশের বঞ্চিত দুঃস্থ লোকেদের উন্নতি সম্পর্কে গালভরা কথা। যুদ্ধনীতি ঘোষণা করে বলা হ'ল দেশের লোকের নিজেদের সরকার গঠনের থাকবে অবাধ অধিকার। যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা হারিয়েছে তাদের দেওয়া হবে স্বায়ত্ব শাসন, নিজস্ব অধিকার ও পূর্ণ কর্তৃত্ব। সকলেই এ সনদের প্রকৃত মর্ম না বুঝে সানন্দে তা' গ্রহণ করল। তারা বুঝল না যে তিক্ত বড়িকে মিষ্টি আকারে গেলানো রাজনীতির যথার্থ নৈপুণ্য। কয়েকদিন পরে তাদের সে ভুল ভাঙ্গল। ৯ই সেপ্টেম্বর মিঃ চার্চিল স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে এ সনদ ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। সকলেই বুঝল যে ভারতকে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেবার ইচ্ছে ইংরেজের নেই; প্রকাশ হয়ে পড়ল তাদের অসাধুতার

নগ্নরূপ। গান্ধীজি কিন্তু কোন কথা বললেন না। এমন কি উদার নৈতিক দলের সদস্য স্যার সেকেন্দার হায়াত খাঁ যিনি বিনা সর্ত্তে ইংরেজকে সাহায্যের জন্যে বলেছিলেন তিনিও তখন মর্মাহত।

১৯৪১ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর আমেরিকার চাপে কংগ্রেস নেতারা পেলেন মুক্তি। আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু বেরিয়ে এলেন জেল থেকে। ঠিক তিন দিন পরে ৭ই ডিসেম্বর জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সঙ্গে সঙ্গে করে বসল পার্ল হারবার আক্রমণ। জাপানী বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল পার্ল হারবারের বিমান ক্ষেত্র। ৮ই ডিসেম্বর জাপানীরা মালয়ের পূর্ব্ব উপকূলে কোঠাভারুতে নেমে পড়ে ৯ই কোঠাভারু সহর ও বিমান বন্দর দখল করে বিধ্বস্ত করে দিল ব্রিটিশ বিমান বহর। ১০ই ডিসেম্বর ইংরেজের গর্বের বিশাল রণতরী "প্রিন্স অফ ওয়েলস্" ও "রিপালস্" মিলিয়ে গেল সমুদ্রের বুকে। যে অদ্ভুত সাহসে ও আত্মত্যাগের সঙ্গে এ দুটো রণতরীকে ডোবান হ'ল তা চিরদিনের জন্যে ইতিহাস হয়ে থাকবে। মিঃ চার্চিল পার্লামেণ্টে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন—"ছুটে গেল বিভীষিকা মূর্চ্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।" সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য অঞ্চল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। জার্মানীও এ রণনৈপুণ্য দেখাতে পারে নি। ১১ই ডিসেম্বর মালয়ের সবচয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি জিত্রার হ'ল পতন। তখন সকলেরই বিশ্বাস যে ভারত অধিকার করতে জাপানীদের আর বেশী সময় লাগবে না।

সেদিনের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ কথাটা যে বিশ্বাস করেন নি তা নয়। কিন্তু তখনও তাঁরা সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে কিছুই করলেন না। তখন ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্যদলে নেওয়া হচ্ছে আর বহু কোটি টাকার পণ্য চালান যাচ্ছে বিদেশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে যুদ্ধের জন্যে খরচ বহন করতে হ'ল মোট

২৮০০০ লক্ষ পাউণ্ড। (১) ১৯৩৮-৩৯ সন থেকে ১৯৪৪-৪৫ সনের মধ্যে রপ্তানি শতকরা ৩৪'৪ থেকে ২৯'২ ও আমদানি শতকরা ৩০'৫ থেকে ২০তে গেল কমে। (২) ১৯৪১ সনের মার্চ থেকে ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকা ভারত ও সিংহলকে ২১১৬ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল সরবরাহ করল। (৩) এক কথায় বাণিজ্য ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে আমেরিকা হয়ে উঠল ইংরেজের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতারা কোন কিছু চিন্তা করলেন না। তাঁরা যদি সত্যিকারের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেন তা হ'লে নেতাজীর প্রস্তাব মত যুদ্ধে লোকবল ও পণ্য সাহায্য বন্ধ করবার জন্যে আন্দোলন চালাতেন—বন্ধ করতেন দেশের লোকের উপবাস ও ভিক্ষার অসম্মান, অভাবের অভিসম্পাৎ।

আসন্ন জাপান ঃআক্রমণের আশঙ্কা সত্বেও সেদিনের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরের বিরোধ নিয়ে ব্যস্ত। মিঃ জিন্না কংগ্রেসেব বিরুদ্ধে তাঁর উল্লাসকর প্রবৃত্তি নিয়ে স্পষ্ট করে বললেন যে কংগ্রেসই তাঁর একমাত্র শত্রু ইংরেজ বা জাপান নয়। কংগ্রেস তাঁকে আমল দিক আর না দিক তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই লড়বেন —কি অদ্ভুত দেশপ্রেম! হিন্দু মহাসভার নেতারা বললেন যে তাঁরা লীগের বিরুদ্ধে লড়বেন আর ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা শ্রীরাজাগোপালচারী আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তবুও লীগের সঙ্গে কোন মীমাংসা করতে পারলেন না। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা বুঝেছিলেন যে তাঁদের চেষ্টায় বা কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে বা লীগের আবদারে ভারত স্বাধীনতা পাবে না। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা ও চীনের চাপে পড়ে এবং যুদ্ধ শেষে

(1) Banker, London January 1946 p 1. The Eastern Economist dt 21-10-49 p 633

(2) India-Review of Commercial Conditions (London) Aug. 1945 p 15—16

(3) Survey of current business (Washington) March '46 p 9

নিজেদের সর্বস্বান্ত অবস্থায় যাতে ভারতবর্ষ কম্যুনিস্ট দেশে পরিণত না হয় তার জন্যে ইংরেজ হয়ত ভারতকে স্বায়ত্ব শাসন দেবে এবং ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করবে।

১৯৪১ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তর মালয় জাপসৈন্যের করায়ত্ব হয়ে গেল। ব্রিটিশ সৈন্যেরা তখন পরাজিত ও বিপর্যস্ত। চতুর্দ্দশ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ান ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর অধীনে বৃথা লড়বার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। মোহন সিং ও অন্যান্য কয়েকজন পালাবার সময় জঙ্গলের মধ্যে বন্দী হলেন জাপানীদের হাতে। মোহন সিং আর একজন ভারতীয় অফিসারকে জনৈক সাধু গিয়ানী প্রীতম্ সিং নিয়ে গেলেন ব্যাংককে। ব্যাংককে প্রীতম্ সিং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে একটা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ও জাপ সেনাপতি মেজর ফুজিহারা অনেক চেষ্টা করে মোহন সিংকে এই সমিতিতে যোগদিতে রাজী করালেন।

১৯৪১ সনের ২৩শে ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কি কমিটির সদস্যেরা বার্দৌলি অধিবেশনে স্থির করলেন যে আসন্ন জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একটি দল গঠন করা উচিত। ইংরেজ যদি ভারতকে স্বাধীনতা দেয় ত কংগ্রেস ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। গান্ধীজির তোষণনীতি ওয়াকিং কমিটি সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন না। পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতের মুসলমান পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলি পাকিস্তানের দাবী সম্বন্ধে তখন পঞ্চমুখ। (১) দেখা গেল হিন্দু-বিদ্বেষী লীগ স্বাধীনতার চেয়ে দেশ বিভাগের পক্ষে বেশী আগ্রহশীল।

এর আগেও মুসলমানরা একবার 'ওয়াবি' আন্দোলন নামে এক সংগ্রাম চালিয়েছিল। রায়বেরিলীর সৈয়দ আমেদের নেতৃত্বে তার জন্ম। সে আন্দোলন ছিল ভারতে মুসলমান রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শুধু ইংরেজ নয়—হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য

(1) Majumdar—III 615

সংগ্রাম। তার প্রধান কর্মসূচী ছিল হিন্দু ও শিখদের মন্দির অপবিত্র করা আর কালাপাহাড়ের মত দেব দেবীর মূর্ত্তি ও বিগ্রহ কলুষিত করা। ১৮৬৩ সনে তারা ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গেও এক নিষ্ফল প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। দলের অন্যতম নেতা আমীর খাঁ তখন ১৮১৮ সনের ৩ আইনে বন্দী অবস্থায় বিচারাধীন। এ অপমানের প্রতিশোধ কল্পে ১৮৭১ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর আবদুল্লা নামে এক ওয়াবি কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার জে. পি. নরম্যানকে ছোরার আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে বসে।

দেব দেবীর মূর্তি ও বিগ্রহের অধিকাংশই বর্ণহিন্দুদের পরিচালনাধীনে থাকার জন্যে ওয়াবিদের কার্য কলাপ ও হিন্দুবিদ্বেষের ফলে বর্ণহিন্দুরা একতা লাভের সুযোগ পেয়ে যায়। ধর্মরক্ষার নীতির সঙ্গে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় বর্ণহিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে ক্রমেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ইংরেজও কঠোর হস্তে ওয়াবি আন্দোলন দমন করতে আরম্ভ করে। ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড মেয়ো যখন আন্দামান জেল পরিদর্শন করছেন তখন শের আলি নামে এক ওয়াবি তাঁকে ছোরার আঘাতে হত্যা করে ওয়াবি আন্দোলনের শেষ চিহ্নটুকু রেখে দেয়।

সে যুগের ওয়াবিদের সংগ্রাম শুধু হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না—ইংরেজের বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। মিঃ জিন্নার লীগ কিন্তু ইংরেজের সহযোগিতায় শুধু হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধেই ক্ষুদ্র ঈর্ষা ও ক্ষুদ্র বিদ্বেষে সংগ্রাম চালিয়ে পাকিস্তান আদায়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

হিন্দু মহাসভা লীগের এ দাবীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। কাজেই ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অনৈক্যের কোন মীমাংসা হ'ল না। গান্ধীজি সকল সময়েই বলতেন "মিটমাট করা আমার স্বত্বার মধ্যে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে, আমার সংগ্রামের ভিত্তি

বিপক্ষকে ভালবাসা।" (১) এত কথা বলে তিনিও লীগ বা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কোন ঐক্য স্থাপন করতে পারলেন না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই বড় হয়ে রইল।

১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে নেতাজী ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ বা আজাদ হিন্দ কেন্দ্র নাম দিয়ে এক অফিস খুললেন। তখনও নেতাজী যে জার্মনীতে আছেন তা সরকারি ভাবে জানানো হয় নি। তবে ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁর পরিচয় জানতে পারছিল। তাঁর শৌর্য-দীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও উর্ধগ মনের অন্তর্নিহিত উৎকর্ষতার সমৃদ্ধ ভাবধারার পরিচয়ে জনগণ তখন মুগ্ধ। তাঁর অনবদ্য কর্মপ্রেরণা, অনিমেষ নিদ্রাহীন অধ্যবসায় ও অফুরন্ত ত্যাগের শক্তি তাদের প্রাণে এনে দিয়েছে নবীন আশার আলো। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। সূত্রপাত হ'ল "জয়হিন্দ ধ্বনি"—বন্ধনহীন আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। দলে দলে লোক দুঃসাধ্যতাকে তুচ্ছ করে এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সৈন্য দলে। তাদের কাছে নেতাজী তখন পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবতা—অন্তরের স্বর্ণ সিংহাসনে তিনি জ্যোতির্ময়।

আরম্ভ হয়ে গেল সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির কাজ। কিছুদিন পরে গুপ্ত বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি বক্তৃতা দিলেন—করলেন আত্ম-প্রকাশ। শোনা গেল হিটলারের বাণী 'ভারতের শের আমার কাছে এসে গেছে।' ভারতবাসীর বুক ভরে উঠল নতুন আশায়।

এর পর হ'ল তাঁর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ১৩ই মার্চ নেতাজী এক ঘোষণা পত্র জারি করলেন। অল্প কয়েকদিন পরেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা দাবী করে জাপানীদের কাছ থেকে এল প্রস্তাব। তাঁরা নেতাজীকে দূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। নেতাজী সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। তাঁর কর্মসাধনার শাশ্বত গৌরবের উদয় শিখরে নতুন দিক চক্রবাল-উন্মুক্ত হয়ে উঠল।

---

(1) Edwardes p 69

পাঁচ

ভারতের তখন একান্ত দুর্দিন—সাধারণ লোকের 'দেহ রোগে শীর্ণ, উপবাসে জীর্ণ, তারা কর্মে অপটু, চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, সমাজ শতখণ্ডে বিভক্ত'। তার উপর যুদ্ধের করভার। কিছুদিনের মধ্যেই জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় দলে দলে লোক কলকাতা ছেড়ে চলল গ্রামের দিকে—পশ্চিমের দিকে। আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীর সেদিন ধৈর্যহীন উন্মত্ততা। সেদিন ছিল নেতৃত্বের একান্ত অভাব—অনেকের মতে রাজনৈতিক দলগুলি তখন বাক্ সর্ব্বস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধীজির মতান্তরে যাতে সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় তার জন্যে তিনি ১৯৪২ সনের ৫ই জানুয়ারী একটা বিবৃতি দিলেন। ডেপুটি ভারত সচিব ডিউক অফ ডিভনসায়ার হাউস অফ লর্ডসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন যে ভারতবর্ষে কংগ্রেসের আধিপত্য ক্রমেই ম্রিয়মান আর মুসলীম লীগের ক্ষমতার প্রাধান্য পরিস্ফুট। কাজেই ভারতবাসীরা নিজেদের বিরোধের কোন সমাধান করতে না পারলে স্বাধীনতার প্রশ্ন অবান্তর। তবে ইংলণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত।

বড়লাটের কাউন্সিলে আট জন সদস্য নেবার প্রস্তাবে মুসলিম লীগের হয়ে উঠল গাত্রদাহের কারণ। তাদের অভিযোগ হ'ল যে তাদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা না করে বা তাদের মতামতের কোন অপেক্ষা না রেখে ইংরেজের আগষ্ট প্রস্তাবের পরিবর্তন সম্পূর্ণ নীতিবিগর্হিত ও অনুচিত।

জাপানীরা তখন দিন দিন দুর্ধর্ষ শক্তিতে এগিয়ে চলেছে

সার্থক্যের উপল বন্ধুর পথে—পূর্ব এসিয়ায় তাদের দুর্বার অগ্রগতি। মালয়ের পর ১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পতন হয়ে গেল সিঙ্গাপুরের। দেখা গেল ইংরেজের সিঙ্গাপুর রক্ষার অজেয় ব্যবস্থা কুশাঙ্কুরের মতই ক্ষণভঙ্গুর। ব্রিটিশ কমাণ্ডার জেনারেল এ. ই. পার্সিভ্যাল বিনাসর্তে করলেন আত্মসমর্পন। একে একে ফিলিপাইন্স নিউ গায়েনা, হংকং জাপানের পদানত হয়ে গেল। থাইল্যাণ্ডের পর ব্রহ্মদেশ। যে অজেয় শক্তিতে জাপান সব কিছু প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অপ্রতিহত গতিতে বিপদ সঙ্কুল টেনেসারিয়েমের দুর্ভেদ্য জঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে এল তা সত্যিই অভাবনীয়।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে কর্ণেল হাণ্ট ৪০,০০০ ভারতীয় সৈন্য জাপান গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ফুজিহারার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। ফুজিহারা রাখলেন সেই সব বন্দিদের মোহন সিং এর কর্তৃত্বাধীনে। এদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে চাইল তাদের নিয়ে আই. এন. এ. গঠনের চেষ্টা চলল। জেনারল শাহ নওয়াজ খাঁ প্রথমে সম্মত হলেন না পরে করলেন মত পরিবর্তন। প্রায় চার হাজার যুদ্ধ বন্দী ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আগষ্ট মাসের মধ্যে আই. এন. এ. ভুক্ত হয়ে গেল। সেদিন সুপ্তশক্তির জাগরণে মুক্তিদান যজ্ঞে বহু যুবক স্বদেশের মঙ্গল কামনায় অনুপ্রাণিত। মোহন সিং তাদের যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্যাংকক অধিবেশনে একটি কর্ম পরিষদ গঠন করে শ্রীরাসবিহারী বসু তার সভাপতি ও মোহন সিং সভ্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আই. এন. এ. নিয়মিত ভাবে গঠিত হ'ল।

ভারতীয় ও ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য ও ব্যবহারগত প্রভেদ ও সুযোগ সুবিধার পার্থক্যের জন্যে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ছিল বহুদিনের সঞ্চিত গভীর অশান্তি। সে বৈষম্য ক্রমেই তাদের হয়ে উঠেছিল সহ্যাতীত। সে কারণে ও নেতাজীর দেশপ্রীতি

ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে অনেক সৈন্য আই. এন. এ. ভুক্ত হয়। এই ফৌজের গঠন ব্যাপারে কর্মপরিষদের ছিল অনেক অসুবিধা। কয়েকজন ভারতীয় অফিসার সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেলেন ব্রিটিশ ক্যাম্পে। অন্তর্বিরোধ ত ছিলই; তা ছাড়া জাপান সরকার তখন পর্যন্ত তাদের মনোভাব জানায় নি স্পষ্ট করে। ব্যাংকক অধিবেশনে স্থির হয় যে আই. এন. এ.র কর্তৃত্ব ভারতীয় অফিসারদের পরিচালনাধীনে থাকবে। একটি অস্থায়ী ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ বিদেশস্থ ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত হবে এবং জুনমাসে ব্যাংককে একটি মহাসম্মেলনের অধিবেশন হবে।

বহুকালের ইরেজের অনুগত বেতনভুক্ সৈন্যেরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে বন্দী শিবিরে থাকবার সময় নেতাজী তাদের রক্ত আহুতি যজ্ঞে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করালেন—সে কৃতিত্ব তাঁর অনন্য সাধারণ। তাদের ভেতর থেকে যে কিছু লোক পালাবে বা আবার ইংরেজের কাছে ফিরে যাবে সে ত আর বিচিত্র নয়। তবুও নেতাজী তাদের নিয়ে যে বলিষ্ঠ নিঃসঙ্কোচে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে অনেক পরিমাণে সফল হয়েছিলেন সে জন্যে তিনি ভারতবাসীর কাছে চির বরেণ্য।

১৯৪২ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেটস্ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় করণীয় বিষয় কি হতে পারে এই মর্মে এক স্মারকলিপি পাঠালেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী চিয়াংকাইশেক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানালেন আসন্ন জাপ অভিযানের মুখে ভারতের সঙ্কটময় অবস্থা। লিখলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা সুমীমাংসা না হলে সমূহ সর্বনাশ। জাপানকে বাধা দেওয়া কোন রকমে সম্ভব হবে না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যে ভারতের নেতাদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের একটা মীমাংসা করা একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দু মহাসভা তখন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রচারে তৎপর

হয়ে উঠেছে। ১লা মার্চ লক্ষৌয়ে বীর সভারকর মুসলিম লীগকে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন যে ভারত চায় পূর্ণ স্বাধীনতা এবং হিন্দু মহাসভা যুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তিনি জোর গলায় বললেন স্থায়ী কল্যাণের সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথের সন্ধান এ ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃসাধ্য কঠোর কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন সেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে অমঙ্গলকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। উদারনৈতিক দলের পক্ষে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু মিঃ চার্চিলের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন। কিন্তু অমোঘ অন্ধ অহংকারে মিঃ চার্চিল তখন কোন কিছু শুনতে রাজী নন, তাঁর বিচার বুদ্ধি তখন বিভ্রান্ত।

১৯৪২ সনের ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হ'ল। জাপানের সে রণ-কৌশলের কাছে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ প্রচেষ্টা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দলে দলে প্রবাসী ভারতীয়েরা বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রহ্মদেশ ছেড়ে পায়ে হেঁটে বহুকষ্টে ভারতে এসে পৌঁছুতে লাগলেন। সে দুর্ভোগ ও পথের কষ্ট অনেকে সহ্য করতে না পেরে পথের ধারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রেঙ্গুনের পতনের পর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক ও সোস্যালিষ্ট সদস্যেরা মিঃ চার্চিলের উপর চাপ দিতে লাগলেন। একদিকে রুজভেল্ট অন্যদিকে চিয়াংকাইশেক ও রাশিয়া সমানে মিঃ চার্চিলকে জানাতে লাগালেন যে ভারতবাসীর সহযোগিতা না পেলে জাপানের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা অবিলম্বে প্রয়োজন। মিঃ চার্চিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত চারদিন পরে ১১ই মার্চ ঘোষণা করলেন যে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্বিরোধ অবসানের জন্যে ক্যাবিনেট সদস্য স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে যাবেন। তিনি একটি ঘোষণার খসড়া draft declaration সঙ্গে নিয়ে যাবেন। নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা

করে যা' ব্যবস্থা করবার তিনি করবেন। এই ঘোষণার পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল যে ভারত তার সমস্ত শাক্ত প্রয়োগ করে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং যুদ্ধ শেষে ভারতবাসীর আশা পূরণ করা হবে। তবে তাতে ছিল ভারত বিভাগ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিরাপত্তারও পরোক্ষ ইঙ্গিত।

১৯৪২ সনের ২৩শে মার্চ এলেন স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্—নিয়ে এলেন draft declaration সেই ১৯৪০ সনের আগষ্ট প্রস্তাবের কাঠামোর উপর একটু রং বদল করা। নতুনের মধ্যে এই যে ভারত ইচ্ছে করলে কমনওয়েলথ থেকে সরে যেতে পারবে। সব চেয়ে বড় কথা ছিল Right of India to decide upon a constitution. ক্রীপস্ বললেন তাঁর প্রস্তাবের অর্থ পূর্ণ নিরঙ্কুশ স্বায়ত্ব শাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। তবে সব কিছুই যুদ্ধের শেষে আগে নয়।

স্যার ষ্টাফোর্ড যখন নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন তখন ভারতের উপর জাপানের বোমা বর্ষণ চলছে। কংগ্রেসের ধারণা 'দিন আগত ঐ' ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ। ক্রীপস্ প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারল না। প্রথমতঃ ভারত বিভাগে কংগ্রেসের মত ছিল না, তা ছাড়া দেশীয় রাজন্যবর্গের নিরপত্তার অর্থ ভারতকে বলকান রাজ্যে পরিণত করা। হিন্দু মহাসভা বলল ভারত অখণ্ড ও এক। (১) উদারনৈতিক দলও দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে। মুসলীম লীগ রাজি হ'ল না এই কারণে যে পাকিস্তান সম্বন্ধে ক্রীপস্ প্রস্তাবে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। মিঃ চার্চিল বোড়ের কিস্তিতে বাজিমাৎ করলেন। ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠালেন কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন না। মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরুর প্রশ্নের উত্তরে ক্রীপস্ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে বর্তমান বড়লাটের কাউন্সেলের সঙ্গে প্রস্তাবিত নতুন সরকারের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না।

(1) History of Congress I p 420

ক্রীপস্ দৌত্য যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ জনসনকে ভারতে পাঠালেন আর নিজে কংগ্রেস সভাপতি মৌলনা আজাদকে অনুরোধ জানিয়ে একখানা পত্র দিলেন। ভারতের পরম শত্রু মিঃ চার্চিলের আন্তরিক ইচ্ছে ছিল যাতে ক্রীপস্ দৌত্য বিফল হয়। ক্রীপস্ আপ্রাণ চেষ্টা করলেন যাতে কোন রকমে একটা মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মিঃ জনসন প্রেসিডেন্টকে জানালেন যে ক্রীপসের আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল, তিনি বুঝেছিলেন যে একটা মীমাংসা সম্ভব। তিনি ও পণ্ডিত নেহরু পাঁচ মিনিটেই একটা সুরাহা করতে পারতেন কিন্তু মিঃ চার্চিল তাঁকে সে ক্ষমতা দেন নি। (১)

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মি: জনসনের কাছ থেকে এ সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ চার্চিলকে এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম করে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করলেন যাতে স্যার ক্রীপস্ ভারতের সম্বন্ধে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ফিরে না আসেন। ১১ই এপ্রিলের সে টেলিগ্রামে তিনি লিখলেন যে আমেরিকার লোকের ধারণা জন্মেছে যে ইংলণ্ড ভারতের মীমাংসায় অনিচ্ছুক। (২) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের মত ভারতে একটি স্বাধীন সরকার গঠন একান্ত প্রয়োজন—ভবিষ্যতে তারা আপন সুবিধামত কর্তব্য ঠিক করে নেবে। এইভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। ক্রীপস্ শেষ পর্যন্ত দুঃখ করে স্বীকার করলেন যে সত্যিকারের মীমাংসা লণ্ডন চায় না।

গান্ধীজি ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বললেন 'দেউলে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যতের চেক' a post dated cheque on a crashing bank. কংগ্রেস বলল Cripps is an agent of British reaction. পণ্ডিত নেহরু বললেন It is sad beyond measure that a man

---

(1) Majumdar III p 629—30
(2) Ibid 630

like Sir Strafford Cripps should allow himself to become a Devil's Advocate.

আজও মনে পড়ে কয়েকজন সাংবাদিক যখন ক্রীপস্‌কে বললেন "ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে ইংরেজ কোনদিনই কোন প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। আপনার প্রস্তাবে আমরা আস্থা রাখব কেমন করে—কোন গ্যারাণ্টি নেই ত ? প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কি এ প্রস্তাবে তাঁর সই দেবেন ?" ক্রীপস্ কোন সদুত্তর দিতে না পেরে বললেন 'আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে। আমার গভর্ণমেণ্টের কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না রাখেন ত কোন কিছুরই অর্থ নেই।'

১২ই এপ্রিল ক্রীপস্ ভারত ছাড়লেন। ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে শুনে মিঃ চার্চিল তাঁর স্থুল দেহ নিয়ে ক্যাবিনেট ভবনে নৃত্য করলেন। তাঁর কোন নিকট বন্ধু দুঃখ করে বলেছিলেন যে প্রেসিডেণ্টের জানা উচিত যে ভারত সম্বন্ধে মিঃ চার্চিলের মত একটুও বদল হবে না। মিঃ হ্যারি হপ্‌কিনস্ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বার্তাবহ হয়ে মিঃ চার্চিলের কাছে যান। তিনি বললেন "ভারত সম্বন্ধে রুজভেল্ট ও চার্চিল কোনদিনই একমত হবেন না।" (১) গান্ধীজি দুঃখ করে লিখলেন যে বৃটেন যদি সময়মত সুশৃঙ্খলায় ভারত ছেড়ে চলে যায় তা হ'লে বৃটেন ও ভারত উভয়েরই স্বার্থ রক্ষে হয়। (২)

মোটকথা গান্ধীজি এই সর্বপ্রথম ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সহযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। নেতাজী এই জিনিষই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তখন দক্ষিণপন্থীরা গান্ধীজিকে তাতে মত দিতে দেন নি। এখন কংগ্রেসের সমস্ত নেতারাই তাঁর মতে মত দিলেন কেবল ইংরেজ-দরদী পণ্ডিত নেহরু রাজী হলেন না।

১৯৪২ সনের ১৫ই থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত ব্যাংককে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মহাসম্মেলন। নেতাজী এ সম্মেলনের সার্থকতার উদ্দেশ্যে একটি বাণী পাঠালেন। ব্রহ্ম, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন,

(1) Louis Fischer—II p 111—12 (2) Harijan dt 19-4-42

বীর দামোদর সাভারকর—পৃঃ ৬১
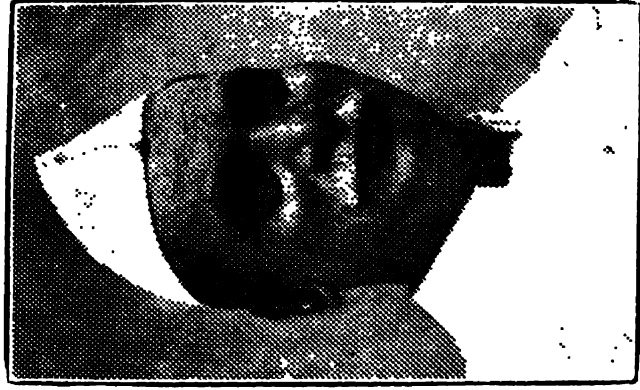
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ—পৃঃ ৬৬

ফিলিপাইনস, জাপান, চীন, বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভা, হংকং এবং আন্দামান থেকে এলেন প্রায় একশ জন প্রতিনিধি আর এল জাপানের হাতে সগুমুক্ত বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ। শ্রীরাসবিহারী বসু তুললেন ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা এবং ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেণ্ডেন্‌স্ লীগ সে অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করাল যে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। সর্ব সমেত পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব পাশ হ'ল তার মধ্যে একটিতে ছিল নেতাজীকে পূর্ব এশিয়ায় এসে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ। প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সভা সমিতি করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন এ সম্মেলনের তাৎপর্য। দেশে দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। একমাত্র মালয়েই দু'শোর বেশী সভ্য সংগ্রহ হ'ল। আই, এন, এ পূর্ণ উগ্যমে তৈরী হতে লাগল দেশের স্বাধীনতার জন্যে।

ইতিমধ্যে ১৯৪২ সনের ২৭শে এপ্রিল এলাহবাদে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হ'ল পণ্ডিত নেহরুর সহযোগিতার প্রস্তাব। কেউ মত দিলেন না গান্ধীজির প্রস্তাবে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দুটো প্রস্তাব জোড়াতালি দিয়ে পাশ করা হ'ল একটা প্রস্তাব। কিন্তু তার আগেই এলাহবাদে পুলিশ হঠাৎ কংগ্রেস অফিস তল্লাসী করে পেয়ে গেল গান্ধীজির হাতের সগু লেখা একটা প্রস্তাবের খসড়া। তাতে লেখা ছিল বৃটেন ভারত রক্ষা করতে অক্ষম। জাপানের সঙ্গে ভারতের কোন বিরোধ নেই। ভারত স্বাধীন হ'লে প্রথম কাজ হবে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। (১) সেদিন গান্ধীজি কিন্তু খুব লজ্জায় পড়েছিলেন।

১৯৪২ সনের ১৪ই জুলাই ওয়ার্দায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে স্থির হ'ল যে ইংরেজকে বলা হবে ভারত ত্যাগের কথা। তার আগে গান্ধী আশ্রমে পালিতা ইংরেজ এডমিরাল দুহিতা মিস্ শ্লেড গান্ধীজি যাঁকে মীরাবেন বলে ডাকতেন তাঁকে বড়লাটের

(1) Edwardes p 81

কাছে পাঠানো হবে তাঁর মনোভাব জানবার জন্যে। কিন্তু বড়লাট নামঞ্জুর করলেন সে সাক্ষাৎ। কংগ্রেসের প্রতি বড়লাটের এই সুগভীর ঔদাসীন্যে বিচলিত হয়ে উঠলেন গান্ধীজি।

কংগ্রেসের নেতারা তখন প্রচার করতে লাগলেন যে আগামী আন্দোলনের রূপ হবে ভয়ঙ্কর। তাঁরা বললেন সকলকে নির্ধারণ করতে হবে নিজ নিজ কর্মপন্থা। ছাত্র সমাজকে দেওয়া হ'ল বেশী করে উৎসাহ। ২৭শে জুলাই পণ্ডিত নেহরু কিষাণদের এক সভায় বললেন যে আগামী আন্দোলনে তাদের কাজই সব চেয়ে বেশী। তারা নিজেরা আন্দোলনের প্রকৃত মর্ম বুঝে নিয়ে দুর্ম্মদ নির্ভীকতায় এগিয়ে যাবে, এ সংগ্রাম ভারতবাসীর শেষ সংগ্রাম। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বললেন গান্ধীজির মতে এ আন্দোলন সারা দেশে আগুনের মত জ্বলে উঠবে। দেশ স্বাধীন হলে সে আগুন নিভবে আর না হলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছে যাবে দেশ থেকে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদে ছাত্রদের এক সভায় বললেন কংগ্রেস তোমাদের কিছু বলতে আসবে না—তোমাদের কাজ তোমরা বেছে নেবে। তোমরা নিজেদের স্বাধীন মনে করে সরকারি আদেশ সব রকমে অমান্য করবে।

১৯৪২ সনের ২৪শে জুলাই কম্যুনিস্ট পার্টির উপর থেকে তুলে নেওয়া হ'ল নিষেধাজ্ঞা। শুধু তাই নয় পার্টির অনেক সভ্য সরকারি চাকরিও পেয়ে গেলেন। ১৯৪২ সনের আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টি কোন অংশ গ্রহণ না করে ইংরেজকে সাহায্য ও কংগ্রেসের বিরোধিতা করবার জন্যে হয়ে উঠলেন বদ্ধ পরিকর। তৎকালীন পার্টির সেক্রেটারি শ্রীযোশীর সঙ্গে হোম মেম্বার স্যার রেজিনাল্ড মাক্সওয়েলের অন্তরঙ্গতা ও পত্রালাপ অনেকেরই কাছে হয়ে উঠল দৃষ্টিকটু। তা সত্ত্বেও শ্রীযোশী তাঁর সঙ্গে বহু গোপন আলোচনা চালাতে লাগলেন। পার্টির নেতৃত্ব সেদিন নিয়ে গেলেন বিপর্য্যয়ের মুখে।

এমনকি সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে শ্রীযোশী পার্টির সভ্যদের নিয়োগ করতে লাগলেন অকুণ্ঠিত ভাবে। (১) দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি ভারত সরকারকে পত্র দিলেন যে তাঁর পার্টি বিনা সর্তে সব সময় তাদের সাহায্য করবে। এমনকি আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত গোপন চক্র ভারতে আছে তাদের ধরিয়ে দেবে কেননা তারা বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী ও পঞ্চম বাহিনীর লোক। (২) সেই পত্রাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পার্টি তখন সরকার থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত ও মুসলিম লীগের সঙ্গেও গোপন চুক্তি বদ্ধ। (৩) সে চুক্তির পেছনে ছিল কংগ্রেসের আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রচেষ্টা। অনেকে বললেন কোথায় গেল রুশ বিপ্লবের মূলমন্ত্র? কোথায় গেল মহামতি লেনিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ মানব জীবনের কল্যাণময় আদর্শ, প্রবঞ্চিতের অমোঘ শক্তি উৎস?

১৯৪২ সনের ৭ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে নেতারা সকলে সমবেত হলেন। বোম্বাইয়ে গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনে ৮ই আগষ্ট প্রস্তাব পাশ হ'ল যে জাপান ভারত আক্রমণ করলে ভারতবাসী তাকে সর্বতোভাবে বাধা দেবে—অস্ত্র অহিংস অসহযোগ। তবে ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে। ছোট্ট দুটি কথা ভারত ছাড় Quit India আর তার মন্ত্র হ'ল do or die গান্ধীজি আবার নতুন করে সেই পুরানো কথা বললেন বড়লাটের সঙ্গে তিনি একবার দেখা করবেন—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি একবার শেষ চেষ্টা করবেন। বড়লাট কিন্তু গান্ধীজির মুখের কথার চেয়ে তাঁর হাতের লেখা প্রস্তাবের খসড়ায় বিশ্বাস করলেন বেশী। গান্ধীজি যদি শুধু রাজনীতি নিয়ে থাকতেন তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু

---

(1) Masani p 82—83 (2) Ibid p 83—84
(3) Letter published in Bombay chronicle dt 17-3-46

তিনি রাজনীতি ও ধর্মনীতি একই পাল্লায় নিয়ে চলতেন তাই অনেকের কাছে এটা বিসদৃশ লাগল। কংগ্রেসের সেদিনের সেই নৈতিক অবনতি সত্যই মর্মান্তিক। (১)

৮ই আগষ্ট পাশ হ'ল ভারত ছাড়ার প্রস্তাব। গান্ধীজি সেদিন বললেন "ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আমি কালক্ষেপ করতে পারি না। মিঃ জিন্নার মনোভাব পরিবর্তনের আশায় আমি কালক্ষেপ করব না। তা' করলে ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন। এই আমার শেষ সংগ্রাম।" হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ বাবু যে কথা বলেছিলেন যে ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে তা' এতদিন পরে প্রকারান্তরে গান্ধীজি স্বীকার করলেন।

ইংরেজ যে তখন মুসলিম লীগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে গান্ধীজির চেয়ে অন্য কোন নেতা বোধহয় এ ব্যাপার ভাল করে জানতেন না। তবুও গান্ধীজি ভুলে গেলেন যে "গভর্ণমেণ্টের দানের সঙ্গে আমাদের শক্তির কোন সহযোগিতা নেই, তার দানই আমাদের বিপদ ঘটায়। গভর্ণমেণ্ট যখন শ্রেণী বিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করে তোলে তখন ঘরের মাঝেই বিদ্বেষ জ্বলে ওঠে।"

(1) Edwardes p 81

ছয়

পরের দিন ৯ই আগষ্ট ভোরে সমস্ত কংগ্রেস নেতারা বন্দী হয়ে গেলেন। গান্ধীজিকে সম্মান দেখিয়ে তাঁর স্ত্রী ও সেক্রেটারি শ্রীমহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গে পূর্ণ মর্যাদায় রাখা হ'ল আগা খাঁ প্রাসাদে। গান্ধীজির জীবনে এই কারাবাসই শেষ কারাবাস। অন্যান্য নেতারা থাকলেন ভিন্ন ভিন্ন জেলে। পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট সদস্যগণ গেলেন আমেদাবাদ দুর্গে। আগষ্ট প্রস্তাব দেশের তরুণদের প্রাণে এনে দিল নতুন স্ফুলিঙ্গ। মুক্তি-কামী তরুণেরা এতদিন যুদ্ধের কোন সুযোগই নিতে পারেন নি। তাঁরা অধীর আগ্রহে ছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত আক্রমণের প্রতীক্ষায়।

ইংরেজের অপপ্রচার আর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতাদের ব্যঙ্গ শ্লেষাত্মক বক্তৃতা দেশের তরুণদের বিভ্রান্ত করতে পারে নি। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে একাধিকবার বলেছিলেন যে "সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।" কম্যুনিষ্ট পার্টিও আই. এন. এ.র কার্যকলাপ বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। তবুও তরুণেরা এ সুযোগে এগিয়ে এলেন বিপ্লবাত্মক কাজের মধ্যে। এ আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা কোন অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলেন না, পেলেও হয়ত থামাতে পারতেন না। বারুদ তৈরী ছিল শুধু একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা।

কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল অহিংস নীতির সম্পূর্ণ পরাজয়। আরম্ভ হ'ল জীবন বৈচিত্র্যের একটা বিপুল সমারোহ—ভারতের জেলায় জেলায় তার বিশাল পটভূমি—পরাধীন জাতির মহৎ পরিচয়ের বৈপ্লবিক কর্মসূচী। পণ্ডিত নেহরু

পরে দুঃখ করে বলেছিলেন যে তাঁরা গত কুড়ি বছর ধরে যে অহিংস নীতি প্রচার করে এলেন লোকে একদিনেই ভুলে গেল তার প্রভাব। পরোক্ষভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে গান্ধীজির এতদিনের সাধনা বৃথাই হয়েছে—অহিংস নীতি লোকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নি—দেশ তখন সে আদর্শ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে ১৯৪২ সনের আন্দোলনে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না।

৯ই আগষ্ট হয়ে গেল বোম্বাই, আমেদাবাদ ও পুণায় সংগ্রাম আরম্ভ। ১০ই আগষ্ট দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে আন্দোলন সুরু হয়ে ১১ই থেকে অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে চলল—দেশ তখন মেতে উঠেছে অস্থির দুরন্তপনায়। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, সরকারি অফিস ও বাসভবনের ক্ষতিসাধন, রেল টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট অফিসগুলো অকেজো করবার চেষ্টা চললো দিনের পর দিন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও হিংসাত্মক কাজের মধ্যে তখন দেশের যুবশক্তির স্বতঃপ্রণোদিত আত্ম-নিয়োগ। সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও কর্মচারীদের প্রাণরক্ষার জন্যে পুলিশ ও সৈন্য তলব করা সত্ত্বেও কোন ফল হ'ল না। পূর্বরেলওয়ের অধিকাংশ ও বি. এণ্ড. এন. ডব্লুউ. রেলওয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশ চিরদিনই ধ্বংসাত্মক কাজে অগ্রণী—এ সহজাত কর্মপ্রেরণা অপ্রতিরোধ্য।

১০ই আগষ্ট বাংলা সরকার ঘোষণা করল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনি বলে। ১২ই আগষ্ট কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্রেরা সভা সমিতি করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের জানালেন প্রতিবাদ। ১৩ই আগষ্ট শ্রীমানী বাজারের সামনে পুলিশের গুলিতে প্রথম প্রাণদিলেন শ্রীবৈদ্যনাথ সেন—সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ল অশান্তির আগুন। পরের দিন ভবানীপুরে দু'জন ছাত্র নিহত ও কয়েকজন হলেন আহত। তখনকার বাংলার

মুখ্যমন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হকের বিবৃতি থেকে জানা গেল আগষ্ট মাসে ২০ জন নিহত, ১৫২ জন আহত ও বন্দীর সংখ্যা ৩৫০০ জন। (১)

সরকারি দমন নীতিরও তখন অবাধ গতি। মাসখানেকের মধ্যে আন্দোলনের তীব্রতা কিছু অংশে কমে গেলেও বাংলাদেশে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এ সময় কয়েকজন দিল্লীতে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে শেষ করে দেবার জন্যে চেষ্টা করলেন। দিল্লীর এই 'ছায়া ওয়ার্কিং কমিটি' নেমে পড়লেন হিংসাত্মক কাজে—অহিংসনীতি তখন নিশ্চিহ্ন। বড়লাটের একটা সিনেমায় আসবার কথা ছিল—সেখানে একটা বোমা রাখা হ'ল সময়মত ফাটবার অপেক্ষায়। বড়লাট কিন্তু গেলেন অন্য সিনেমায়—। বোমা ফাটল বড়লাট রইলেন অক্ষত। (২) প্রধান সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল যাচ্ছিলেন দিল্লী থেকে বোম্বাই। প্রথম পাইলট ট্রেন চলে যাবার পর বিপ্লবীরা একটা ডিনামাইট বসালেন রেল লাইনের ধারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য—ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগে আর একটা পাইলট এঞ্জিন ছাড়ল। ডিনামাইট স্বধর্ম পালনে কার্পণ্য করল না—লর্ড ওয়াভেল চলে গেলেন অন্য পথে। (৩) রাজপুতানায় বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার স্থাপন করলেন—সেখানের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলের বাড়ীতে একটা বোমাও ফাটল। তখন ভারতে অনেক বিদেশী সৈন্য। তাদের কাছ থেকে অনেকেই টমিগান, রিভলভার, রাইফেল, জলিগনাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ করে ফেললেন। পুলিশের কিছু কিছু লোক গোপনে বিপ্লবীদের খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করতে লাগল পরোক্ষভাবে। আই. এন. এ.র প্রভাব তখন আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করেছে।

---

(1) Amrita Bazar Patrika Independence Number 1947 p 133-34
(2) India in Revolt—Tarini Sankar Chakravarty p 29
(3) Ibid p 30

উত্তর ভারতে পনরটি রেল ষ্টেশন ভস্মীভূত, একশ চারটি ক্ষতিগ্রস্ত, ষোল জায়গায় ট্রেণ লাইন চ্যুত ও বহু জায়গায় রেল লাইন হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন। চারশ পঁচিশটির বেশী টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট, একশ উনিশটি পোষ্ট অফিস ভস্মীভূত, বহু সরকারী ভবন, নথিপত্র ও গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত, বত্রিশজন পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ কর্মী আহত, পুলিশের ষোলজন নিহত ও বত্রিশজন হ'ল আহত। সঠিক সংখ্যা নির্ণয় অবশ্য শক্ত। হোম মেম্বার আইন পরিষদে যে হিসেব দিলেন তাতে দেখা গেল বন্দী হয়েছে ৬০২২৯ জন ৯৪০ জন সৈন্যের গুলিতে নিহত, ১৬৩০ জন আহত, ভারতরক্ষা আইনে আটক করা হয়েছে ১৮০০০ লোককে। বিপ্লব দমন করতে ৬০ জায়গায় ৫৩৮ বার গুলি চলেছে এয়ারোপ্লেন থেকে অনেক জায়গায় গুলিবর্ষণ হয়েছে আর পাইকারি জরিমানা হয়েছে উত্তর ভারতে ২৮৩২০০ টাকা। (১)

আন্দোলন দমন করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় চলল অনাবশ্যক রুদ্র চণ্ডনীতি। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখন সৈন্যব্যারাকে পরিণত। বিহারের মুঙ্গের শহর রইল দু' সপ্তাহের জন্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। সে এক অচিন্তনীয় উন্মাদনা। এসময়ে যুক্তপ্রদেশের বালিয়ায় বিপ্লবীরা ১৮ই আগষ্ট সহরের বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ নষ্ট করে দিয়ে পরের দিন কালেক্টরী ও ট্রেজারী আক্রমণ করবেন ও জেল ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্তি দেবেন বলে স্থির করলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সে কথা জানতে পেরে তখনই জেলে গিয়ে কংগ্রেস নেতাদের কাছে চাইলেন সাহায্য। তাঁরা সম্মত হলেন—শ্রীছিটু পাণ্ডে ও তাঁর একশজন সঙ্গী মুক্তি পাবার পর টাউন হলে তাঁদের জানান হ'ল বিরাট সম্বর্ধনা। ২০শে আগষ্ট বালিয়ার লোকেরা বালিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে শ্রীছিটু পাণ্ডের নেতৃত্বে নতুন সরকার স্থাপন করে প্রমাণ করলেন যে ইংরেজ শক্তি সেদিন কীর্তি-

(1) Ibid p 31

নিঃস্ব। পুরানো সরকারী কর্মচারীদের বন্দী করে নতুন সরকার করলেন কোষাগার ও অস্ত্রাগার নিজেদের করায়ত্ব। ২২শে ও ২৩শে আগষ্ট বাইরে থেকে সৈন্য আমদানি করার পরই আরম্ভ হয়ে গেল নির্বিচারে লুটতরাজ, গুলিবর্ষণ, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ। বিহারের উত্তর ভাগলপুরেও অনুরূপ স্বাধীন সরকার হ'ল গঠিত। (১)

আসামে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর ১৯৪২ সনের ২৫শে আগষ্ট স্যার মহম্মদ ক্ষমতায় আসীন হয়ে কংগ্রেস কর্মীদের উপর আরম্ভ করালেন অকথ্য অত্যাচার। ২০শে সেপ্টেম্বর গোহপুর থানায় কংগ্রেস পতাকা ওড়াবার জন্যে ১৪ বছরের কিশোরী কনকলতার নেতৃত্বে চলল শোভাযাত্রা। থানার দারোগা তাঁকে নিষেধ করলেন —প্রত্যুত্তরে বীরাঙ্গনা ভগিনী উত্তর দিলেন 'দেশ স্বাধীন হয়েছে— ইংরেজের পদলেহন করবার কোন নৈতিক যুক্তি নেই।" পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন প্রাতঃস্মরণীয়া ভগিনী কনকলতা—দুঃসাধ্য তাঁর তপস্যা, নিষ্কলঙ্ক তাঁর জীবন যজ্ঞের সাধনা। শ্রীমুকুন্দ কাকোতি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত থেকে পতাকাটি নিয়ে ছুটলেন থানার দিকে—তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলেন কিন্তু মরার আগে তাঁর মুখে হাসি—চেয়ে আছেন থানার দিকে সেখানে উড়ছে জাতীয় পতাকা। ভগিনী কনকলতার সঙ্গীরা অন্যদিক থেকে এসে থানার উপর উড়িয়ে দিয়েছেন—স্বাধীনতার প্রতীক। যে কিশোর এ কাজটি করলেন তাঁকে ও অন্য একটি বার বছরের বালিকা তুলেশ্বরীকে প্রাণ দিতে হ'ল পুলিশের হাতে। থানার ভেতর থেকে কলকাতা থেকে ভাড়া করা মুসলমান গুণ্ডারা বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রীদের আক্রমণ চালাল। (২)

তার আগে ২৬শে আগষ্ট কামরূপের সোরভোগ বিমান বন্দর আক্রমণ করার জন্যে হাজার লোক চালালেন অভিযান। বহরমপুরের

(1) Nehru II 431
(2) Amrita Bazar Patrika—Independence Number P. 148-49।

একটি তের বছরের কিশোরীর হাত থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর একজন ইংরেজ সেনানায়ক কংগ্রেস পতাকা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে ধস্তাধস্তিতে পড়ে গেলেন কিশোরী রত্নমালা। পাশে ছিলেন বৃদ্ধা পিতামহী শ্রীমতী ভোগেশ্বরী ফুকননী। অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনায় বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের পতাকার দণ্ড দিয়ে মারলেন সেনানায়কের মাথায় পরমুহূর্তেই বুলেটে প্রাণ দিলেন বৃদ্ধা। কাতারে কাতারে লোক ছুটে এল—পুলিশ ও সৈন্য বেওনেট উঁচিয়ে ধরল। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও শ্রীলক্ষ্মীরাম হাজারিকা ও তাঁর পাশে দু'ভাই শ্রীতনুরাম সুট ও শ্রীবলুরাম সুট বিশাল পাহাড়ের মত বুক পেতে দাঁড়ালেন। বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে শ্রীলক্ষ্মীরাম নিজের জামার পকেটে হাত দিয়ে পেলেন মাত্র ছ'টি পয়সা। বন্ধুদের বললেন 'দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমার জীবন ও এ অর্থই আমার শেষ দান।' লুটিয়ে পড়ল তাঁর দেহ মৃত্যু-মহাসাগর সঙ্গমে। মানুষকে গুলি করে মারা সহজ কিন্তু তাকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা সহজ নয়। সমবেত জনতা এই দুর্লভ দুর্মূল্য চারজন বীরের শব সারারাত্রি মালা চন্দনে সাজিয়ে সকালে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেলেন। (১) দেশপ্রেমের সদাব্রতে এ মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়—উদয়াচলের স্বর্ণ শিখরে নবীন আলোর সমারোহ।

শিবসাগরে পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে বিপ্লবীরা গঠন করলেন 'মৃত্যু বাহিনী'। তাঁরা সৈন্য বোঝাই ট্রেণ, রসদ বোঝাই গাড়ী, সরকারি অফিস, বাসভবন ও থানা ধ্বংস করার কাজে লেগে গেলেন। তাঁদের নেতা হিসাবে শ্রীকোশল কানওয়ারের হ'ল ফাঁসির হুকুম। ১৯৪৩ সনের ১৬ই জুন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কানওয়ার বলে গেলেন 'মৃত্যু মানুষের অবধারিত পরিণতি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে মৃত্যু বরণের মধ্যে আমার

(1) Amrita Bazar Patrika-Independence no. 1947 p. 149

সুদূর বিস্তীর্ণ অনাস্বাদিত আনন্দ। ভগবানের অশেষ অনুগ্রহের এ দান আমি পরমানন্দে মাথা পেতে নিলুম। আমি ভাগ্যবান।' (১) অন্য নেতা শ্রীকমলা মিরি জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচারে প্রাণ দিলেন (২)—'মৃত্যুরে করিল দগ্ধ দীপ্ততেজে মৃত্যুরই দহনে।'

বিহারের ভাগলপুরের প্রায় প্রতিটি থানা বিপ্লবীরা দখল করলেন। শ্রীসৈরাম সিংএর নেতৃত্বে চলল আন্দোলন। পুলিশ ও সৈন্যের গুলিতে প্রাণ দিলেন ২১৮ জন—আহত হলেন ২৮০ জন। পীরপস্থীতে ৩৭ জন নিহত, ৬২ জন আহত, সুলতানগঞ্জে ৬৭ জন নিহত ও ১৫০ জন হলেন আহত। দ্বারভাঙ্গায় প্রাণ দিলেন ৩৮ জন আহত হলেন শতাধিক। (৩)

১৯৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরে জ্বলে উঠল বিপ্লবের আগুন। পুলিশ অফিসার শ্রীসুধীরকুমার সরকার কয়েকজন কনেষ্টবল নিয়ে দানিপুরে এক চালের কলে গিয়ে যুদ্ধের জন্যে চাল চালান দেবার ব্যবস্থা করছেন জানতে পেরে প্রায় দু'হাজার তরুণ এগিয়ে এসে তাঁদের দাবী জানালেন যে যুদ্ধের জন্যে এ চাল বিদেশে চালান যাবে না। আরম্ভ হ'ল সংঘর্ষ। পুলিশের গুলি চালানর খবর পাবামাত্র আরও দু'হাজার গ্রামবাসী এলেন ছুটে। তাঁরা তখন মরবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়ালেন। তমলুক থানার তৃতীয় দারোগা চল্লিশজন রাইফেলধারী কনেস্টবল নিয়ে হাজির হওয়া সত্ত্বেও চাল রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে ময়না তদন্তের পর পুলিশের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের শব ফেরৎ দেওয়া হবে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তারা পালন না করে মৃতদেহগুলি নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। কিন্তু তখন দেশের লোকের মজ্জায় দুর্জয় তেজ—। জল থেকে সেগুলি তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আবার ছিনিয়ে নিয়ে এক চিতায় সকলকে দাহ করায়

(1) Amrita Bazar Patrika Independence No. 1947 p 151
(2) Ibid 151 (3) Ibid p 177.

অনুমতি দিল। (১) মুখর ইতিহাস মৌণ হয়ে রইল আপন তপস্যার আসনে।

পরের দিন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছ'টা গ্রাম থেকে প্রায় দু'হাজার নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করে এনে তাদের সারাদিন রোদে বসিয়ে রাখলেন—তার মধ্যে তের জনের জেল হয়ে গেল। মিলের মালিকেরা সেদিন অপরাধ স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে দু'হাজার টাকা জরিমানা দিলেন। সেই টাকার মধ্যে ১৫০০৲ টাকা দেওয়া হ'ল মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনদের। (২)

তারপর থেকে আরম্ভ হয়ে গেল হিন্দু মুসলমানের মিলিত কর্ম-প্রচেষ্টা, নিয়মিত পিকেটিং, থানায় থানায় সভা আর মাঝে মাঝে হরতাল পালিত হতে লাগল। দেশবাসীর মনে তখন বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ। মহিষাদল থানায় ২০০০ লোকের সমাগমে সভা আরম্ভ হতেই তমলুকের এস. ডি. ও. মিঃ শেখ চারজন বক্তাকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন—জনতা রুখে দাঁড়াল। লাঠি চার্জের হুকুম দিলেন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট—পুলিশ সে আদেশ পালনে অসমর্থতা জানাল।' দর্পোদ্ধত প্রতাপের অবমানিত ভগ্নশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট ফিরে এলেন। তমলুক হ্যামিণ্টন হাইস্কুলের ও অন্যান্য স্কুলের ছাত্রেরা এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে সবার আগে এগিয়ে চলল। সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম থানার অধিবাসীরা পুলিশ সৈন্যদের অত্যাচার নীরব অহিংসভাবে সহ্য করতে রাজী হলেন না। ২৯শে সেপ্টেম্বর এক প্রকাশ্য সভায় তাঁরা স্থির করলেন যে একযোগে থানা, আদালত ও সরকারি আফিস আক্রমণ করা হবে। এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এলেন। হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ নেই—মিঃ জিন্নার ফতোয়া হয়ে গেল অচল। ভারতের বিপ্লবীরা কোনদিনই হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করে দেখেন নি।

বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলে রাস্তা ঘাট বন্ধ করে ৩০টি কালভার্ট

(1) Indian in Revolt—Chakravorty p 39 (2) Ibid.

ভেঙ্গে রাস্তার মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত তৈরী করে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হ'ল। হুগলী ও কোশী নদীর সমস্ত নৌকা জলের তলায় চলে গেল। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে আসতে গিয়ে দেখল যে রাস্তা ঘাট সব বন্ধ। কয়েকজন নিরীহ বৃদ্ধকে বেওনেটের ভয় দেখিয়ে রাস্তা মেরামত করার কাজে নিয়োগ করল পুলিশ। দু'একদিনের মধ্যে একটি থানা, দু'টি ফাঁড়ি, দু'টি সাব রেজেষ্ট্রী অফিস, তেরটি পোষ্ট অফিস, নয়টি ইউনিয়নবোর্ড অফিস, দশটি পঞ্চায়েৎ অফিস, চারটি ডাকবাংলো আর মহিষাদল রাজ এষ্টেটের তেরটি কাছারি হ'ল ভস্মীভূত। ৩৫০ জন চৌকিদারের পোষাক কেড়ে নিয়ে পালিত হ'ল বহ্নিমহোৎসব। তেরজন সরকারি কর্মচারী ও পুলিশ অফিসারকে বন্দী করে তাঁদের কাছ থেকে চাকরিতে ইস্তফা দেবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে গাড়ীভাড়া দিয়ে পাঠানো হ'ল নিজ নিজ দেশে। ছ'টি রাইফেল ও কিছু তলোয়ার বিপ্লবীরা সংগ্রহ করলেন। (১) সরকার বুঝল এ ইঙ্গিত দৃঢ় নির্মম।

তমলুক সহরে তখন পড়েছে পুলিশ ও সৈন্যের চক্রচিহ্ন। হিন্দু মুসলমান নরনারী নির্বিশেষে দলে দলে শোভাযাত্রায় চলেছেন তমলুকের দিকে। পুরানো দিনের তাম্রলিপ্ত বহুযুগ পরে তার অতীত গৌরবের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চারদিক থেকে শোভাযাত্রা চলেছে। পশ্চিম দিক থেকে প্রায় ৮০০০ লোকের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ অফিসার মনীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আদেশে লাঠি চার্জ আরম্ভ হ'ল কিন্তু কোন ফল হ'ল না। জনতা নিরুদ্বিগ্ন মনে এগিয়ে চলল। এবার গুলি—পাঁচজন মৃত্যুবরণ করলেন আপন পরিচয়কে উপেক্ষা করে আহত হলেন অনেকে। শ্রীরামচন্দ্র বেরা আহত হয়ে যখন রাস্তায় পড়ে আছেন তখন সৈন্যেরা তাঁকে সেই অবস্থায় রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে থানার সামনে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরতে তিনি অতিকষ্টে

(1) India in Revolt—Chakravarty p 42

শরীরটাকে কোন রকমে থানার দরজার বাইরে এনে জয়ের আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠলেন 'থানা দখল করেছি জয় আমাদের।' নেভবার আগে প্রদীপ যেন একবার জ্বলে উঠল—আরব্ধ কর্মপথে যে অকৃতার্থ হন নি সেই আনন্দেই দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিলেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ। (১) সে দৃশ্য দেখে থানার রাইফেলধারী কনেষ্টবলদের চোখ ছল ছল করে উঠল। রচিত হ'ল আত্মগৌরবের স্পর্ধিত কাহিনী।

উত্তর দিক থেকে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে আসছিলেন আব একদল। অফিসার অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের হুকুমে সৈন্যদল পথরোধ করে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমান লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামে ১৩ বছরের একটি কিশোর ছুটে সৈন্যদলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা রাইফেল কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই নির্দয় প্রহারে সেই সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চল জীবন চিরদিনেব মত স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পিছনে তাকাবার সময় নেই—চলেছেন পতাকা হাতে দিগ্বিজয়ে শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরা—লোকে তাঁকে আদর কবে ডাকত গান্ধীবুড়ি। তখন রাইফেলের স্বরবর্ষণ আরম্ভ হয়েছে মহাসমাবোহে। বৃদ্ধার চোখে তখন সুপ্ত বজ্রের ইঙ্গিত। বুলেট এসে লাগল দুটি হাতে—তবুও অন্তর বিদ্রোহে জয়ী বৃদ্ধা পতাকা উঁচু করে ধবে বললেন 'সৈন্যগণ তোমরা চাকরি ছেড়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দাও।' (২) আরও একটা বুলেট এসে লাগল তাঁর কপালে। মুখ বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল—পড়ে গেলেন তিনি মাটিতে তবুও হাত উঁচু করে ধরে রইলেন পতাকা। দেশের জন্যে প্রাণ দিলেন তিনি—মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল অমৃতের জ্যোতি। স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লেন *চিরদিন*—তমলুক ধন্য হয়ে রইল জন্মজন্মান্তরের মত। তাঁর আত্মদান সংকীর্ণ জীবন সরোবরের গভীর অগোচরের সীমা ছাড়িয়ে চলে গেল

---

(1) India in Revolt—Chakravarty p 47—48 (2) Ibid

বিশ্বভৌমিকতায়। তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন শ্রীপুরিমাধব প্রামাণিক, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সামন্ত, শ্রীজীবন কৃষ্ণ বেরা ও আরও অনেকে—আহত হলেন বহুজন। (১) ইতিহাসের অসংখ্য দীপদীপ্ত রঙ্গমঞ্চের উপর জ্বলে উঠলো আরও কয়েকটি আলো।

দক্ষিণ দিক থেকে এলেন আর একদল। তাঁরা সাকড়া বাঁধের কাছ বরাবর আসতেই সৈন্যেরা গুলি চালাতে আরম্ভ করল। প্রাণ দিলেন শ্রীনিরঞ্জন জানা, আহত হলেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাইতি প্রমুখ কয়েকজন। মহিলারা ছুটে এলেন সেবার জন্যে, সৈন্যদল তাঁদের তাড়া করতেই আর একদল বঁটি হাতে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের সে মূর্তি ও সাহস দেখে সৈন্যেরা সরে এল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাইতি দু'দিন পরে হাসপাতালে মারা গেলেন। (২)

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ৩০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এলেন—সেদিন তমলুকের অন্য এক রূপ। সেনানায়ক অপূর্ব ঘোষ চীৎকার করে বললেন 'যারা বুলেট খেয়ে মরতে প্রস্তুত তারাই যেন এগিয়ে আসে।' তাঁর কথা শুনে সবার আগে এগিয়ে এলেন কয়েকজন মহিলা—পরে এলেন আরও অনেকে 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান।' গুলি না চালিয়ে তাঁদের উপর লাঠি চার্জ হল। কয়েক-জনের হয়ে গেল কারাদণ্ড। পরের দিন সহরে প্রতিপালিত হ'ল পূর্ণ হরতাল।

২২শে সেপ্টেম্বর মহিষাদল থানায় অনুরূপভাবে প্রাণ দিলেন শ্রীযামিনীকান্ত কামিলা, শ্রীঅনন্তকুমার পাত্র আর আরও তিনজন। বেলকনি থানায় প্রাণ দিলেন শ্রীভজহরি রাউত, শ্রীবংশীধর কর, শ্রীচন্দ্রমোহন জানা, শ্রীহেমন্ত কুমার দাস, শ্রীচৈতন্য বেরা, শ্রীবৈশ্য-চরণ মহাপাত্র, শ্রীশিবপ্রসাদ, শ্রীচন্দ্রমোহন দাস, শ্রীসর্বেশ্বর প্রামাণিক, শ্রীরামপ্রসাদ জানা। মহিষাদল থানা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করলেন বিপ্লবীরা—পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন

(1) India in Revolt—Chakravarty p 48, (2) Ibid 49

শ্রীশশিভূষণ মান্না, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দিড়াবেরা। 'দুঃসহ দুঃখের মরণ তন্তু দিয়ে গাঁথা রইল' সে দারুণ কাহিনী ভাবীকালের সাক্ষ্য হয়ে।

২৭শে সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম থানায় পুলিশের গুলিতে জীবন দিলেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীভানু রানা, শ্রীভূতনাথ সাহু ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস। অলক্ষ্য অন্তরালে ছড়ানো রইল অনুঙ্করিত সফলতার বীজ আত্মদানের বাঞ্ছিত সাধনায়।

২৯শে সেপ্টেম্বর বৃন্দাপুর থানায় প্রাণ দিলেন শ্রীগৌরহরি কামিলা ও শ্রীগান্ধার সাহু। সেই দিনই মহিষাদল থানায় তৃতীয় বার আক্রমণ হ'ল। পাঁচ হাজার লোকের উপর চলল গুলি। থানার দারোগার সঙ্গে স্থানীয় জমিদারের দেহরক্ষী জি. সাহেব দাঁড়িয়েছিল। জি. সাহেব হঠাৎ গুলি চালাতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন দু'জন—আহত হলেন আঠার জন। ঠিক এই সময় আরও দুটি দল এসে থানা আক্রমণ করল। পুলিশের গুলির মধ্যেও তাঁরা দ্বিতীয় দারোগার বাসায় লাগিয়ে দিলেন আগুন—গুলিতে কে বাঁচল কে মরল দেখবার সময় নেই। আক্রমণ অব্যাহত রইল। জি. সাহেবকে আর দেখা গেল না প্রাণভয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে মারা গেলেন শ্রীভোলানাথ মাইতি, শ্রীহরিচরণ দাস, শ্রীআশুতোষ কুইলা, শ্রীসুধীরচন্দ্র হাজরা, শ্রীপ্রসন্নকুমার ভূঞা, শ্রীপঞ্চানন দাস, শ্রীরাখালচন্দ্র সামন্ত, শ্রীক্ষুদিরাম বেরা আরও কয়েকজন। 'মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো'। সেই তৃষিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আজও আকাশে বাতাসে ভাসছে।

ঐদিনই সুতাহাটা থানা বিপ্লবীরা একদলে ৪০,০০০ লোক আক্রমণ করলেন। থানার দারোগাদের বন্দী করে তাঁরা ছ'টি রাইফেল ও কিছু অস্ত্রাদি সংগ্রহ করলেন। থানা, খাসমহল অফিস, সাবরেজেষ্ট্রী অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস আর কয়েকখানা সরকারি

শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরা—পৃঃ ৭

মহাত্মা গান্ধী--পৃঃ ৯০

বাড়ী পোড়ান হ'ল। ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রায় দশ হাজার বিপ্লবী করলেন নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ। পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন শেখ আলাউদ্দীন আর চারজন, আহত হলেন ষোল জন। গাঁজা ও আফিংএর দোকান, ঋনশালিশী বোর্ড অফিস, বাজার কাছারি ও পোষ্ট অফিস হ'ল ভস্মীভূত। কেশপুর থানায় ঐ দিনই মারা গেলেন শ্রীমতী শশীবালা দাসী, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ আরও দু'জন। দিনের পর দিন চলল 'দুর্দাম সর্বনাশের বজ্র ঝঞ্ঝনিত মৃত্যু মাতাল হুহুংকার।' একে একে প্রাণ দিলেন শ্রীঅমূল্য শাসমল, শ্রীসুধীর চন্দ্র মাইতি, শ্রীকেদার নাথ জানা, শ্রীমুচি রাম দাস, শ্রীভগীরথ রথ, শ্রীমুরারী মোহন বেরা, শ্রীবিপিন বিহারী মণ্ডল, শ্রীচন্দ্রমোহন দিন্দা ও শ্রীহরেকৃষ্ণ ধর। তাঁদের ক্ষুব্ধ আত্মার পিপাসা মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল বিশ্বের প্রাঙ্গণে চিরদিনের জন্যে।

ভগবানপুর থানায় ১৮ই অক্টোবর প্রাণ দিলেন শ্রীযুধিষ্ঠির জানা, শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস, শ্রীজগন্নাথ পাত্র, শ্রীনাথ চন্দ্র প্রধান, শ্রীহরি চরণ বেরা, শ্রীরামকান্ত দাস, শ্রীরঘুনাথ মণ্ডল, শ্রীহরিপদ মাইতি, শ্রীপরেশ চন্দ্র জানা, শ্রীকৃষ্ণ মোহন চক্রবর্তী, শ্রীভূষণ সামন্ত ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাশপাঠ। (১) মৃত্যুর পরিপূর্ণতার গভীরে মধুময় জীবন পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠল সুবিপুল অবকাশময় স্তব্ধতার মাঝে।

ভারত গভর্ণমেন্ট তখন মেদিনীপুরে কয়েক হাজার গোরা ও পাঠান সৈন্য আমদানি করেছে। চলেছে নির্বিচারে লুঠতরাজ, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ও অকথ্য অত্যাচার। ১৬ই অক্টোবর এল সাইক্লোন। কলকাতা থেকে আগেই তিনখানা টেলিগ্রাম এসেছিল ; এস. ডি. ও. সে খবর জনসাধারণকে জানাবার প্রয়োজনই মনে করেন নি। প্রকৃতির রুদ্ররোষবহ্নি মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা কিছুদিনের জন্যে ব্যাহত করে দিল। সরকারের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে

(1) Chakravarty—India in Revolt p. 96-97 ; 115.

বিপ্লবীরা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার, ১৭ই ডিসেম্বর গঠন করে ১৯৪৪ সনের ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত তার কাজ চালালেন। গভর্ণমেণ্টের এই নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬ই নভেম্বর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন।

দিনাজপুরের বালুরঘাটে পোষ্ট অফিস, আদালত, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, পাট অফিস, আবগারী ইনস্পেক্টর অফিস করা হ'ল আক্রমণ। সব জায়গায় লাগানো হ'ল আগুন। শেষ পর্যন্ত সরকার আদায় করল ৭৫০০০ টাকা পাইকারি জরিমানা। ২৯শে আগষ্ট বোলপুরে হিন্দু মুসলমান ও সাঁওতালদের সম্মিলিত দল আক্রমণ করে বসল বোলপুর রেলষ্টেশন। পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে সাঁওতালদের তীর ধনুক ব্যবহৃত হ'ল খণ্ডযুদ্ধে। পূর্ববঙ্গে ছাত্রের দল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করে ১৪ই আগষ্ট নবাবপুর, ওয়ারি, টিকাটুলি, লক্ষ্মীবাজার, ফরাসগঞ্জ ও ওয়াল্টার রোডের পোষ্ট অফিসগুলি দিলেন নষ্ট করে। ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলসের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে এল বেরিয়ে। বরিশাল, নদীয়া, যশোহর, বগুড়া, ত্রিপুরা এবং অন্য জায়গাতেও বিপ্লবীরা করলেন আত্মপ্রকাশ। সরকার পাইকারি জরিমানা আদায় করল পাইকারি হারে। (১)

২৫শে সেপ্টেম্বর কামরূপের পাটাচারকুচি থানার দারোগা, মদন চন্দ্র বর্মন নামে বজালী হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ও সদারী গ্রামের শ্রীরাউত রাম দাস নামে দু'জন ছাত্রকে মারল গুলি করে।

এই সময় মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা দিনের পর দিন ধ্বংসাত্মক কাজের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। শ্রীনানা পাতিলের নেতৃত্বে গ্রাম-রাজ্য স্থাপিত হয়ে বহুদিন ধরে তাঁরা শাসন কার্য চালালেন। (২)

---

(1) Amrita Bazar Patrika—Independence Number p 155
(2) Ibid

একদিন মহারাষ্ট্র ছিল বিপ্লবী ভারতের পথ প্রদর্শক। আজও মনে পড়ে মহারাষ্ট্রের বীর সন্তানগণের অতীতের কর্মপ্রচেষ্টা। পুণায় তখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। সরকার তার প্রতিকারের জন্যে নিত্য নতুন হুকুম জারি করে শেষে বলল যে রোগী বলে কোনরকম সন্দেহ হলেই তাদের হাসপাতালে যেতে হবে। সাতারার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ র‍্যাণ্ড ছিলেন ইংরেজ জাতির কলঙ্ক। রোগ নির্ণয়ের জন্যে ডাক্তারি পরীক্ষার সময় পুরুষদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও স্ত্রীলোকদের চোলি অর্থাৎ জামা খুলে সায়া উঁচু করে তুলে ধরে রাস্তায় সার বেঁধে দাঁড়াবার আদেশ দিলেন তিনি। (১) দেশব্যাপী এর তীব্র প্রতিবাদ উঠতেই শিক্ষিত লোকদের নির্বিচারে জেলে পাঠানো আরম্ভ হ'ল। হ'ল তুই নাটুভায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার। দেশের সমস্ত সংবাদপত্র তীব্র ভাষায় জানাল এর প্রতিবাদ। নয়ন প্রকাশ, দেশমিত্র, দয়ন সাগর, অমৃতবাজার পত্রিকা, কেশরী, মহারাষ্ট্র মিত্র, সুধারক, মিত্রমেলা, জাম-ই-জামশেদ, রাষ্ট গফতার প্রভৃতি সংবাদপত্র ওজস্বিনী ভাষায় দেশের লোককে এ অপমানের প্রতিবিধানের জানাল আহ্বান। ধিক্কার দিতে লাগল দেশের যুবশক্তিকে। তবুও মিঃ র‍্যাণ্ড তাতে কর্ণপাত করলেন না। পাশ করালেন Epidemic diseases Act. সাধারণ কয়েদীদের মত লোকদের রাস্তা দিয়ে সৈন্য ও পুলিশ পাহারায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল হাসপাতালের দিকে। (২) অনেক আবেদনের পর মিঃ র‍্যাণ্ড জানালেন যে পর্দানশীন অর্থাৎ শুধু মুসলমান স্ত্রীলোকদের বিবস্ত্রা হতে হবে না। (৩)

পুণার শ্রীদামোদর হরি চাপেকার এ চণ্ডনীতি ও নরনারীর এ নির্লজ্জ অপমানে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বুঝলেন যে মিঃ র‍্যাণ্ডকে হত্যা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ১৮৯৫ সনের মে-র শেষের দিকে

(1) The Dnyan Sagar dt, 15,3,1897,
(2) Ibid dt, 12,4,1897 (3) Ibid

তিনি অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় পুণা ছেড়ে এলেন বোম্বাই। মহাদেবী মন্দিরের পুরোহিত তখন মহামারীর ভয়ে মন্দির ছেড়ে পালিয়েছেন আর মন্দির পাহারা দিচ্ছে বোম্বাইয়ের চতুর্দশ পদাতিক বাহিনী। শ্রীদামোদর সে সুযোগে পুরোহিতের কাজ নিয়ে কৌশলে সরিয়ে ফেললেন ৪৬৮ ও ৫৩২নং দু'টি মার্টিন হেনরী রাইফেল ও একটি তলোয়ার বেওনেট। তাঁর বন্ধু শ্রীরাণাডে অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করলেন পিস্তল ও কার্তুজ। তখন জুবিলী উৎসব আসন্ন। ১৮৯৭ সনের ২২শে জুন শ্রীদামোদর চাপেকার তাঁর সহোদর শ্রীবালকৃষ্ণ ও বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রীমহাদেব বিনায়ক রাণাডেকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র গেলেন কাউন্সিল হলে কিন্তু মিঃ র‍্যাণ্ডের দেখা মিলল না। খবর পেলেন তিনি সেণ্ট মেরী গীর্জায়—গেলেন সেখানে। শিকারের সন্ধান মিলল কিন্তু অসংখ্য জনতার মাঝে তাঁদের কাজের সুবিধে হবে না বলে ফিরে এলেন গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে—রইলেন অতন্দ্র প্রতীক্ষায়। সুযোগ মিলে গেল—দেখা গেল মিঃ র‍্যাণ্ড চলেছেন ফিটন গাড়ীতে আর পিছনে অন্য গাড়ীতে তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী সস্ত্রীক মিঃ আয়র্স্ত। শ্রীদামোদর চোখের নিমেষে ছুটে গিয়ে মিঃ র‍্যাণ্ডের গাড়ীর পিছনে উঠে তাঁকে গুলি করলেন আর শ্রীরাণাডের অব্যর্থ লক্ষ্য পিস্তল মিঃ আয়র্স্তের জীবলীলা একই ভাবে শেষ করে দিল। প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ল তাঁর স্ত্রীর কোলের উপর। ৩রা জুলাই বেলা ৩-১৮ মিনিটে মিঃ র‍্যাণ্ড দেহত্যাগ করলেন। (১) মহারাষ্ট্রের বীর সন্তানেরা জাতির অপমানের প্রতিশোধে সূচনা করলেন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে গেল। অনেক দিন আত্মগোপন করে থাকবার পর ৯ই আগষ্ট শ্রীদামোদর ধরা পড়লেন। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। অবিচলিত কণ্ঠে বললেন যে লোকমান্য তিলকের বিরুদ্ধে রিফর্মস পার্টির যে সভ্যেরা লেখনী

---

(1) Kali Charan Ghose—The Roll of Honour. page 45

ধারণ করেছেন তাদের শাস্তি দিতে তিনি কৃতসংকল্প। ভারতের রমণীগণের চরম অপমানের প্রতিশোধকল্পে তিনি ইংরেজ জাতির মাতৃসমা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্মর মূর্তিকে আলকাতরা মাখিয়ে ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়েছেন আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পুণার আসন্ন উৎসবের সরকারী মণ্ডপ পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। (১)

বিচার আরম্ভ হ'ল। ১৮৯৮ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী দায়রা জজ জুরিদের চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। জুরীরা একবাক্যে খুনের অপরাধে আসামীকে নির্দোষ বলার সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি জুরীদের জেরা আরম্ভ করলেন। ভয় দেখিয়ে অসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়ে নিয়ে করলেন ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। (২) ফাঁসির হুকুম হবার পর শ্রীদামোদর জানতে চাইলেন যে আইন শাস্ত্রে এর চেয়ে অন্য কোন কঠোরতর দণ্ডের বিধান আছে কিনা? ২রা মার্চ মহামান্য হাইকোর্ট সে রায় বহাল রাখলেন। ১৮ই এপ্রিল সকাল ৬-৪০ মিনিটে বীর সন্তান মহাদেব ভারতের অগণিত লাঞ্ছিতা জননী ও ভগিনীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যারবেদা সেন্ট্রাল জেলের ফাঁসিমঞ্চে গীতা হাতে দাঁড়ালেন—মুখে ফুটে উঠল ভারতের প্রথম বিপ্লবী শহীদের মৃত্যুহীন প্রাণের আনন্দদ্যুতি।

শ্রীবালকৃষ্ণের গ্রেপ্তারের জন্যে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল। ১৮৯৮ সনের বড় দিনের সময় তিনি ধরা পড়লেন হায়দারাবাদে। ১৮৯৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী বিচার আরম্ভ হয়ে ৮ই মার্চ হ'ল মৃত্যুদণ্ড। শুনে মৃত্যুজয়ী বীর শুধু বললেন 'বেশ'। (৩)

পুলিশে চাকরি করার সময় গণেশ শঙ্কর ড্রেভিডের জাল করার অপরাধে জেল হয়। ছাড়া পাবার পর গণেশ ও তার ভাই রামচন্দ্র পুলিশের অধীনে গুপ্তচরবৃত্তি আরম্ভ করে।

---

(1) Kali Charan Ghose--The Roll of Honour, page 45
(2) Amrita Bazar Patrika dt, 4 2.1898
(3) Kali Charan Ghose—The Roll of Honour p. 48

তাদেরই গোপন সংবাদে শ্রীদামোদর ধরা পড়েন কিন্তু পুরস্কারের সামান্য অংশ এমন কি তার থেকে ২৬০৲ টাকা ইনকাম্ ট্যাক্স বাদ দিয়ে তাদের দেওয়া হলে তারা লিখিত ভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে এর প্রতিবাদ জানায়। (১) এমন কি Poona Tragedy and Government Reward নাম দিয়ে কাগজে প্রবন্ধও লেখে। দ্রেভিড ভ্রাতৃদ্বয় ও রামপাণ্ডু নামে এক কনেষ্টবল শ্রীদামোদরের গ্রেপ্তারের জন্যে একমাত্র দায়ী সন্দেহে শ্রীদামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাসুদেব ১৮৯৯ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী রামপাণ্ডুকে গুলি করলেন কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীবাসুদেব ও তাঁর এক সহকর্মী পাঞ্জাবীর পোষাকে দ্রেভিড ভ্রাতৃদ্বয়ের বাড়ী গিয়ে দেখলেন যে তারা তাস খেলায় মত্ত। বললেন যে পুলিশ সুপার বিশেষ জরুরী কাজে তাদের এখুনি ডাকছেন। খেলাটুকু শেষ করে তারা যাবে বলাতে এঁরা দুজন বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু'ভাই বাইরে আসামাত্র তাঁরা দু'জনকেই গুলি করলেন। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে ও রামচন্দ্র পরের দিন গেল মারা। আততায়ীর সন্ধানে পুলিশ ব্যস্ত হয়ে উঠল। ১০ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ সুপার সন্দেহক্রমে শ্রীর‍্যানাডে, শ্রীবাসুদেব ও অন্য একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। শ্রীবাসুদেব যাবার সময় লুকিয়ে নিয়ে গেলেন একটি পিস্তল এবং তাঁকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ধরলেন পিস্তল উঁচিয়ে কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই পুলিশ সুপার ক্ষিপ্র গতিতে হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলেন —চেষ্টা পণ্ড হয়ে গেল। (২)

১৮৯৯ সনের ২রা মার্চ শ্রীবাসুদেব ও শ্রীরাণাডের বিচার আরম্ভ হ'ল। ৩১শে মার্চ মহামান্য হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল

(1) The Times of India dt, 2,2,1899
(2) Kali Charan Ghose—The Roll of Honour p 50

রাখলেন। ৮ই মে শ্রীবাসুদেব ও ১০ই মে শ্রীরাণাডে হাসি-মুখে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। যারবেদা জেল এই চারটি বীর সন্তানের স্মৃতি বুকে নিয়ে চিরদিনের মত পবিত্র হয়ে রইল। মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক কর্মধারার গৌরবোজ্জ্বল সূচনা সেদিন জাতির প্রাণে এনে দিয়েছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠায় মৃত্যু জয়ের মহামন্ত্র।

ভগিনী নিবেদিতা সেদিন ছুটেছিলেন পুনায়—রত্নগর্ভা চাপকার জননীর কাছে। দেখেছিলেন পূজারিনীর বেশে সহাস্যবদনা সেই বীর রমনীকে যিনি তিন তিনটি পুত্রকে স্বাধীনতা যজ্ঞে আহুতি দিয়েও পরম নির্বিকার চিত্তে ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন। বিস্ময়াবিষ্টা ভগিনী শ্রদ্ধায় তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন—সঙ্গে নিয়ে এলেন জীবন দর্শনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর গভীর অনুভূতি। মাতৃত্বের এ আত্মমর্য্যদা বোধ ও আত্মোপলব্ধির বিপুল প্রকাশ সেদিন তাঁর বীক্ষণশীল মনের ধারণার অতীত। (১)

১৯৪২ সনের আন্দোলনেও মহারাষ্ট্রের অবদান অসামান্য। দাক্ষিণাত্যের এই ওয়াজিরিস্তানে মারাঠা বিপ্লবীরা চালালেন গরিলা যুদ্ধ, নিশ্চিহ্ন করে দিলেন সরকারি কর্মচারীদের আবাস-ভবন—ভস্মীভূত করে দিলেন ডাক বাংলো ও থানাগুলি। সাতারার সমস্ত অধিবাসীর অসামান্য ঐক্য, পুলিশ ও সৈন্যের সমস্ত চেষ্টা পঙ্গু করে দিল। নতুন প্রতি-সরকার সব কাজই চালাতে লাগলেন সুশৃঙ্খলায়—বন্ধ হ'য়ে গেল কালো বাজারের গোপন পথে দেশের টাকার নিত্য আনাগোনা। এক কথায় নতুন সরকার স্বাধীন দেশের মত সমস্ত কর্তব্য পালন করতে লাগলেন।

পরে যখন মেদিনীপুরে তদন্ত আরম্ভ হ'ল—মেদিনীপুরে জন-সাধারণ প্রমাণ করে দিল যে শুধু পুলিসের গুলিতেই মৃত্যু বা আহতই শেষ নয়, অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল সরকারি কর্মচারিরা। সরকারি কর্মচারি, পুলিশ ও সৈন্য ৭৪টি নারী ধর্ষণ

(1) Kali Charan Ghose—The Roll of Honour. p 51-52.

করেছে তার মধ্যে সদ্যপ্রসূতী ও গর্ভবতী নারীও ছিলেন। আর ধর্ষণের চেষ্টাও অসংখ্য। ইউরোপীয়ান পুলিশ অফিসারেরা সত্যাগ্রহীদের মলদ্বারে কাঠের রুল ঢুকিয়ে দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে—সোডা ও চুণের জল দিয়ে জননেন্দ্রিয় পুড়িয়ে দিয়েছে। তদন্ত করলেন মিঃ বি. আর. সেন., আই-সি-এস, কিন্তু জনসাধারণ তাঁর রিপোর্টের মর্ম আজও জানতে পারল না। (১) তারা অনেক আশা করেছিল যে দেশ স্বাধীন হলে দুষ্কৃতকারিরা দণ্ড পাবে কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় নি।

সেদিন যাঁরা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদেশী শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন আজ তাঁরাই দেশ-বরেণ্য। আজও মনে পড়ে ১৯৪২ সনের আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে টাকার প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবকদল গেলেন এক ধনীর কাছে। তিনি আদর করে তাঁদের বসিয়ে পুলিশ ডেকে দিলেন ধরিয়ে। সেদিন কিন্তু ইংরেজ সরকার থেকে তাঁর কোন খেতাব মেলে নি। দেশ স্বাধীন হবার পর সুকৌশলে তিনি কংগ্রেসের পুরাতন একনিষ্ঠ কর্মী পরিচয়ে পেয়ে গেলেন বাংলায় মন্ত্রিত্ব। যাঁদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা আজও চেয়ে আছেন অবাক বিস্ময়ে।

১৯৪২ সনের অক্টোবরের শেষের দিকে ডাল্টনগঞ্জে ১৪ জন বিপ্লবী ধরা পড়লেন তাঁদের কাছে পাওয়া গেল দুটো রিভলভার, ২৩ রাউণ্ড গুলি ও পাঁচটি ইলেকট্রিক টর্চ। বিহারের এক জায়গায় ফাটল বোমা। পুলিশ পেয়ে গেল একটি দেশী তৈরী পিস্তল ও ৩৮০টি কার্তুজ ও একটি জঙ্গল থেকে ১৭ বাক্স মিলগ্রেণেড ও বোমা। বিহারের বিপ্লবীরা চলে গেলেন নেপালে।

১৯৪২ সনের ৯ই নভেম্বর হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেল থেকে পালালেন ৯ জন—তার মধ্যে ছিলেন স্যোসালিষ্ট নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি ১৯৪২ সনের শেষের দিকে "স্বাধীনতা যুদ্ধের

---

(1) Chakravarty—India in Revolt p 64

সৈন্যদের প্রতি” নামে ছাড়লেন এক ইস্তাহার। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল যে অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল। ১৪ই নভেম্বর গয়ায় সোস্যালিষ্ট পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় বহুদিন আত্ম-গোপনের পর ধরা পড়লেন, তাঁর কাছে পাওয়া গেল ৬টা কার্তুজ। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ নতুন একটি ‘কেন্দ্রীয় কর্ম কমিটি’ গঠন করে দিল্লীতে ডাকলেন তার বৈঠক। কমিটি তাঁর কর্মসূচীকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় সেগুলিকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গেলেন নেপালে। পরে ১৯৪৩ সনের মে মাসে ধরা পড়ে বন্দী থাকলেন হনুমান নগর জেলে। এক রাত্রে প্রায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র বিপ্লবী জেল আক্রমণ করে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর ছ’জন সহ-কর্মীকে আনলেন মুক্ত করে। শ্রীজয়প্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়—কোন রকমে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে গেলেন ১৯৪৩ সনের ১৮ই ডিসেম্বর।

বিহারে বিপ্লবীরা শ্রীসিয়ারাম সিং এর নেতৃত্বে ধ্বংসাত্মক কার্য্যাদি চালাতে লাগলেন—ভারতের অন্যান্য প্রদেশও কিছু কিছু সমিতি গড়ে উঠল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সনের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল। গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহরু ও মৌলানা আজাদ বললেন যে ১৯৪২ সনের আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নেই। তবে এ আন্দোলনের অপ্রত্যাশিত ভয়াবহরূপের জন্যে তাঁরা করলেন আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ। বললেন যে সরকারের নির্মম অত্যাচারই এ আন্দোলনের তীব্রতার প্রধান কারণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন “গান্ধীজি তাঁর শেষ গুলি (অবশ্য আলংকারিক মতে) ছুড়েছিলেন ১৯৩২ সনে কিন্তু হয়েছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট। পরের দশ বছর তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করে বসে ছিলেন। তিনি আবার বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন ১৯৪২

সনে ৮ই আগষ্ট কিন্তু গুলি বেরুল না কেননা তিনি কার্তুজ ভরতেই ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিলেন শেষ বিশ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোন যোগই রইল না।" (১) নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও নেতৃত্বের অভাবে ক্রমেই দেশবাসীর চিন্তা সংকীর্ণ ও কর্ম সংরুদ্ধ হয়ে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল। (২) গান্ধী-ভক্তদের মধ্যে যাঁরা বলেন যে কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা এনেছে, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁদের বুদ্ধি দুর্বল, চিন্তাধারা অসহিষ্ণু, যুক্তি জরাগ্রস্ত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যেরা পর্যন্ত বললেন যে ভারতের জনসাধারণ কংগ্রেসের আয়ত্বের বাইরে।

গান্ধীজির সব আন্দোলনই একে একে ব্যর্থ হয়ে গেল। গান্ধীজির প্রথম জীবনের কর্ম প্রচেষ্টা আশাতীত ভাবে বিফল। ব্যারিষ্টারি পাশ করে গেলেন রাজকোট ও বোম্বাইএ আইন ব্যবসার জন্যে—ব্যর্থকাম অপারগ হয়ে ফিরে এলেন। কাথিয়াবাড় ষ্টেটের ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছে নির্মমভাবে অপমানিত হবার পর পালালেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, পোর বন্দরের জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ীর অধীনে চাকরি নিয়ে। প্রেটোরিয়া যাবার সময় রেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপমান করে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে দেয় নামিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্দশার প্রতিকার কল্পে এক ইস্তাহার প্রচার করায় ইংরেজ যায় তাঁর বিরুদ্ধে। ১৮৯৬ সনে নেটালে গেলে তাঁকে জানান হয় যে তাঁর জীবনের আশঙ্কা আছে কাজেই তিনি যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্দরে নামেন। কিন্তু পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধা উপেক্ষা করে চলার পথে সহরের রাস্তায় লাঞ্ছনা, অপমান, আঘাত এমন কি পচা ডিমও জোটে তাঁর অদৃষ্টে। প্রহারের ফলে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যান। সে সময় সেখানে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের স্ত্রী সে যাত্রা

---

1. Majumder—History of Freedom Movement III p 673
2. Ibid

রক্ষে করেন তাঁকে। তবুও তিনি সেদিনের লাঞ্ছনা ও প্রচ্ছন্ন অবমাননা ভুলে গিয়ে বুয়োর যুদ্ধের সময় অকপটে ইংরেজকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্যে গঠন করেন অ্যাম্বুলেন্স বাহিণী। জুলু বিদ্রোহের সময়ও তিনি ১৯০৬ সনে ইংরেজকে সাহায্য করেছেন এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় তিনি সে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন নি। তাঁর বরাবরের ধারণা ছিল "যে জগতের কল্যাণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজ সাম্রাজ্য।" (১)

তারপর কিছু দিনের মধ্যে নতুন আইন পাশ করে বলা হয় যে ট্রান্সভালে যত ভারতীয় আছে তাদের নাম রেজেষ্ট্রী করাতে হবে আর আঙ্গুলের টিপ দিতে হবে। গান্ধীজি এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং এ আইনকে "কালা আইন" বলে অভিহিত করে ১৯০৬ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর জোহান্সবার্গে এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে মহামতি টলষ্টয়ের আদর্শে জানালেন অহিংস সত্যাগ্রহের আহ্বান। সেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনই তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ জয়ের প্রতীক্।

ভারতে আসার পর তাঁর বিভিন্ন সময়ের পরস্পর বিরোধী বিবৃতি সত্যই বিস্ময়কর। মহামতি গোখেলের কাছে তাঁর রাজনীতির প্রথম হাতে খড়ি। তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্যে প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছেন এমন কি অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু, খৃষ্টান বা শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বরাবর বলে এসেছেন যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপরই ভারতের স্বাধীনতা নির্ভর করে। শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা তাঁর মনে কোনদিন স্থান পায় নি। তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়ালেন। আজও মনে পড়ে সাইমন কমিশনের "সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার" প্রস্তাব তিনি বা কংগ্রেস মানতে চাইলেন না। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ডাঃ আন্সারী

(1) Majumder—History of Freedom Movement III p 6

"সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার" মুসলমানদের স্বার্থের জন্যে প্রয়োজন বলে জিদ্ ধরলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা বললেন "কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার স্বাকার বা অস্বীকার কোনটাই করে না।" সেদিনের কথা ও কাজের ভেতর দিয়ে মৌলানা আজাদের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল তা কংগ্রেস নেতারা বা দেশের লোকেরা ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি।

১৯৪০ সনের ১৫ই জুন গান্ধীজি বললেন যে মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যস্থাপনের শক্তি আর কংগ্রেসের নেই। ১৯৪২ সনে ১৮ই এপ্রিল ক্রীপস্ চলে যাবার পর বললেন যে আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে স্বাধীনতা অসম্ভব। আবার বিকারের প্রলাপের মত সেই বিবৃতিতেই বললেন যে মুসলমানেরা যদি নিজেদের ভিন্ন নেশন মনে করে দেশ ভাগ চায় ত তারা তা নিশ্চয়ই পাবে।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজাগোপালাচারীর মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপোষের প্রস্তাবে গান্ধীজি অবজ্ঞার কর্কশ হাসি হেসে তাতে মত দেন নি। কংগ্রেসও ১০৫ ভোটে সে প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তবুও এক বছর পরে সেই গান্ধীজি আবার Sporting offer হিসেবে রাজাজীর সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন—আত্ম সান্ত্বণার বিড়ম্বনার মত। এক বছর আগে হ'লে হয়ত তিক্ততা একটু কম হ'ত।

রাজাজী গান্ধীজির সম্মতি নিয়ে ১৯৪৩ সনের মার্চ মাসে মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। মিঃ জিন্না সে প্রস্তাব সমর্থন করার দায়িত্ব না নিয়ে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির কাছে দিলেন। সমাধানের সর্ত হিসাবে গান্ধীজির সম্মতিতে রাজাজী বললেন যে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। আর যুদ্ধ শেষে ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে ও পূর্ব সীমান্ত যেগুলি মুসলমান প্রধান অঞ্চল সেগুলি চিহ্নিত করবার জন্যে এক কমিশন নিযুক্ত হবে। চিহ্নিত হবার পর সে অঞ্চলের বয়স্ক অধিবাসীদের গণভোটে দেশ

বিভাগ নির্ধারিত হবে। (১) কাজেই ১৯৪৩ সন থেকেই গান্ধীজি দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলেন। গান্ধীজির এ প্রস্তাব ডাঃ এন. বি. খারে তীব্র-সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন গান্ধীজি বলেন যে ভারত বিভাগ পাপ—এখন তিনি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সে ঘৃণ্য পাপ কাজ করতে চলেছেন। তিনি আরও বলেন "It is thoroughly undemocratic and is nothing short of a gross betrayal of the trust reposed in him by the Congress and generality of his countymen"—(A. P.) (২) হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সম্পাদক রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠও এ প্রস্তাব রূঢ়ভাবে সমালোচনা করলেন। (৩)

১৯৪২ সনের ২রা আগষ্ট গান্ধীজি বললেন যে ইংরেজ যদি মুসলিম লীগকে ভারত শাসনের ক্ষমতা দিয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতা দেয় ত তাঁর আপত্তি নেই। (৪) হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ও কংগ্রেসের আদর্শের সেদিন দুর্দিন। তিনি দুঃখের অহংকারে একসঙ্গে দেশ ও কংগ্রেসকে ভুললেন। জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন সে দিন দেশকে নিয়ে গেল দূরান্তের অনিশ্চয়তার দিকে কল্পনার মরীচিকায়। কিন্তু তাঁর ২রা আগষ্টের প্রস্তাবের উত্তরে মিঃ জিন্না কি বলেন তা শোনবার ধৈর্য তাঁর ছিল না। তিনি ৮ই আগষ্ট পাশ করালেন "ভারত ছাড়" আন্দোলনের প্রস্তাব। তাঁর ধর্মনীতি ও রাজনৈতিক সংযোজনার ভিত্তিতে তিনি হয়ত বুঝেছিলেন যে তিনি মহাভারতের মত ধর্মযুদ্ধ চালাবেন। নিরস্ত্র অরিকে কেউ অস্ত্রাঘাত করবে না। কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন যে তাঁর বিপক্ষ রাজনীতি জানে, ধর্মনীতির ধার ধারে না; আর ইংরেজ মহাভারত বা মনুসংহিতা থেকে ত রাজ্য পরিচালনার পাঠ নেয় নি।

(1) Amrita Bazar Patrika dt 10.7.44. page 1 col 6
(2) Ibid dt 16.7.44 page 5 col 3.
(3) Hindusthan Standard, Calcutta dt. 20-7-44, page 3 col 2.
(4) Coupland II—299

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মিঃ জিন্না মুসলমানদের ১৯৪২ সনের আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তাঁর মতে গান্ধীজি মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না—আর যখন কোন সন্তোষজনক জবাব দিহি করতে পারেন না তখন বলেন "আমার অন্তরের সত্ত্বা আমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন।" (১) যুদ্ধের প্রথম থেকে গান্ধীজি বহুবার বলেছেন যে "মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা কাজ-চলা গোছের বন্দোবস্ত না করে আইন অমান্য সংগ্রাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার নামান্তর।" কিন্তু ক্রীপস্ আসার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি তাঁর নিজেব কথাটি ভুলে গেলেন বেমালুম এবং ১৯৪২ সনের আন্দোলনের সময় সে কথাটি তাঁর মনে পড়ল না। (২) মুসলিম লীগ ১৯৭২ সনের ২০শে আগষ্ট বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে দেশ বিভাগের প্রস্তাব পাশ করাল। গান্ধীজি বুঝলেন না যে এ কাজ করলে বা এ আন্দোলন চালালে অসংগত অসংলগ্ন জঞ্জালেব ভয়ংকর বোঝা দেশবাসীর মাথার উপর চাপানো হবে।

এ সময় নেতাজী ভারতে বিপ্লব আসন্ন মনে করে আরও দু'টি বেতার কেন্দ্র খুললেন। একটির নাম দিলেন "কংগ্রেস রেডিও" ও অন্যটি "আজাদ মুসলিম রেডিও।" তিনি জার্মানী থেকে এই দু'টি বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের লোককে অবিচলিত ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বললেন।

স্বেচ্ছাবাহিনীর আয়তন দিন দিন বেড়ে চলতে লাগল। দেখা দিল অর্থ সমস্যা। ১৯৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রস্তাব এল যে এবার থেকে সরাসরি জার্মানরাই তাদের মাইনে দেবে তবে স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। নেতাজীর তখন এ প্রস্তাব না মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রথম শপথ গ্রহণের সময় নেতাজী উপস্থিত ছিলেন আর ছিলেন জাপানের

---

(1) Mosley p 72

(3) Khaliquzzaman—Pathway to Pakistan p 285

সামরিক দূত, কর্ণেল ইয়ামা মোতা। এ অনুষ্ঠানে নেতাজী স্বেচ্ছা-বাহিণীর হাতে তাদের নিজস্ব পতাকা তুলে দিলেন। ভারতের কংগ্রেসের সবুজ, শ্বেত ও গৈরিক ত্রিবর্ণ পতাকার উপর মুদ্রিত চরকার বদলে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘের ছবি। যে প্রাণ ম্লান নিশ্চেতন হয়ে আছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করবার এই প্রতীক। নেতাজী বললেন "স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা হবে স্বর্ণাক্ষরে। এই ধর্ম-যুদ্ধে যারা প্রাণ দেবে তাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে উঠবে মিনার।" আজও মনে পড়ে সেই বিশ্বজনীন আবেদন। সেদিন নেতাজী দুঃসাহসের আনন্দে বলেছিলেন "যখন আমরা একসঙ্গে ভারত অভিযানে যাব, আমি থাকব বাহিণীর পুরোভাগে।"

হিন্দু মহাসভার নেতারা সে বছর ডিসেম্বর মাসে কানপুর অধিবেশনে বীর সাভারকরের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করার প্রস্তাব পাশ করালেন। যাতে ইংরেজের সঙ্গে সম্মানজনক আপোষে দেশের স্বাধীনতা আসে তার জন্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। ডাঃ মুখার্জী মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনাও করলেন কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

মিঃ চার্চিল তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। আজও মনে পড়ে সেই বৃদ্ধ অহংকারী চার্চিলের দম্ভোক্তি "I have not become the king's first minister in order to preside at the liquidation of the British Empire." ১৯৪২ সনের ১৭ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কর্মাসের বক্তৃতায় স্পষ্টভাষায় জানালেন অখণ্ড ভারতের যৌক্তিকতা। তাঁর বক্তৃতায় ক্ষুব্ধ হলেন মিঃ জিন্না। তিনি করাচি অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করালেন যে ভাগ করে ভারত ছাড়। গান্ধীজির Quit Indiaর বদলে তিনি শ্লোগান দিলেন Divide and Quit. ওয়ার্কিং কমিটি পাশ করল একটি Committe of action গঠনের প্রস্তাব।

দূর প্রাচ্যে ১৯৪২ সনের বাংকক সম্মেলনের আগে মোহন সিং

সংগ্রহ করলেন ২৫০০০ স্বেচ্ছাসেবক এবং আগষ্টমাসের শেষে তার সংখ্যা দাঁড়াল ৪০,০০০ হাজারে। জায়গায় জায়গায় সৈন্য শিবির হ'ল খোলা। মোহন সিং টোকিও থেকে আই, এন, এর সম্বন্ধে কোন রকম প্রতিশ্রুতি না পেয়ে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠতে লাগলেন। তিনি চাইলেন যে জাপান গভর্ণমেণ্টকে স্পষ্ট ভাষায় তাদের মতামত জানাতে হবে। শেষ পর্যন্ত মোহন সিং অধীরতার সঙ্গে একটা অন্যায় কাজ করে ফেললেন। তিনি জাপান গভর্ণমেণ্টকে লিখে বসলেন যে ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তর না পেলে তাঁরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। শ্রীরাসবিহারী বসু ও অন্যান্য সকলে তাঁকে তারিখ দিতে নিষেধ করলেন কিন্তু মোহন সিং সে কথায় কান দিলেন না। জাপানের কোন অফিসারের কাছ থেকে খবর এল যে মোহন সিং কর্মপরিষদকে একখানা পত্র দিয়েছেন এবং একটা সীল করা খামে হুকুম দিয়েছেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলে যেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়া হয় ও সমস্ত কাগজ পত্র নষ্ট করে দেওয়া হয় আর ভবিষ্যতে কেউ যেন এ রকম ফৌজ গঠন না করেন। বাধ্য হয়ে শ্রীরাস বিহারী বসু মোহন সিংকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। কর্মপরিষদের দুজন সভ্যও সেই সঙ্গে করলেন পদত্যাগ। শ্রীরাস-বিহারী বসু তাঁর বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে কষ্ট বোধ করছিলেন তাই দিন গুনতে লাগলেন নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষায়।

এদিকে নেতাজী দূর প্রাচ্যে আসার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। ১৯৪২ সনে যখন জার্মান সৈন্য একটার পর একটা দেশ জয় করে চলেছে তখন নেতাজী বুঝেছিলেন যে এ যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় নিশ্চত। তিনি জার্মান Admiral Canaric-কে বলেছিলেন "You know as well as I do that Germany cannot win this war. But this time Victorious Britain will lose India." (১) এ দূরদর্শিতা অন্য কোন কংগ্রেস নেতার ছিল না।

(1) Leverkuchan, P. : German Military Intelligence, 1954 p. 188

সাত

১৯৪৩ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী নেতাজী ও তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী আবিদ হাসান একটি জার্মান সাবমেরিণে গোপনে কিয়েল ত্যাগ করলেন। সংবাদটা খুবই গোপন রাখা হ'ল। শুধু যাবার আগে তাঁর দাদাকে জানিয়ে গেলেন মৃত্যু শঙ্কা ছন্দিত সে যাত্রার কথা। কাজের সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন সহকর্মী সহকারী ভারতীয় সাংবাদিক এ. সি. এন. নাম্বিয়ারের হাতে। তাঁর সাহসের অন্ত নেই, বিপর্যয়ের তরঙ্গের মাঝে 'মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লান্তি'। বিপদ সঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ ঘুরে তাঁরা মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছুলেন নিরাপদে। সেখান থেকে ২৮শে এপ্রিল রবারের ডিঙ্গিতে চড়ে তাঁরা গিয়ে উঠলেন জাপানী আই-২৯ নম্বর ডুবো জাহাজে। ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রার উত্তর প্রান্তে সবং থেকে কর্ণেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে বিমান পথে ১৩ই জুন পৌঁছুলেন টোকিও। তাঁর অন্তরে তখন আশাও যেমন দুর্বার স্বাধীনতার আকাঙ্খাও তেমনি অপরাজেয়।

পরদিনই জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ তোজোর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রধানমন্ত্রী অস্থায়ী সরকার গঠন ব্যাপারে তাঁকে দিলেন উৎসাহ। জাপানীদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় এলাকা অস্থায়ী সরকারের অধীনে আসবে বলে জানালেন তিনি। জাপ পার্লামেন্টে মিঃ তেজো ঘোষণা করলেন "ভারতীয় জনগণের শত্রু প্রভুত্বমদোদ্ধত অ্যাংলো সাক্সনদের দুঃসহ দর্প ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্যে জাপান সকল রকমে সাহায্য করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে।" (১) এ যুগান্তকারী ঘোষণা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

(1) On to Delhi—p I I dt. 13. 6. 43.

১৯৪৩ সনের এপ্রিল মাসের পর উত্তর বার্মায় জাপ বাহিণীর সেনাপতি হলেন জেনারেল মুতাগুচি। তাঁর প্রথম অভিযানে দুর্ভেদ্য উনগেটের প্রথম চিন্দিট সফলতার সঙ্গে জয় হ'তে তিনি তখন মন দিলেন ইম্ফল অভিযানের পরিকল্পনায়। ১৯শে জুন নেতাজী একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দু'দিন বেতারে বক্তৃতা দিয়ে দূর প্রাচ্যে তাঁর আগমন সংবাদ ঘোষণা করে অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ করে আরম্ভ করলেন উদ্যোগ পর্ব। ১৯শে জুন বললেন "আইন অমান্য আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামে। ভারতবাসীরা যখন ব্যাপকভাবে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হবে, একমাত্র তখনই তারা অর্জন করবে স্বাধীনতা লাভের অধিকার।" ২৪শে জুন বললেন "ভারতের স্বাধীনতালাভের আর দেরি নাই। স্বাধীন ভারতের কারাগারের দ্বার হবে উন্মুক্ত। অন্ধকার কারাভ্যন্তর থেকে তখন সুখ, তৃপ্তি ও স্বাধীনতার নির্মেঘ আলোয় এসে দাঁড়াবে ভারতের গৌরব ও মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানেরা। তাদের ক্ষুধিত সত্য ঘোষণার ঐতিহ্যাশ্রয়ী শব্দ সম্ভার ধ্বনিত হতে থাকবে ভাবীকালের তোরণে তোরণে।" এশিয়াবাসী শুনল এক অখণ্ড বিশ্বাসের নতুন কণ্ঠস্বর। বহুকালের সুপ্তিমগ্ন পূর্ব এশিয়ায় এল জাগরণের দিন।

২রা জুলাই এলেন সিঙ্গাপুর। বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন নেতাজীকে সংবর্ধনা জানাতে সারা সহর যেন ভেঙ্গে এল। অক্লান্ত আনন্দে দেশকে উর্বর করে তুললেন তাঁরা। সাতদিন ধরে চলল প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ও ঘরোয়া বৈঠক। অন্তরে তখন তাঁর সর্ব দুঃখ তাপহীন গভীর প্রশান্তি। 'নেতাজী সপ্তাহের' এ দিনগুলি অবিস্মরণীয়। ৪ঠা জুলাই তিনি 'ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ' প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সেই লীগের সভাপতিত্ব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আনুগত্য গ্রহণ করে বললেন "তোমাদের সামনে কঠিন সংগ্রাম। শত্রুপক্ষ প্রবল ও নিষ্ঠুর। তাদের কোন বিবেক নেই। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, ক্লান্তি আর মৃত্যুর মুখোমুখি

দাঁড়াতে হবে; অন্যায়ের দোর্দণ্ড প্রতাপকে, উৎপীড়নের মন্থনকে উপেক্ষা করে নিতে হবে দুঃসহ মৃত্যুশেল। এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হও তবে স্বাধীনতা মিলবে।” শ্রীরাসবিহারী বসু ঐ দিনই নেতাজীকে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করলেন। নেতাজী করলেন অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠনের প্রস্তাব আর জানালেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা।

পরের দিন নেতাজী সুনিশ্চিত আনন্দে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন আই. এন. এ.র কথা। (১) তিনি বললেন “এই সৈন্য-বাহিনীর অভিযানের ফলে ভারতবর্ষে অন্তর্বিপ্লব চরম আকার ধারণ করবে। সৈন্যেরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করবে। যতদিন না দিল্লীর লালকেল্লায় স্বাধীনতার বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয় ততদিন রণধ্বনি হোক্—‘চলো দিল্লী, দিল্লী চলো।’ তোমাদের সামনে দু’টি কাজ—একটি হ’ল স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা আর দ্বিতীয়টি হ’ল যুদ্ধ জয়ের পর স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে স্বাধীনতা রক্ষে করা। তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক রণনিপুণ অসমসাহসী বাহিনী হতে হবে। মর্মঙ্গম নৈকট্যে আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের স্বাধীনতা ও জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবো।”

‘মানুষের আন্তরিক সত্বা কেমন করে সমস্ত বাধা ও স্থূল আবরণকে ভেদ করে অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পেতে পারে’ তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যেত। সেই অপরাহত মাহাত্ম্যই ভারতের বিপ্লবীদের অন্তরের বাণী। আই. এন. এর সৈন্যদের কাছে তখন তাঁর সেই ভয়হীন ক্লান্তিহীন অমৃতচ্ছবি মধ্যাহ্ন গগণের মেঘপ্রতিহত সূর্যের মত সমুজ্জ্বল।

৬ই জুলাই কুচকাওয়াজে প্রধান মন্ত্রী মিঃ তোজো উপস্থিত থেকে সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর ৯ই জুলাই প্রবল ধারা বর্ষণের মাঝে ৬০০০০ হাজার লোকের এক সভায় নেতাজী

---

(1) On to Delhi p 39

জানালেন তাঁর লক্ষ্যের কথা। বললেন "পূর্ব এশিয়ায় ত্রিশলক্ষ ভারতীয় আছে, তাদের সমস্ত সম্পদ দেশের সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়া চাই। চাই তিনলক্ষ সৈন্য আর তিনকোটি ডলার।" আরম্ভ হয়ে গেল তাঁর কাজ। দেহে শ্রান্তি ক্লান্তি নেই, ঘুম নামে মাত্র, ভোরে নাম জপ সব সময়েই কর্ম ব্যস্ত। বন্দীদের শিবিরে ঘুরে তিনি অল্প দিনের মধ্যে দু'হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহ করে ভারতীয়দের নিয়ে অনেক জায়গায় সভা করলেন। নিরন্তর পরামর্শ চলল জাপানী সেনানায়কদের সঙ্গে। ১৯৪৩ সনের ১লা আগষ্ট জাপানীরা বর্মাকে স্বাধীনতা দিল। সে উৎসবে যোগ দিয়ে নেতাজী বললেন "রেঙ্গুনে সরকারি ভবনে এখন যেমন ময়ূর কেতন উড়ছে, তেমনি দিল্লীর লাল কেল্লায় অচিরে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত স্বাধীন পতাকা উড়বে।" (১)

আসন্ন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কার অসম্ভব বিভীষিকায় ইংরেজ সরকার তখন বাংলা দেশ থেকে খাদ্য শস্যাদি রাঁচি অভিমুখে সরিয়ে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে যাতে জাপানীরা বাংলায় এলে রসদ না পায়। মুসলিম লীগের শাসনে একে দেশের দুরবস্থার একশেষ তার উপর ইংরেজের অব্যবস্থার বীভৎসতার ও উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার ফলে বাংলা দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। মানুষের তৈরী এ দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ নরনারী প্রাণ দিল অনাহারে। এর পিছনে ইংরেজের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার লোকেরা বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল আর অন্ন চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে; আই. এন. এর সঙ্গে যোগ দেবার কোন কথাই চিন্তা করবার অবসর পাবে না। তখন দেশ-জোড়া হাহাকার উঠেছে—কলকাতার পথে ঘাটে অনাহার ক্লিষ্ট নরনারী ক্রমবর্ধমান নিরন্নের দল। আগস্ট মাসে নেতাজী এক বেতার বক্তৃতায় জানালেন যে যাদের হাতে মানুষের বাঁচার অবলম্বন তাদের শোষণ নীতির ষড়যন্ত্রের ফলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে,

(1) Toyes —The Leaping Tiger

তার জন্যে ভারতের বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ ভিড়তে পারবে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন হবে না, যদি এ ধরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তা'হলে তিনি এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে রাজী আছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম সাড়া মিলল না। লর্ড ওয়াভেল মননশীলতার আভিজাত্যে থাকলেন নিরুত্তর। শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫০০,০০০ থেকে ৪৫০০,০০ লোক প্রাণ হারাল (১)।

২৫শে আগষ্ট আই. এন. এর সর্বময় কর্তা ও সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক হিসেবে নেতাজী জানালেন তাঁর প্রথম বিশেষ হুকুমনামা। বললেন "আমাদের কাজ সহজ নয়, যুদ্ধ হবে দীর্ঘদিন ধরে—নির্মম যুদ্ধ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের আদর্শ অভ্রান্ত, অপরাহত। যে আটত্রিশ কোটি জনসঙ্ঘ জগতের সমস্ত মানুষের এক পঞ্চমাংশ, স্বাধীন হবার তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। তার মূল্য দেবার জন্যে তারা এখন প্রস্তুত। স্বাধীনতা সকলেরই জন্মগত অধিকার। পৃথিবীতে আজ এমন আর কোন শক্তি নেই যে সেই অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে।" (২) নেতাজী উত্তর মালয়ে স্থাপন করলেন সুপ্রীম কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টার্স।

প্রস্তাবিত ইম্ফল অভিযানে আই. এন. এর কি ভূমিকা হবে এ নিয়ে জাপ সেনানায়কদের সঙ্গে তাঁর আগেই আলোচনা হয়েছিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেনাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি এ অভিযানে আই. এন. একে নিতে না চেয়ে বললেন "মালয়ে হেরে গিয়ে সৈন্যেরা মনভাঙ্গা হয়ে আছে, জাপানী যুদ্ধাভিযানের দুঃসহ কষ্ট তারা সহ্য করতে পারবে না; আর কষ্টের উপশমের জন্যে তাদের দল ছেড়ে পুরানো বন্ধুদের কাছে ফিরে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ভারতকে শত্রু কবল মুক্ত করার ভার জাপ

(1) Kali Charan Ghose—Famine in Bengal (Moscow 1951) p. 146
(2) Toyes—The Leaping Tiger.

সৈন্যদের কাছেই থাক। নেতাজী শুধু লক্ষ্য রাখুন যাতে ভারতের জনসাধারণের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। আই. এন. এ. গুপ্তচরের ও অন্যান্য কাজ করুক।”

নেতাজী এ কথায় রাজী হতে পারলেন না। তেরাউচির মনের কথাটা তিনি ধরে ফেললেন। তিনি বললেন “জাপানীদের আত্মোৎসর্গে ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারতবাসীর গোলামিও ভাল।” তিনি জোর দিয়ে বললেন “ভারতীয়দের সব চেয়ে বেশী রক্ত দিতে ও আত্মত্যাগ করতে হবে এবং আসন্ন যুদ্ধাভিযানে আই. এন. এ. সবার সামনে থাকবে। তারাও নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়বে যেন ভারতের মাটিতে তাদেরই প্রথম রক্তবিন্দু পড়ে।” (১) শেষ পর্যন্ত তেরাউচি একটি রেজিমেণ্ট পরীক্ষামূলক ভাবে নিতে চাইলেন। তারা জাপানী সৈন্যদের সমকক্ষ বলে প্রতিপন্ন হলে বাকি দলকে যুদ্ধে পাঠানো হবে।

মালয়ে সে সময় গান্ধী, আজাদ, ও নেহরুর নামে তিনটি ব্রিগেড ছিল। নেতাজী তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে সৈন্য নিয়ে ১নং গরিলা রেজিমেণ্ট তৈরী করলেন। ১।১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের প্রধান অফিসার ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ এই রেজিমেণ্ট পরিচালনার ভার নিলেন। সৈন্যেরা এই দলের নাম দিল সুভাষ ব্রিগেড। নেতাজী আপত্তি জানালেন কিন্তু সৈন্যেরা রাজী হল না।

১৯৪৩ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর মালয়ের তাইপং থেকে সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম দল রেঙ্গুন রওনা হতে আরম্ভ করল। নেতাজী সব সময় তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন বলতেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের দিতে হবে জীবনের সমস্ত সম্পদ শেষ রক্তবিন্দু; দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করতে হবে। যারা তা পারবে না তারা যেন না যায়। তাঁর সে কথা শুনে সৈন্যদের প্রাণের মধ্যে আনতো তরঙ্গ দোলা, রক্ত কমল

(1) Shaw Nawaz—My memories of the I. N. A. and its Netaji p. 75

টলমল করে উঠত সে দোলায়, তারা বলে উঠত "নেতাজী আমাদের একবার সুযোগ দাও। আমরা তামাম দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করে দেবো যে বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যেরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে পৃথিবীর যে কোন সৈন্যের মত লড়তে পারে।" প্রথম দল যখন রেঙ্গুনে রওনা হয় তখন সে যে কি দৃশ্য শুধু কল্পনা করা যায়। যে সমস্ত সৈন্য অসুস্থতার জন্যে ডাক্তারের নির্দেশে যাবার অনুমতি পায়নি তারা ষ্টেশনে রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ল—তাদের দাবী তাদের না নিলে তারা ট্রেন ছাড়তে দেবে না। তারা সমস্বরে বলে উঠল "আমরা নেতাজীর কাছে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবো বলে শপথ করেছি, কেউ আমাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।" সেদিন তাদের সেই অন্তরের আবেগ বিশ্ব প্রকৃতির প্রলয় লীলার মতো আকস্মিক—দাবদাহের মতো আত্মঘাতী। অনেক অনুনয় ও প্রতিশ্রুতি দেবার পর তারা ট্রেন চলতে দিল। (১) এরই নাম দেশপ্রীতি। ২৪শে সেপ্টেম্বর চলে গেল শেষ দল।

১৭ই অক্টোবর ফিলিপাইনসের স্বাধীনতা উৎসবে নেতাজী বক্তৃতা দিলেন। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে ২১শে অক্টোবর উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি বললেন যে এই অস্থায়ী সরকার গঠনের পেছনে ভারতের অসামরিক জনসাধারণের সমর্থন ত আছেই এমনকি বৃটেনের অধীন ভারতীয় সৈন্য বাহিনীরও বেশ বড় রকম একটা অংশের সমর্থন আছে। ২১শে অক্টোবর নেতাজী দ্বিতীয় বিশেষ হুকুমনামা ঘোষণা করলেন—চৌদ্দজন করলেন সে ঘোষণায় স্বাক্ষর।

২৩শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে অস্থায়ী সরকার বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জাপান, বর্মা, ক্রোশিয়া, জার্মানি, ফিলিপাইনস্, নানকিং, মাঞ্চুকুও, ইটালি ও শ্যাম

(1) Shaw Nawaz—My memories of the I N. A. and it Netaji 105

সকলেই এই অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিল। শুধু ভিসি ফ্রান্স থেকে কোন স্বীকৃতি এল না।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের অফিসার লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জীর উপর অনেকদিন আগে শ্রীরাসবিহারী বসু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ সংগঠনের সমস্ত ভার দিয়েছিলেন। তার উপর ভিত্তি করে অস্থায়ী সরকারের রূপ দেওয়া হ'ল। একটি সামগ্রিক মহাকরণ, অর্থ, প্রচার, স্বাস্থ্য, ট্রেনিং, সৈন্য সংগ্রহ, পুনর্গঠন, শিক্ষা ও মহিলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আটটি বিভাগে একে একে মন্ত্রি নিয়োগ করা হ'ল। তখন সব চেয়ে অভাব অর্থের। ১৯৪৩ সনের জুলাই পর্যন্ত মোট চাঁদার অঙ্ক ছিল বিশলক্ষ ডলারের কম। প্রথম প্রথম সকলেই মুক্ত হস্তে চাঁদা দিয়েছিল কিন্তু ক্রমে সে উৎসাহ কমে আসছে দেখে ১৭ই অক্টোবর নেতাজী বললেন "আমি আরও দু' তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে দেখব তারপর ভারতবর্ষের নাম নিয়ে যা করতে হয় তাই করব।"

তাতেও বিশেষ সুবিধে হ'ল না। তিনি দেখলেন যে ভারতীয়-দের বিষয় সম্পত্তির উপর রীতিমত কর ধার্য করা দরকার। তিনি লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জীকে একটা উপায় স্থির করবার ভার দেবার ফলে 'তহবিল তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড' গঠিত হ'ল। তাতে বলা হ'ল প্রত্যেককে তার সম্পত্তির পরিমাণ বোর্ডকে জানাতে হবে আর তার পরিমাণের উপর শতকরা দশ থেকে পঁচিশ ভাগ কর আদায় হ'তে আরম্ভ হ'ল।

২৫শে অক্টোবর নেতাজী বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে বিমানপথে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও এসে ১লা নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী মিঃ তোজোর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করলেন। ফলে মিঃ তোজো তাঁর অধিকাংশ প্রস্তাবই সমর্থন করে ৫ই ও ৬ই নভেম্বর পরিষদ ভবনে সম্মেলন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন যে জাপান অস্থায়ী সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে আর তার প্রমাণ হিসেবে অচিরে অস্থায়ী সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর

দ্বীপপুঞ্জের ভার অর্পণ করা হবে। তখন এ দু'টো দ্বীপ জাপানের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ঘাঁটি। নেতাজী এ সম্মেলনে পেলেন প্রচুর সম্মান, দেখা করলেন সম্রাটের সঙ্গে। তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হ'ল একাডেমী, ক্যাডেট, কলেজ, অস্ত্র কারখানা, বিমান নির্মাণ যন্ত্রশালা ও অস্ত্রাগার। (১)

জাপ সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক সুগিয়ামাকে ধরে তিনি সম্মতি আদায় করলেন যে ১৯৪৪ সনের অভিযানে জাপানী সেনাপতির অধীনে মিত্রবাহিনী হিসেবে আই. এন. এ. কে সঙ্গে নেওয়া হবে ও তাদের ভূমিকা ও কর্তব্য নির্ধারণ করবেন বর্মার সেনাধ্যক্ষ। দ্বিতীয় ডিভিসন গঠনের জন্যে সৈন্য ভর্তি ও তৃতীয় ডিভিসনের পরিকল্পনা ও শিক্ষার্থীদের জাপানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে নেতাজী সুগিয়ামার সম্মতি পেলেন। আই. এন. এর যারা প্রাক্তন যুদ্ধ বন্দী তাদের ব্যয়ভার বহন করবে জাপান আর বেসরকারিদের ভেতর থেকে যারা সৈন্যদলে এসেছে তাদের খরচ বহন করবেন নেতাজী।

১৮ই নভেম্বর সিঙ্গাপুর আসার পথে তিনি ঘুরে এলেন নানকিং সাংহাই, ম্যানিলা আর সাইগন। কি অসামান্য তেজ, অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি—এ যেন মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়ের পথে সে যুগের দিগ্বিজয় যাত্রা। ম্যানিলায় তাঁকে দেওয়া হ'ল রাষ্ট্রীয় সম্মান। সিঙ্গাপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ঝাঁন্সীর রাণী বাহিণী'—তারা সৈনিক ও নার্স হিসেবে কাজ করবে। রেঙ্গুন ও পেনংএর গেয়েন্দা স্কুল থেকে ও বিশেষ কাজের জন্যে যে দলের উপর মোহন সিং নির্ভর করেছিল তাদের ভেতর থেকে লোক নিয়ে "বাহাদুর দল" গড়ে উঠিল। তারা শত্রু পক্ষের পশ্চাদভাগ থেকে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবে ও গোয়েন্দাগিরি করবে। সেই সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের ভাঙ্গিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। এমনি করে একে একে "খবর

(1) Toyes—The Leaping Tiger

সন্ধানী দল" "শক্তি বর্ধক দল" গড়ে উঠল। এদের কাজ হ'ল যুদ্ধক্ষেত্র এলাকায়।

১৯৪৩ সনের ১৮ই এপ্রিল চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল রক্ষীবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের আয়োজনের অপরাধে ধরা পড়লেন কয়েকজন। ৬ই জুলাই ও ৫ই আগষ্ট বাঙ্গালোরের সেণ্ট এন্ড্রুজ চার্চে সামরিক বিচারে সকলেই দণ্ড পেলেন। তার মধ্যে শ্রীমান-কুমার বসু ঠাকুর, শ্রীনন্দকুমার দে, শ্রীতুর্গাদাস রায়চৌধুরী, শ্রীনিরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখার্জী, শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীসুনীলকুমার মুখার্জী, শ্রীকালিপদ আইচ ও শ্রীনীরেন্দ্রমোহন মুখার্জীর মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। ত্ব'জনের হ'ল যাবজীবন দ্বীপান্তর আর একজনের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ১৯৪৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর-এ ন'জনের মাদ্রাজে ফাঁসি হয়ে গেল। (১) কিন্তু তাঁরা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে গেলেন সে আগুন কিন্তু নিভল না— সকলের অজ্ঞাতে রয়ে গেল ভস্মাচ্ছাদিত হ'য়ে।

২৪শে নভেম্বর নেতাজী সাইগনে তেরাউচির সদর ঘাঁটিতে গিয়ে আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত হ'ল যে ১৯৪৪ সনের জানুয়ারীতে প্রথম ডিভিসন ও নেতাজীর নিজস্ব বেসামরিক হেড্ কোয়াটার্স বর্মায় স্থানান্তরিত হবে। সেখানে ভারতীয়দের তিনি চাঁদা ধার্য্য করলেন এক কোটি বিশ লক্ষ পিয়েস্তার।

২৫শে নভেম্বর ফিরে এলেন সিঙ্গাপুর। ডিসেম্বরে গঠিত হ'ল দ্বিতীয় ডিভিসন আর বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলে দলে আসতে আরম্ভ হওয়ায় তৃতীয় ডিভিসনের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলেন নেতাজী। ২৯শে ডিসেম্বর আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্লেয়ারে জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ নেতাজীকে স্বাগত জানালেন। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি পৌর প্রধানের কাছ থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের স্বাধীনতা স্বহস্তে গ্রহণ করে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যথাক্রমে নাম দিলেন

(1) Kali Charan Ghose—The Roll of Honour P 581

"শহীদ" ও "স্বরাজ" দ্বীপ। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লেঃ কর্ণেল লোকনাথন ছিলেন প্রবীন অফিসার। কয়েকদিন পরে নেতাজী বাংককে গিয়ে তাঁকে জানালেন যে তাঁকে করা হবে পোর্ট ব্লেয়ারের চীফ কমিশনার।

পেনাং এর বাটুপাহাটের স্কুল শিক্ষক এস. এন. চোপরার পরিচালিত দলটির কার্য্যপদ্ধতিতে আশার সম্ভাবনা দেখে নেতাজী চোপরার অধীনে একটি সাবমেরিন পার্টি গঠন করে ঠিক করলেন যে এই দলের লোকেরা পাঞ্জাব, বোম্বাই ও বাংলা থেকে বেতারে সংবাদ দেবে আর চোপরা দিল্লীতে বসে তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখবে। অক্টোবর মাসে নেতাজী তাঁদের সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন এমন কি তারা কি পোষাক পরবে কি চাকরি করবে ও কার কার সঙ্গে পরিচয় করবে তাও ভাল করে জানিয়ে দিলেন। ৮ই ডিসেম্বর যন্ত্রপাতি নিয়ে একটি দলে শ্রীএম. এ. কাদির, শ্রীএস. এ. আনন্দম ও অন্য তিনজন কালিকটে ও দ্বিতীয় দলে শ্রীসত্যেন বর্ধন ও অন্য চারজন ডুবো জাহাজে চড়ে চোদ্দ দিন পরে বোম্বাই ও করাচির মাঝামাঝি কাথিয়াবাড় উপকূলে এসে নামলেন। ভারতে পৌঁছুবার অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা বেতার গ্রাহক যন্ত্র সমেত ধরা পড়ায় বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ড হয়ে গেল। স্থলপথে প্রথম দল ১৯৪২ সনের ২৬শে অক্টোবর চট্টগ্রামে ও দ্বিতীয় দল শ্রীফৌজা সিং ও অন্য পাঁচজন আসামে পৌঁছুলেন। ১৯৪৩ সনের ১লা এপ্রিল তাঁদেরও বিচার হয়ে প্রাণদণ্ড হয়ে গেল। (১) এই আত্মবিসর্জনের পেছনে যে বিরাট শক্তি, বিরাট ত্যাগ, নিরবরুদ্ধ কল্যাণময় আনন্দ ও প্রতিভার যে জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি ছিল তার তুলনা নেই।

নেতাজী কোন দিনই চাননি যে জাপানীরা ভারতবর্ষ অধিকার করে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেবে। সেই সর্ব্বনাশা অনুগ্রহমদা তাঁর কাছে অপেয়মস্পর্শং। তিনি চেয়েছিলেন আজাদ্ হিন্দ ফৌজ

(1) Kali Charan Ghose—The Roll of Honoudr p 577-78

নিজ শক্তিমত্তায় জাপানীদের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা আনবে। ইংরেজ তখন 'সচেষ্ট ভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যা প্রচারের শয়তানী অস্ত্র' ব্যবহার করে প্রচার চালাচ্ছিল যে "সুভাষবাবু জাপানীদের দিয়ে ভারত আক্রমণ করাচ্ছেন। জাপানীরা দেশ দখল করবার পর ভারতবাসীর অবস্থা আরও খারাপ হবে। জাপান কোনদিনই ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না।" শুধু তাই নয় যাতে বেতারে নেতাজীর বক্তৃতা বা প্রচার ভারতবাসীরা শুনতে না পায় তার জন্যে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টির ব্যবস্থাও ইংরেজ করল। ছড়িয়ে দিল পৃথিবীময় তাদের গাঁটকাটা ব্যবসায়ের পরিধি। যুদ্ধ একদিন থামল কিন্তু শয়তানি আজ পর্যন্ত থামল না।

নেতাজীর নির্ভীকতা, অখণ্ড আত্মবিশ্বাস, সংগঠন প্রতিভা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দুঃসাধ্য কর্ম, অপরিমিত ত্যাগ, দীপ্তিমান চরিত্র, স্পষ্টবাদিতা আর স্পর্দ্ধাযুক্ত দাবী জাপানের কর্তাদের শুধু মুগ্ধ করে নি, তাঁরা সব সময় তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে সারা এশিয়ার মধ্যে এই একটি মানুষ—পৃথিবীর দৈনন্দিন সমস্ত খবর যাঁর নখদর্পণে, বুদ্ধি ক্ষুরধার, সাহস অসীম, কর্মক্ষমতা অপরিমেয়, নেতৃত্ব অসাধারণ, অন্তর অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। তাই আজও ভারতবাসীর অনেকেই সেই মহাপ্রাণ পুরুষের পথ চেয়ে বসে আছে। তিনি ক্ষণ-জন্মা—তাঁর জন্মেরও অন্ত নেই, জীবনেরও অন্ত নেই।

আট

১৯৪৪ সনের ৪ঠা জানুয়ারী নেতাজী তাঁর সদর দপ্তর ও মন্ত্রিসভার প্রধানদের নিয়ে রেঙ্গুন পৌঁছুলেন। সুভাষ বিগ্রেডের সৈন্যেরা পিঠে ৮০ পাউণ্ড বোঝা নিয়ে গড়ে দৈনিক ২৫ মাইল হিসেবে ৪০০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করে জানুয়ারী মাসের প্রথমে এসে গেল রেঙ্গুনে। যে পথ চলতে জাপানীদের ৫ দিন সময় লাগে যুদ্ধের উত্তেজনায় তারা সে পথ করল দু'দিনে অতিক্রম। ৭ই জানুয়ারী জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে নেতাজী ও শাহনওয়াজ খাঁয়ের আসন্ন ভারত আক্রমণ নিয়ে গোপন পরামর্শ আরম্ভ হতে কাওয়াবে বললেন যে কলকাতার উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ আর স্থল সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার নীতিই বাঞ্ছনীয়। নেতাজী কোন মতেই অসামরিক অধিবাসীদের উপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণের নীতি সমর্থন করতে পারলেন না। কাজেই সে প্রস্তাব হ'ল পরিত্যক্ত। কাওয়াবে বললেন যে আই. এন. একে ছোট ছোট দলে ভাগ করে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে রণাঙ্গনে এগিয়ে দেওয়া হবে। নেতাজী চাইলেন আই. এন. এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব—বললেন ব্যাটেলিয়ানের চেয়ে ছোট ইউনিট হলে তাদের শক্তি পরীক্ষা সম্ভব হবে না।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'ল যে আই. এন. একে ব্যাটিলিয়ানের চেয়ে ছোট অংশে ভাগ করা হবে না। এদের প্রতি ইউনিট থাকবে ভারতীয় অফিসারের অধীনে। জাপানী সৈন্য ও আই. এন. এ জাপান সেননায়ক ও নেতাজীর পরামর্শমত যুদ্ধনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করবে। আই. এন. একে স্বতন্ত্র ভাবে যুদ্ধ করতে হবে আর ভারতের যতটুকু জায়গা অধিকার হবে ততটুকু শাসনের ভার

ছেড়ে দিতে হবে আই. এন. এর হাতে। অধিকৃত জায়গায় উড়বে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের স্বাধীনতার পতাকা।

২৪শে জানুয়ারী স্থির হ'ল যে দু'টি কাজ দিয়ে আই. এন. এর রেজিমেণ্টকে পরীক্ষা করা হবে। প্রথম ব্যাটিলিয়ান প্রোম হয়ে কালাদান উপত্যকায় ব্রিটিশের পশ্চিম আফ্রিকান ডিভিসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাপানী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে আর বাকি দু'টি ব্যাটেলিয়ান ম্যাণ্ডালে ও কালেয়া হয়ে চিন পাহাড় এলাকায় যে জাপ সৈন্য পথ পাহারা দিচ্ছে তাদের বদলী হিসেবে কাজ করবে।

নেতাজী পরদিন থেকেই সুভাষ ব্রিগেড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী তারা রণাঙ্গণে যাবার সময় তিনি বললেন "রক্তের ডাক এসে গেছে, তোমরা জাগো, ওঠো। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে অস্ত্র ধারণ কর। আমাদের সামনে পথ প্রদর্শকেরা পথ দেখিয়ে গেছেন। সেই পথ ধরেই আমরা যাব। শত্রুপক্ষের ব্যূহ দীর্ণ করে আমরা আমাদের জয়ের পথ করে নেবো। আর যদি ভগবান চান যে আমরা মৃত্যু বরণ করে শহীদ হব তবে আমাদের সৈন্যেরা যে পথে দিল্লী যাবে মরণের কোলে শুয়ে আমরা সেই পথ চুম্বন করবো। দিল্লী চলো।" (১) সমস্ত সৈন্য একবাক্যে উত্তর দিল যে তারা ভারতের সুনাম কোন দিনই নষ্ট করবে না। তারা কোন দিনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে না।

৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমস্ত রেজিমেণ্টটাই রণাঙ্গণে রওনা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মায়ু উপত্যকায় সপ্তম ভারতীয় ডিভিসনের অসামান্য সাফল্যের খবর এসে গেল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। এই সাফল্যের আসল কারণ অরাকানে আই. এন. এর অধিনায়ক মেজর এল. সি. মিশ্র একটি গোপন ফাঁড়ির সন্ধান পেয়ে সেটা একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। মাষ্টার চোপরার যে গুপ্তচর দলটি ডিসেম্বর মাসে ভারতে পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছ থেকে গোপন

(1) Toyes—The Leaping Tiger.

সংবাদও আসতে আরম্ভ করল। এই দুই সাফল্যে জাপানীদের কাছে আই. এন. এর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। নেতাজী রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর অধিকার। শ্রীস্বামীকে এই উদ্দেশ্যে পাঠালেন পেনাং-এ।

সুভাষ ব্রিগেড ও জাপানী সৈন্যদের দলটি কালাদান নদীর তীর ধরে এগিয়ে চলল পলেতোয়ার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে। সেখানের যুদ্ধে তারা জয় করল দাঁতমে। দাঁতমে থেকে ভারত সীমান্ত মাত্র ৪০ মাইল পশ্চিমে। কক্স বাজারের পঞ্চাশ মাইল পূবে ছিল মওডক—ইংরেজ সৈন্যের ঘাঁটি। ১৯৪৪ সনের মার্চ মাসে আই. এন. এর এক অতর্কিত নৈশ আক্রমণে মওডকের পতন হ'ল। আত্মপ্রসাদ স্ফীত ইংরেজ সৈন্য রসদ ও অস্ত্রাদি ফেলে রেখে পালাতে বাধ্য হ'ল। সুভাষ ব্রিগেড বলিষ্ঠ নিসংকোচে সশস্ত্র বাহুর বিপুল বিস্তারে চলে এল ভারতের মাটিতে। প্রাণ প্রাচুর্যের কি দুর্ণিবার উৎসাহ—সে দৃশ্য অপরূপ। প্রতিটি সৈন্য ভারতের মাটিতে আসবার জন্যে দৌড়ে এসে শুয়ে পড়ে পরম স্নেহে তাদের 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' জন্মভূমির মাটি চুম্বন করল। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈন্যদের বহুযুগ পরে ১৯শে মার্চ প্রথম পদচিহ্ন পড়ল ভারতের বুকে—সগৌরবে আকাশে উড়ল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা—শতকণ্ঠে গাওয়া হ'ল জাতীয় সঙ্গীত। (১) সৈন্যদের সে অনাস্বাদিত আনন্দ, অন্তর্লীন উৎসাহ ও হাস্যমুখর কলরব জাতীয় জীবনের বিলুপ্ত স্মৃতি দীর্ঘকালের অবরোধ ভেদ করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল—সেই মুহুর্তের আনন্দ বেদনা বেজে উঠল কালের বীণায়।

রসদ সরবরাহের অসুবিধে ও শত্রুর প্রতি-আক্রমণের সম্ভাবনায় জাপ সেনাপতি সৈন্যদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। সুভাষ ব্রিগেডের অধিনায়ককেও সে কথা জানালেন। আই. এন. এর সৈন্যেরা এক বাক্যে না না বলে উঠল। তারা বলল "জাপানীরা

(1) Shahnawaj P 116

ফিরতে পারে কেননা চৌকিও পিছনের দিকে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য লাল কেল্লা—দিল্লী সামনের দিকে। আমাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে দিল্লী চলো—ফেরবার কোন কথাই নেই।" (১)

আই. এন. এর অধিনায়ক তখন বাধ্য হয়ে একটি ছোট দলকে মণ্ডডকে ক্যাপ্টেন সুরজমলের অধীনে পতাকা রক্ষার জন্যে রেখে যেতে চাইলেন। আত্মহত্যার মত এ কাজ, তবুও আই-এন-এর দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার দুর্মদ আকাঙ্খা দেখে মুগ্ধ হয়ে জাপ সেনাপতি তাদেরও একটি ছোট দলকে ক্যাপ্টেন সুরজমলের অধীনে রেখে গেলেন। জাপানের যুদ্ধ-ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম একজন ভারতীয়ের অধীনে রাখা হ'ল জাপ সৈন্য। (২) এ খবর রেঙ্গুনে পৌঁছাবামাত্র কাওয়াবে ছুটে এলেন নেতাজীর কাছে, শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন "আই. এন. এর সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল ছিল, আজ বুঝেছি তারা শুধু বেতনভুক নয় তারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।" (৩) নেতাজী সেই দিনই বেতারে এ সংবাদ প্রচার করে তাঁর দেশবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন "ভারতবাসীর প্রাণ বিপুল অসন্তোষে রোমাঞ্চিত; আজ তারা জানুক ভারতের মাটিতে এখন স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে। আজাদ হিন্দ সৈন্যদল স্বাধীনতার জন্যে মরণ পণ করে লড়ছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। এ স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতের প্রতিটি নরনারীর জীবনসংগ্রাম। জীবনহীন শুষ্ক পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রত্যেক ভারতবাসী যেন এই সৈন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে। যতদিন না ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একেবারে উৎখাত হয় ততদিন এ যুদ্ধ চলবে।" (৪)

এ সময়ে ভারতে গান্ধীজি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্যে ও ১৯৪২ সনের হিংসাত্মক কাজের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ২১ দিন অনশন

---

(1) Shahnawaj 116 (2) Ibid 118 (3) Ibid 118
(4) Thivy 27

শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১০৬

শ্রীমানকুমার বসু ঠাকুর—পৃঃ ১০৬

করবেন বলে ঘোষণা করলেন! তাঁর অসুস্থ শরীরের উপর অনশন সহ্য হবে না মনে করে ৬ই মে সরকার তাঁকে মুক্তি দিল। মুক্তি পাবার পর তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে আর এক দফা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের স্বপ্ন কুহকে আবিষ্ট তাঁর মন—আবেদন নিবেদন হ'ল অসার্থক। মরীচিকা দিয়ে সত্যিকারের তৃষ্ণা দূর হয় না। সুভাষ বাবুর ঘোষণার পর ভারতের অনেকেই বুঝলেন বীর সাভারকর বহুদিন ধরে বোঝাবার যে চেষ্টা করেছেন সৈন্যবাহিনীতে বিপ্লবী যুবকদের যাওয়া একান্ত প্রয়োজন সে কথাটা কতদূর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। রাজনীতিতে কত গভীর জ্ঞান থাকলে এ আলেয়ার পিছনে না ছুটে সত্যিকারের কাজের কথা বলা যায়।

ওদিকে মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সুরজমল তাঁর ছোট্ট সৈন্যদলটি নিয়ে অপেক্ষা করলেন মওডকে। বার বার প্রতিহত করতে লাগলেন ব্রিটিশ আক্রমণ। একদিন ২০ জনের ছোট্ট একটি দলের উপর আক্রমণ হ'ল তিনবার। ইংরেজের পক্ষে ছিল ১৫০ জন সৈন্য, ভারি কামান ও বিমান—তবুও তারা প্রতিবারই হ'ল প্রতিহত। ক্যাপ্টেন সুরজমল ৫০ জন সৈন্য নিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে তিন মাইল দূরের ইংরেজ ঘাঁটি অতর্কিতে আক্রমণ করে দখল করলেন সেটা।

সুভাষ বিগ্রেডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান ম্যাণ্ডালে হয়ে কালেয়ায় পৌঁছুবার পর জাপসেনাপতি তাদের চিনাপাহাড় এলাকায় হাকা ও ফালামে প্রহরার কাজে লাগালেন। তাদের প্রধান কাজ হ'ল আক্রমণকারী ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে হাকা ও ফালাম রক্ষে করা আর কালেয়া থেকে টামু পর্যন্ত সৈন্যদের রসদ চলাচল অব্যাহত রাখা। জাপ সেনাপতি বললেন এ কাজে দক্ষতা দেখাতে পারলে তাদের সম্মুখ যুদ্ধে পাঠানো হবে। তখন সেখানে ইংরেজের গরিলা সৈন্য এসে গেছে পর্যাপ্ত সংখ্যায়। কিন্তু সুভাষ বিগ্রেডের কানে বাজছে পাঞ্চজন্যের উদাত্ত আহ্বান। প্রয়োজনের লক্ষ্যে তারা ঝাঁপিয়ে

পড়ল ইংরেজ সৈন্যের ঘাঁটির উপর। শত্রুপক্ষ প্রস্তুত ছিল না ; নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মাত্র ২০ জন সৈন্য ১০০ জন শত্রু সৈন্যকে হটিয়ে দিয়ে দখল করে নিল ল্যাং ল্যাং ঘাঁটি। সুভাষ বিগ্রেডের এ দুর্জয় সাহস ও বলিষ্ঠ সাফল্যে মুগ্ধ জাপসেনাপতি তাদের কোহিমা রণাঙ্গনে পাঠানোর হুকুম দিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে ইম্ফলের পতনের পর তারা ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ঢুকে পড়বে বাংলার মধ্যে। তখন হাকায় ১৫০ আর ফালামে ৩০০ সৈন্য রেখে বাকি সৈন্যদের পাঠানো হ'ল নাগা পাহাড়ের রাজধানী কোহিমার দিকে। মে মাসের শেষে আই. এন.-এর সৈন্যেরা পৌঁছুল কোহিমায়।

১৯৪৪ সনের মার্চমাস থেকেই 'বাহাদুর দল' ও 'আজাদ হিন্দ দল' জাপানের মাঞ্চুরিয়া সৈন্যদলের সঙ্গে কোহিমা অভিমুখে যেতে আরম্ভ করেছিল। অধিকৃত এলাকার অধিবাসীদের সুখ সুবিধের ব্যবস্থা, খাবার ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনের জন্যে অস্থায়ী সরকারের পক্ষে দু'দলই তখন কর্মব্যস্ত। কোহিমার উন্নত গিরিচুড়ায় তখন উড়ছে ভারতের স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। মে মাসের শেষে যখন আই. এন. এর সব দল গিয়ে কোহিমায় পৌঁছুল তখন অবস্থার হয়ে গেছে বিপুল পরিবর্তন। জাপানের বিমান বহর তখন কোহিমা ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় আমেরিকার সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে আর ইংরেজও পাঠিয়েছে প্রচুর সৈন্য কোহিমা সীমান্তে। জাপ সৈন্যেরা বিমানের সহযোগিতা না পেয়ে ইম্ফল দখল করতে পারল না। ডিমাপুর ও কোহিমার বাইরে থেকে ব্রিটিশ অবিরাম আক্রমণ চালাতে লাগল। কিন্তু আই. এন. এর সৈন্যেরা শত্রুর নিপুণ অস্ত্রবল ও সৈন্য বলের কথা জেনেও সব বিপদকে তুচ্ছ করে বীর বিক্রমে নেমে পড়ল কোহিমার যুদ্ধে। এ দুর্দিনে প্রকৃতিও সাহায্য করলেন ইংরেজকে। নব বর্ষার মেঘমালার পুঞ্জিত আক্রমণ ও প্রবল ধারা বর্ষণের মাঝে রসদ সরবরাহ এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে সুভাষ ব্রিগেড ও জাপ সৈন্যেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও

ফিরে এল টামুতে। বর্ষায় কাদায় পথ ঘাটের চিহ্ন তখন বিলুপ্ত। অতিকষ্টে কয়েক শ' মাইল তারা ফিরে এল পদব্রজে।

এপ্রিল মাস থেকে গান্ধী ব্রিগেড চলেছিল রেঙ্গুন থেকে ইম্ফলের দিকে। টামু পোঁছে তারা শুনল যে ইম্ফলের পতন হয় নি, টামুর মাঝ বরাবর প্যালেলে চলেছে প্রচণ্ড যুদ্ধ। গান্ধী ব্রিগ্রেডের উপর ভার পড়ল টামু প্যালেল সড়কের দক্ষিণ থেকে গরিলা আক্রমণ চালাবার। পূর্বদিক থেকে জাপ সৈন্যের ও দক্ষিণ থেকে গান্ধী ব্রিগ্রেডের আক্রমণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে প্যালেল বিমান ক্ষেত্র দখল হয়ে গেল—সে বীরত্বের তুলনা নেই—মহাশক্তির স্পন্দনে স্ফুরণে সে সমুজ্জল।

ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপ সৈন্যদের ডাক পড়ার অল্পদিনের মধ্যে তাদের প্যালেল ছেড়ে চলে যেতে হ'ল। বাধ্য হয়ে গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যেরা প্যালেল বিমান ক্ষেত্রের সব বিমানগুলিকে ধ্বংস করে টামু ফিরে এল। এ কাজে প্রাণ দিতে হল ২৫০ জনকে।

এর পরই ইংরেজ গোরা সৈন্য আই. এন. এ র উপর বার বার আক্রমণ আরম্ভ করল। দু'পক্ষের তুমুল সংগ্রামের মধ্যে কয়েকবার প্রতিহত হয়েও ইংরেজ সৈন্য চালিয়ে যেতে লাগল যুগপৎ কামান ও বিমান আক্রমণ। আই. এন. এর সেনাপতি লেঃ আজাব সিং তবুও এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ চালালেন। বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী তবুও বিশ্রামের নেই অবসর। (১) এরপর এল রসদ ও ওষুধের অনটন। একদিকে ইংরেজের ৩০০০ সৈন্য, কামান ও বিমান বহর অন্য দিকে গান্ধী ব্রিগেডের হতাবশিষ্ট মাত্র ৬০০ সৈন্য। যুদ্ধের সহায়োপযোগী সমস্ত জায়গাগুলি ইংরেজ একে একে দখল করে নিয়েছে। ব্রিগেডের সেনাপতি হুকুম দিলেন পাহাড়ের একটা চূড়া দখল করতেই হবে। লেঃ মনসুফলাল মাত্র ৩০ জন সৈন্য নিয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যে পালন করলেন সে আদেশ। যখন তাঁর

(1) Shahnawaj p 151

অর্ধভুক্ত সৈন্যদল নিয়ে তিনি পাহাড়ে উঠছেন তখন তাঁর শরীরের তের জায়গায় বুলেট লেগেছে—সে অবস্থায় পড়ে গেলেন তিনি। তাঁর সৈন্যগণের মনোবল তখনও অটুট। বুলেট বিদ্ধ শরীর নিয়ে তিনি অসংকোচ আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন—জয় করলেন সে শৃঙ্গ। (১) এর আগেও একবার লেঃ আজাব সিংএর সৈন্যেরা কৌশলে ব্রিটিশ সৈন্যদের ঘিরে ফেলে নিধন করেছিল ২৫০ জনকে। (২)

দারুণ বৃষ্টির ফলে টামু-প্যালেল রাস্তা গেল ধ্বসে। তখনও ভারতের প্রায় ২০০ বর্গমাইল এলাকা আই. এন. এ.র দখলে। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী সত্ত্বেও তারা ফিরে যেতে রাজি হ'ল না। অর্থের ভাণ্ডার শূন্য, সৈন্যদের স্বাস্থ্য নির্মম ভাবে বিনষ্ট। স্থানীয় নাগা সর্দাররা তাদের অনুরোধ করে বললেন "তোমারা দেশের গৌরব, স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক তোমরা, তোমরা ফিরে যেওনা। আমাদের নিজেদের খাদ্যাভাব, আমরা জীবন্মৃত, তবুও আমরা যে কোন উপায়ে তোমাদের খাবার জোটাব। মরতে হয় আমরাও অনাহারে প্রাণ দেবো। তোমাদের দেশের লোকেরা পেয়েছে নির্বাসন, জেল, বেত্রদণ্ড, ফাঁসি। দলন দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে ইংরেজের বারে বারে। শত্রু ইংরেজকে আমরা চাইনা, বন্ধু জাপানীও আমাদের কাম্য নয়। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যে বীর দেশের অন্তরের মর্ম-বাণীকে আজ জগতের সামনে তুলে ধরেছেন, বইয়ে দিয়েছেন সমস্ত জাতির চিত্তপ্রান্তরের মাঝখান দিয়ে অমৃত মন্দাকিনীর ধারা, আমরা চাই সেই আমাদের একান্ত আপনার জন পরমাত্মায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে।" (৩)

২০শে জুন সুভাষ ব্রিগেডের অধিনায়ক মেঃ জেনারেল শাহ-নওয়াজ উখরুল থেকে সৈন্যদের আদেশ দিলেন ডিভিসনের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে। কিন্তু তিনি ও তাঁর সৈন্যেরা

(1) Shahnawaj 153-54 (2) Ibid 154 (3) Ibid 155-53

পড়ে গেলেন নানা বিপর্যয়ের মুখে। রোগে ওধুধ নেই, ডাক্তার নেই, শুশ্রূষার লোক নেই, জীর্ণতার উপর বার বার চলেছে মৃত্যুর নখরাঘাত, শক্রর অমেধ্য ক্লিন্ন কর দিকে দিকে প্রসারিত, গলিত শবের দুর্গন্ধে সেখানটা প্রায় নরকে পরিণত। ৮ই সেপ্টেম্বর অতিকষ্টে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন দু'হাজার সৈন্যের মধ্যে সুভাষ বিগ্রেডের মাত্র পাঁচশ জন জীবিত।

নেতাজীর গোপন সংবাদমত তখনও বাংলায় চলেছে প্রস্তুতি। আই. এন এর 'হোম ফ্রন্ট', লোক মারফৎ ও রেডিও যোগে যোগাযোগ রাখছে নেতাজীর সঙ্গে অতি গোপন পথে। ইংরেজের সামরিক তথ্য পাঠানো হচ্ছে তাঁর কাছে। এরই মধ্যে একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা। কলকাতায় ৪৬নং শিবঠাকুর লেনের চারতলায় তখন গোপন কেন্দ্রায় অফিস। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন দু'জন। সে সময় শ্রীমতী দীপ্তি ও শ্রীমতী হেনা ঘোষ কয়েকটি গোপন পত্র দিয়ে গেলেন শ্রীসত্যব্রত মজুমদারের হাতে। সকলেই চলে এলেন শুধু ঘরের মধ্যে জরুরী কাজের জন্যে থাকলেন দু'জন। পুলিশ কেমন করে সন্ধান পেয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিতেই একজন দাঁড়ালেন দরজায় পিঠ দিয়ে আব সেই অবসরে শ্রীগোপাল সেন সেই কাগজ গুলিতে দিলেন আগুন। দরজা ভেঙ্গে পুলিস কালান্তক যমের মত ঢুকে পড়ল ঘরে। শ্রীগোপাল সেনের হাতে সেগুলি তখন জ্বলছে —দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আছেন দগ্ধাবশিষ্ট পত্রগুলি। সেই পত্রগুলির কাছে তখন তাদের জীবন তুচ্ছ। একহাতে পুলিশকে বাধা দিতে দিতে তিনি যখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন পুলিশ তাঁকে শূন্যে তুলে ফেলে দিল নীচে। দেহ হ'ল ক্ষত বিক্ষত, তাজা রক্তে ভেসে গেল রাজপথ। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে হ'ল মৃত্যু—১৯৪৪ সনের ১১শে জুলাই সে অনাদৃত অবজ্ঞাত শহীদের আত্মত্যাগের নীরব সাক্ষী হয়ে রইল। (১)

(1) Subodh Chakravarty—Article in Biplabi Bangalee p 57-58 dt. 8.10.56.

১৯৪৪ সনের ৪ঠা জুলাই নেতাজী সৈন্যদের বললেন, "এখন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য শহীদের মত মৃত্যু বরণ। এ স্বাধীনতার যুদ্ধে তোমাদের কাছে আমি মাত্র একটি জিনিস চাই—সে জিনিস হ'ল রক্ত। শত্রু যে রক্তপাত করেছে তার প্রতিশোধ রক্ত দিয়েই নিতে হয়। রক্তদানই স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য। আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।"

জুলাই মাসের প্রথম দিকেই অনাহার, ব্যাধি ও যুদ্ধে মরে গান্ধী বিগ্রেডের সৈন্য সংখ্যা দু'হাজার থেকে কমে দাঁড়াল এক হাজারে। যাঁরা বেঁচেছিল তারাও ভগ্নস্বাস্থ্য। এদের অনেককেই গাছের পাতা, ঘাসের রুটি খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। ব্রিটিশ এ সংবাদ পাবামাত্র গান্ধী ব্রিগেডের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করল। মেজর আবিদ হোসেন সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে অদ্ভুত সাহসে সে বেষ্টনী ভেদ করে গান্ধী বিগ্রেডকে আনলেন উদ্ধার করে। সন্ধ্যের সময় আবিদ হোসেন প্রতি-আক্রমণ চালালেন। সেদিনও যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় হ'ল। প্রকটিত হয়ে উঠল আই. এন. এর বীরত্বের নিকষ পাথরের উপর কর্তব্যানুরাগ ও বিশ্বাসের পুলক চিহ্ন। আবিদ হোসেন ও তাঁর দুই সহকর্মি সেই বীরত্বের জন্যে পেলেন সর্দার-ই-জঙ্গ-মেডেল।

জাপানী সৈন্য অপসারণের ফলে সমস্ত চাপ পড়ল গান্ধী বিগ্রেডের উপর। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা ফিরে এল কালেয়ায়। আজাদ বিগ্রেডের উপর ভার ছিল প্যালেলের চারদিকে ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ চালানো—বিশেষ করে টামু-প্যালেলের উত্তর দিকে। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তাদের গান্ধী বিগ্রেডের সঙ্গে ফিরে আসতে হ'ল। ২৬শে জুলাই প্রকাশ্যভাবে ইম্ফল অভিযান আপাততঃ স্থগিত রাখা হ'ল। সেই দিনই বাস্তববাদী যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ মিঃ তোজো মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলেন।

এই দুর্দৈব পীড়িত অভাব অনটন ও সংকীর্ণতায় ম্লান বিপর্যয়ের

মুখেও নেতাজী মনোবল হারান নি। ৮ই সেপ্টেম্বর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এপ্রিল ও জুলাই মাসের ঘোষণা অনুযায়ী কয়েকটি পদক দান করলেন। ১৯৪৩ সনে ভারতে প্যারাসুটবাহী গুপ্তচদের ফাঁসি হয়েছিল তাঁদের স্মৃতিতে ২১শে সেপ্টেম্বর পালন করলেন শহীদ দিবস।

১৯৪৪ সনের জাপান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। জাপ সৈন্যেরা এর সমস্ত প্রবেশ পথ বন্ধ করে অবরোধ করেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যেরা কয়েকবার চেষ্টা করেও সে নিশ্ছিদ্র অবরোধ মুক্ত করতে পারে নি। নেতাজী বলেছিলেন সব সৈন্য বন্দী করতে আর যুদ্ধাস্ত্র হস্তগত করতে। তাঁর ধারণা ছিল ইম্ফলে দেড় লক্ষ ভারতীয় সৈন্য আছে। তাদের বন্দী করতে পারলে তারাও হয়ত আই. এন. এতে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়বে আর অস্ত্রগুলিও তাদের ব্যবহারে লাগবে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সনের ১৯শে মার্চ আই. এন. এ ইণ্ডোবর্মা সীমান্ত পার হয়ে স্বাধীন ভারতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িয়েছিল। ২১শে মার্চ নেতাজী সারা জগতকে জানিয়েছিলেন যে আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব সীমান্তের মধ্যে ঢুকে সংগ্রাম করছে স্বাধীনতার জন্যে। সেই দিনই মিঃ তোজো জাপ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছিলেন যে অধিকৃত অঞ্চল আসবে অস্থায়ী সরকারের অধীনে। প্রথম প্রথম জাপানীরা মনে করেছিল ইম্ফল জয় সহজে হবে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে আমেরিকার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে জাপানীরা ভারত সীমান্ত থেকে তাদের বিমান বহর ও সৈন্য অপসারণ করিয়ে আনতে বাধ্য হ'ল। জাপানীদের বিশ্বাস ছিল যে মে মাসের মাঝামাঝি তারা ইম্ফল দখল করতে পারবে আর তারপরে বর্ষায় ইংরেজের প্রতি-আক্রমণ সুবিধে হবে না। সেই অবসরে জাপানীরা নিজেদের অবস্থা ঠিক করে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পৌঁছে যাবে বাংলা ও বিহার পর্যন্ত। কিন্তু ইম্ফলে বর্ষা আগেই

আরম্ভ হয়ে গেল। তার উপর ছিল জাপানীদের আলস্যে কালক্ষেপ, প্রশাসনিক ও সরবরাহের ব্যর্থতা।

ইম্ফল যাত্রার সময় আই. এন. এর ডিভিসনে সৈন্য সংখ্যা ছিল ছ'হাজার। ফিরে এল মাত্র দু'হাজার দু'শো। তারমধ্যে দু'হাজারকে পাঠাতে হ'ল হাসপাতালে। অভিযানকালে সাতশো পনরজন দলত্যাগ করে, যুদ্ধে নিহত প্রায় চারশো, আত্মসমর্পণ করে প্রায় আটশো আর দেড় হাজার লোক রোগে ও অনাহারে প্রাণ হারায়। (১)

তবে এটা ঠিক যে আই. এন. একে এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। রসদ সরবরাহ ও যান বাহনের অভাবে তাদের কষ্টের সীমা ছিল না। হাকা-ফালাম কেন্দ্রে তাদের ৬০০০ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হয়েছে সম্পূর্ণ পদব্রজে। রাণা প্রতাপের মত দিনের পর দিন তারা কাটিয়েছে নুন দিয়ে ভাত খেয়ে। সেখানে দারুণ শীতে একটিমাত্র গরম সার্ট ও একটি সুতীর কম্বলে রাত কাটিয়েছে আগুনের ধারে বসে। লাঞ্ছনা বিড়ম্বনার দারুণ ঘনঘটার মাঝে গেছে অনেক দিন। পায়ে জুতো নেই, পরিধান ছিন্ন মলিন, ম্যালেরিয়া-প্রধান হাকে তাদের একটা মশারি পর্যন্ত ছিল না। অনাহারে কেটেছে অনেক দিন—লিংগ্রা ঘাসের পাতা ও ঘাসের রুটি কেউ কেউ খেয়েছে—তবুও তারা যুদ্ধ করেছে স্বাধীনতার জন্যে। তাদের এ ঋণ ভারত কোন দিনই শোধ করতে পারবে না।

নাগা পাহাড়ের রাজধানী কোহিমায় যখন আই. এন. এর সৈন্যেরা উপস্থিত তার দু'একদিনের মধ্যেই তাদের রসদ শেষ হয়ে যায়। পরিত্যক্ত নাগা গ্রাম থেকে কিছু ধান সংগ্রহ করে বুনো ঘাসের আগুন জ্বেলে তা' সেদ্ধ করে তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে—সময় সময় নুন পর্যন্ত জোটে নি। মশা মাছির উপদ্রবও কম সহ্য

(১) ১৯৪৫ সনে নয়াদিল্লীস্থ সরকারি দপ্তরের প্রদত্ত তথ্য

করতে হয় নি। যখন কোহিমা থেকে ফিরে আসছে সে সময় বর্ষায় কাদায় শরীরের অর্ধাংশ গেছে ডুবে। ইংরেজ সে সুযোগে ওপর থেকে লোভ দেখিয়ে ইস্তাহার ছেড়েছে তাদের পুরানো সৈন্যদলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু তাতে ফল হয় নি। বরং সৈন্যেরা সে অবস্থায় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল। মৃত্যুর পর মৃত্যু দিয়ে তাদের সে যুদ্ধ অন্তহীন প্রাণের বিকাশ তীর্থে যাত্রার গৌরবময় ইতিহাস।

১৯৪৪ সনের শেষে ও ১৯৪৫ সনের প্রথমার্ধে ইংরেজ আস্তে আস্তে আরম্ভ করল প্রতি-আক্রমণ। আরাকান শত্রু কবল মুক্ত করে নিয়ে ১৯৪৫ সনের ১লা জানুয়ারী আকিয়াব করল পুনরাধিকার। জানুয়ারীর মাঝামাঝি কালাদান নদীর পূর্ব দিকে মিয় হাউং হ'ল বিপন্ন। নেতাজী ছুটে এলেন বর্মায়। জাপানীরা তখন যুদ্ধ জয়ের নতুন ছক তৈরী করছে তাতে আই. এন. এর দ্বিতীয় ডিভিসনের অংশ নেবার কথা হ'ল ; আর ঠিক হ'ল ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুন থেকে সৈন্যদল রওনা হবে। বাকি ডিভিসন যে পর্যন্ত না এসে পৌছয় সে পর্যন্ত ৪র্থ গরিলা রেজিমেন্টকে মিয় হাউং থেকে দক্ষিণে প্রায় বারো মাইল দূরে আই এন এর ঘাঁটি পাহারা দিতে হবে। সেনাপতি জি. এস. ধীলন ২৯শে জানুয়ারী সিংইয়ানে এই মর্মে আদেশ পেলেন। কাল বিলম্ব না করে তিনি চারদিনের মধ্যে সৈন্যদলকে গন্তব্যস্থানে দিলেন রওনা করে। কিন্তু মাত্র ১২০০ সৈন্য নিয়ে বারো মাইল পথ রক্ষে করা সম্ভব হ'ল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী নেতাজী রেঙ্গুন থেকে এলেন মেকটিলায় শাহনওয়াজ এর কাছ থেকে সব সংবাদ শুনে তিনি নিজে রণাঙ্গনে গিয়ে তাঁর সৈন্যদের হয় জয় না হয় মৃত্যুর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করলেন। বললেন যে তাঁর সৈন্যদের শৌর্য বীর্যের এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাদের স্বদেশবাসীরা

ভারতবর্ষে আবার বিপ্লবের নিশান তুলে ধরবার প্রেরণা পায়। কত প্রাণের মূল্যে সে ইতিহাস রচিত হ'ল এখানে সে হিসেব তুচ্ছ। কিন্তু নেতাজীর সেনাপতিরা দিলেন বাধা। তাঁরা কোন রকমে তাঁকে রণাঙ্গনে যেতে দিতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন "আপনার জীবন এখন আপনার নিজের নয়—ভারতের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে তা আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে—তাকে রক্ষে করার দায়িত্ব আমাদের।"

২৭শে ফেব্রুয়ারী নেতাজী পিনমানায় পৌছুলেন। কিছু দিন পরেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে করল যুদ্ধ ঘোষণা। এদিকে জাপানীরা তখন পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করেছে। ১৯৪৫ সনের ৪ঠা মে ইংরেজ রেঙ্গুন পুনরুদ্ধার করল। আই. এন. এর অনেকে বন্দী হলেন। নেতাজী বর্মা ছাড়লেন। যাবার সময় বলে গেলেন "বীরের মত পরাজয় মানো, পরম সম্মান ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যর্থতা বরণ কর। তোমাদের জীবনাদর্শ আত্মত্যাগের অপার্থিব মহিমায় উদ্ভুত—এর ক্ষয় নেই।" করুণাজলভার গম্ভীর মেঘমন্দ্রের মত দুঃখাশ্রুচঞ্চল বিষাদ করুণ সে বাণী—'প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট'।

৬ই আগষ্ট অ্যাটম বোমা পড়ার ফলে সেই মাসের মাঝ বরাবর জাপান বশ্যতা স্বীকার করল। নেতাজী সাইগন থেকে একটি দু' এঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারু বিমানে কয়েকজন জাপ অফিসারের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেণ হয়ে চললেন টোকিও। ফরমোজার তাইহোকু বিমান বন্দরে ১৮ই আগষ্ট নামলেন বেলা দু'টোর সময়। সেখান থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে তাইহোকু ত্যাগ করলেন। তারপরের সঠিক সংবাদ আজও অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত। জাপান সরকার জানাল যে বিমানে আগুন লেগে নেতাজী পুড়ে যান - কোন রকমে তিনি বেরিয়ে আসার পর হাসপাতালে সেই রাত্রে ৮—৯ টার মধ্যে নম্মান ওয়ার্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে সময় তার সঙ্গে ছিলেন

হবিবর রহমান। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই এ সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করে নি। এখনও অনেকের ধারণা তিনি জীবিত—হয়ত বা সাইবেরিয়ার কোন বন্দীশালায় বসে মুক্তির দিন গুনছেন।

এই সন্দেহ নিরসনের জন্যে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত একটি কমিটি গঠন করে অনুসন্ধান করে। কিন্তু কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে নেতাজীর দাদা কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। সেই পরম নির্ভীক ভারতের স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ভারতবাসীর মনে চিরদিন অমর হয়েই থাকবেন। তিনি অমিতায়ু—তাঁর মৃত্যু নেই—সারা ভারত তার মধ্য দিয়েই একদিন অমৃতের সন্ধান পাবে।

আজও মনে পড়ে সেদিন যাঁরা হাসিমুখে বিশ্বজনীন মঙ্গলের জন্যে, দেশের কল্যাণের জন্যে মৃত্যু বরণ করেছিলেন ঐতিহ্য পরম্পরায় অনুপ্রাণিত সেই ক্ষণজন্মা পুরুষেরা মরলেন না—মরলুম আমরা - যারা মৃত্যুকে পরিহার করে পার্থিব সম্পদের মাঝে বাঁচতে চেয়েছিলুম। মনে হয় বাঁচা কি এতই সোজা? কৃতকীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে ক্লান্ত সংশয়ে অমৃতকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি আমরা --যারা মৃত এরই নাম অভাবনীয় ভাগ্যের পরিহাস। ঘনিয়ে আসে অবিশ্বাসের দীর্ঘায়ত ছায়া, হৃদয় শ্মশানে অরুন্তুদ অনুভূতির মেঘরক্ত চিতা। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় "তাই বা পারলুম কই? চারপাশে আজ শুধু আঁধার—জমাট কালো কালি আলো নেই নিভে গেছে। আমরা মিউজিয়ম তৈরী করছি—সাজিয়ে রাখছি জাতির বাতায়নে লোকে দেখবে বলে। কিন্তু দেখাব কি? ইতিহাস মরুতে বীরত্ব কাহিনীর ওয়েসিস্? কে দেখবে? মরা মানুষের চোখ থাকে দেখে না—দেখতে পায় না। তবুও আশা করি যদি কোন দিন চাকা ঘুরে যায়—দেখবে দেশ দেখবে জাতি।" (১)

---

(১) গ্রন্থকারকে লিখিত শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীর পত্র।

আজাদ হিন্দ ফৌজের এ উদ্যম, এ দেশপ্রেম, এ অকুণ্ঠিত চিত্তে অসাধ্য সাধন চিরদিনের জন্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ পরিচয় সমস্ত জাতির জীবন-যজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মত। তারই থেকে জ্বলবে তার অনাগত দিনের প্রদীপ তার ভাবীকালের মশাল। অনেকের মতে আই. এন. এর সৈন্যেরা ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। কথাটা যেমন সত্য তেমনি তাদের ব্যবহারে ত্যাগে, কর্মে ও আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তারা যে দেশ প্রেমের অলোকসামান্য গৌরব, অপ্রমত্ত পৌরুষের বীর্য্যবান মহিমা তুলে ধরেছে তার তুলনায় এ বিশ্বাসঘাতকতা অতি তুচ্ছ। জাপান সরকার অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সামরিক অসামরিক সরবরাহ বন্ধ করতে বাধ্য না হ'লে দেশের স্বাধীনতার রূপ আজ অন্যরকম হ'ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীশাহনওয়াজ বলেছেন যে তাঁর ধারণা জাপানীরা আই এন. একে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা সব সময় আশঙ্কায় থাকত যাতে আই. এন. এর শক্তি তাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী না হয়। কিন্তু জাপানের আত্ম-রক্ষার্থে সৈন্য ও বিমান বহর অপসারণের মধ্যে বিশেষ কোন অন্যায় আছে বলে মনে হয় না। নিজের দেশের একান্ত প্রয়োজনের জন্যে তারা এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবুও তারা যা করেছে আমরা তার জন্যে কৃতজ্ঞ। তারা নেতাজীকে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে ও যে সাহায্য দিয়েছে তার জন্যে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী মাত্রেই তাদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

সেদিন এই চরিত্র, এই মহত্ত্ব বরং লাঞ্ছিত হয়েছিল ভারতবর্ষেই। সেদিনের কংগ্রেসের নেতারা নেতাজীর বিরুদ্ধে কৃত্রিম পৌরুষের বীভৎস বিষোদগার করতে কুণ্ঠিত হন নি। ইংরেজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিন্দে করেছিলেন তাঁর জাপানের সাহায্য নেওয়ার বিরুদ্ধে। নেতাজী বলেছিলেন "I am not ashamed to take the help of Nippon. I shall go further and say that if the

once mighty British Empire can go round the world with the begging bowl and can go down on its knees in order to obtain help from the United States of America there is no reason why we, an enslaved and disarmed nation, shall not take help from our friends." জাপানের সাহায্য নেওয়ার জন্যে নেতাজী কিছুমাত্র দুর্বলতা বোধ করেন নি। অন্তরের উদ্দীপ্ত তেজের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে বলেছিলেন, "But I have yet to find one single instance in modern history where an enslaved nation has achieved its liberation without foreign help of some sort. And for enslaved India, it is much more honorable to join hands with enemies of the British Empire than to curry favour with British leaders of political parties."

ইংরেজ কিন্তু বুঝেছিল যে ভারতে তাদের আসন টলমল করছে। তারা বসে আছে আগ্নেয়গিরির উপর। আই. এন. এর ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হয় নি—ব্যর্থ হতে পারে না। 'যে প্রীতি যে শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় না।' ইতিহাসের পথ সাধারণের জনপথ নয়—সে রাজপথ—কর্ম সাধনার অমলিন কীর্তিকাণ্ডে সে পথ চিরদিনই আলোকিত।

নয়

১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জার্মানীর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আই. এন. এর অনেককেই বাধ্য হয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে জার্মানীতে ফিরে আসতে হ'ল। ফেরার পথে প্রায় দুশো' অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেল অকালে। ১৯৪৫ সনের এপ্রিলের শেষে দক্ষিণ জার্মানিতে কয়েকজন ধরা পড়লেন। সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে লেক কনস্টানসে একদলের একশ' পঞ্চাশ জনকে একটা সিনেমা হলে অনাহারে সারারাত্রি আটক রেখে পরের দিন তাদের ফরাসী সৈন্য দিয়ে গুলি করে মারা হ'ল। বাকি সৈন্যদলের বন্দী অবস্থায় অনেকেই মৃত্যু বরণ করলেন। ইতিহাসে সে কাহিনী আজও অজ্ঞাত। দেশ স্বাধীন হবার পরও সে সম্বন্ধে কোন তথ্যানুসন্ধান আজ পর্যন্ত হয় নি। দূর প্রাচ্যে ১৯৪৫ সনের ১৩ই মে আই. এন. এর সৈন্যেরা পেগু সহরে আত্মসমর্পণ করবার পর ১৯৪৬ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের মিলিটারী সেক্রেটারী জানালেন "আই. এন. এর ২৭ জন বন্দী অবস্থায় মারা গেছে। ক্যাপ্টেন মাধব সিং ও লেঃ আজমীর সিং আত্মহত্যা করেছেন আর ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।" সঠিক তথ্য নির্ণয়ও শক্ত। আই. এন. এর এই বিশ্বাস অখণ্ড আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা ও শক্তিপূর্ণ গৌরবে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও শেষ অধ্যায়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৪২ সনের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। তার আগে বিপ্লব আন্দোলনও বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস তখন দলাদলি, ঈর্ষা ও ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ, কর্মে মুমূর্ষু। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে সারা যুদ্ধে

ভারতবর্ষের ১৬,৪০০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১২৭৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং পাউণ্ড ব্যয় হয়েছে। (১)

কিন্তু ভারতবাসীর মনে আই. এন. এর প্রভাব তাদের সাধনা, তাদের শৌর্য ও ত্যাগ তখন সিংহাসন পেতে বসেছে। তাদের সেদিন প্রত্যক্ষ ধারণা হয়েছে যে দেশ প্রেমের জন্যে দুঃখ যথার্থ ঐশ্বর্য। তাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্ধে মহীয়ান করে তোলে। ইংরেজ তার চরম দুর্দিনে ভারতকে স্বাধীনতা দেয় নি—যুদ্ধজয়ের পর তারা যে স্বাধীনতা দেবে এ কল্পনাও তখন সুদূর পরাহত। কিন্তু যুদ্ধ জিতলেও ইংরেজের শক্তি তখন অবনমিত সূর্যাস্তের মত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার সম্মান তখন দ্বিতীয় স্তরে নেমে এসেছে। একদিকে আমেরিকা আর অন্যদিকে রাশিয়া তখন শক্তিমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পতনের সভাপতিত্ব করতে না চাইলেও ১৯৪৫ সনের ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেখা গেল তাঁর মন্ত্রিত্বে আর লোকের আস্থা নেই। হ'ল শ্রমিক দলের নিরঙ্কুশ জয়লাভ। মিঃ ক্লিমেণ্ট এটেলী প্রধান মন্ত্রি ও লর্ড পেথিক লরেন্স ভারত সচিব হয়ে বসলেন।

এ সময় ব্রিটিশ সৈন্যেরা দেশে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। বর্মা, সিঙ্গাপুর ও মালয়ের যুদ্ধে ইংরেজের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল তা পুরণ করবার সাধ্য ইংলণ্ডের আর ছিল না। যুদ্ধের আরম্ভ সময় ভারতের ষ্টার্লিং দেনার পরিমাণ ছিল ৩৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৪৫ সনের ১লা এপ্রিল সেটা ৫০০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াল। (২) লোকচক্ষে এর আসল অর্থ ধরা পড়ল না। তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকপ্রিয়তা ও আদর্শ ভারতীয় সৈন্যদের মনে রেখাপাত করেছে। কাজেই ইংরেজ বুঝল যে ভবিষ্যতে কোন

(1) Statistical year Book of the League of Nations 1942-44 (Geneva 1945) p 250. (2) The Eastern Economist dt, 26.10.1949 p 633.

বিদ্রোহ দমনে সেই সব সৈন্য নিয়োগের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা আছে। ইংরেজের কর্তারা বুঝেছিলেন যে অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতবাসীর মনে যে দেশাত্মবোধ জেগেছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তারা চায় ইংরেজ শাসনের অবসান। জাপানে আক্রমণে দূর প্রাচ্যে ইংরেজের নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়। কাজেই আমেরিকার চাপে, চীন ও রাশিয়ার ইচ্ছেয় আর ভারতবাসীর মনোভাবের পরিবর্তনে ও সৈন্যবাহিনীর উপর আই. এন. এর প্রভাবের ফলে ইংরেজ শেষ পর্যন্ত ভারতকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হ'ল। কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করেছে এ কথা বললে শুধু সত্যের অপলাপ নয় ইতিহাসকেও অস্বীকার করা হবে।

কিন্তু স্বাধীনতা দেবে কার হাতে? ১৯৪৫ সনের ২১শে আগষ্ট ইংলণ্ডের সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ভারতকে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়া হবে আর তার জন্যে ভোট নির্বাচন শীতকালের মধ্যে শেষ করতে হবে। লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতের বড়লাট—তাঁকে পরামর্শের জন্যে দেশে ডেকে পাঠানোর ফলে ১৯৪৫ সনের ২৪ আগষ্ট তিনি গেলেন লণ্ডন। ১৬ই সেপ্টেম্বর আলোচনা শেষ করে ফিরে এসে তিন দিন পরে করলেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ঘোষণা। বললেন নির্বাচনের পর প্রাদেশিক শাসনসভার সদস্যদের মত নিয়ে যত সত্বর সম্ভব গঠন করা হবে সংবিধান রচনা সংসদ আর প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হবে যে ভারতবাসীরা ১৯৪২ সনের প্রস্তাব বা কোন সংশোধনী প্রস্তাবে সম্মত কিনা। সেই দিনই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি ভারতের বিভিন্ন দলের ঐক্য কামনা করে দিলেন এক বেতার ভাষণ।

ভোট নির্বাচনের আগে হিন্দু ও মুসলমান দুই দলই সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাজেই তাদের বাদ দিয়েই অধিকাংশ মুসলমানই যোগ দিল মুসলীম লীগে। লীগ প্রচার চালাল যে পাকিস্তান

তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ১৯৪৫ সনের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব মত প্রচার চালাল যে স্বাধীনতা অর্জনই কংগ্রেসের কাম্য আর সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতারা লীগনেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সরাসরি মুসলমান জনসমাজকে তাঁদের দলে আনবেন বলে স্থির করলেন।

তখন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়। ১৯৪২ সনের পর তাদের সংগঠনের কাঠামো গেছে ভেঙ্গে। এ শোচনীয় দুর্দিনে ইংরেজের অবিমৃষ্যকারিতার সুযোগ পেয়ে গেল কংগ্রেস। ১৯৪৫ সনের মে মাস থেকে অক্টোবরের মধ্যে রেঙ্গুন থেকে দশ হাজারের বেশী বন্দী সৈন্যকে ভারতে আনা হ'ল। আই. এন. এর যে সমস্ত সৈন্য ধরা পড়েছিল ও যারা আত্মসমর্পন করেছিল তাদের সঙ্গে বিচারের জন্যে সেপ্টেম্বর মাসে মালয় ও ব্যাংকক থেকে আরও প্রায় ৭০০০ সৈন্য আনবার কথা উঠল। এদের সকলকে এনে বিচারের বন্দোবস্ত করতে ১৯৪৬ সনের মার্চমাস পর্যন্ত সময় লেগে গেল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সব সৈন্যেরা ধরা পড়ে নি, কিছু আত্মগোপন করে রয়ে গেল। যুদ্ধে অসীম দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কথা ভারতের মাটিতে ব্যাপক ভাবে আসবার ফলে তাদের কেন্দ্র করে শুধু গণদাবিই দেখা দিল না ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও হয়ে উঠল তাদের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল।

আই. এন. এর বিরুদ্ধে রাজার প্রতি বিদ্রোহ ও নির্দয়তার অভিযোগ এনে সরকার বলল যে যে সমস্ত সৈন্য চাপে পড়ে, বিপথে চালিত হয়ে শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হবে। যারা দলের নেতা ও যাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আছে তাদেরই সামরিক আদালতে সোপর্দ করা হবে। কংগ্রেস প্রথমে এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি কিন্তু আসন্ন ভোট যুদ্ধের অনিশ্চয় ফলাফলের আশঙ্কায় ও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সারা ভারতের অগণিত জনগণের মনোভাবের অবস্থা দেখে নেতাদের

হ'ল চৈতন্যোদয়। তাঁরা বুঝলেন যে কংগ্রেস এই জনমতকে উপেক্ষা করলে আর কোনদিনই তার সংহতি রক্ষে করতে পারবে না। তাই যে পণ্ডিত নেহরু অহিংস নীতির পাণ্ডা হয়ে বলেছিলেন যে 'সুভাষ এলে আমি তাঁকে গুলি করে মারব' তিনিও দায়ে পড়ে এদের সমর্থন করে বললেন যে "এই সমস্ত সৈনিক দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।" অহিফেনসেবীদের তন্দ্রা তখন গেছে ভেঙ্গে তাদের বাস্তবের সঙ্গে সেদিন মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। তাই ইংরেজ শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রধান সেনাপতির অনুরোধে পরীক্ষামূলকভাবে তিনজন অফিসার—একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন শিখের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত করল।

কংগ্রেস এ সুযোগে এবং আসন্ন নির্বাচনের সাফল্য কামনায় ভারতের তদানীন্তন একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী শ্রীবুলাভাই দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি ডিফেন্স কমিটি গড়ে তুলল। প্রাক্তন সেনানায়ক শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন হলেন এ মামলার আসামী। আসামী পক্ষে ছিলেন সতেরজন কৌন্সূলী। আজও মনে পড়ে ১৯৪২ সনের ১৩ই এপ্রিল পণ্ডিত নেহরু কলকাতায় বলেছিলেন যে 'সুভাষ আমার পুরাণো বন্ধু কিন্তু তাঁর পথ ভ্রান্ত, আমি তার বিরোধিতা না করে পারি না।' কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে বলেছিল 'পঞ্চমবাহিনীর লোক'। সর্দার প্যাটেল আদেশ দিয়েছিলেন 'সৈন্য ব্যারাক থেকে সুভাষের ছবি সরাতে হবে।' পণ্ডিত নেহরু গোপনে এঁদের কার্যকলাপের ও বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেও (১) রাইফেল হাতে নিয়ে গুলি করার পরিবর্তে লোকদেখানো গাউন গায়ে ডিফেন্স কমিটির মধ্যে বসলেন। ৫ই নভেম্বর দিল্লীর লালকেল্লায় বিচার আরম্ভ হ'য়ে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনানি চলল। আসামী পক্ষ থেকে বিচারের প্রক্রিয়ার সম্পর্কে সরাসরি তোলা হ'ল আইনের প্রশ্ন। শ্রীবুলাভাই দেশাই ওজস্বিনী ভাষায় আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করে

1. Mosley—p. 137

বললেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযথ ভাবে গঠিত ও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত সরকারের সামরিক বাহিনী। আর প্রাণদণ্ড অপরাধের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। আসামী পক্ষের জেরায় সরকার পক্ষের একজন সাক্ষী স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলে বসল যে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা হয়েছে।

এই অপ্রীতিকর বিচারের বিবরণ শোনবার জন্যে দেশের লোকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। সমস্ত দেশ যেন উথলে উঠল আবেগে। শ্রীবুলাভাই দেশাই বললেন "এ বিচারশালায় আমরা প্রমাণ করছি আজাদ হিন্দ ফৌজের মান, মর্য্যাদা, বিধি বিধান ও পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবার নিরঙ্কুশ অধিকার।" এমন কি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচারের কথা মনে পড়িয়ে দেওয়া হ'ল। সেদিন সত্যিই ছিল ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে ভারতের শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাশক্তির লড়াই। সেদিনগুলি আজও অবিস্মরণীয়।

বিচারে তিন জনেরই বরখাস্তের হুকুম হ'ল। আর হ'ল যাবজ্জীবন কারাগারের দণ্ড। কিন্তু ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক ১৯৪৫ সনের ২৬শে নভেম্বর বড়লাটকে লিখলেন

"...I am not in doubt myself that a great number of them (I. N. A.) especially the leaders, believed that Subhas Chandra Bose was a genuine patriot and that they themselves were right to follow his lead. There is no doubt at all from the mass of evidence we have that Subhas Chandra Bose acquired a tremendous influence over them and that his personality must have been an exceedingly strong one."

এ লিখেও তিনি থামেননি। ১৯৪৬ সনের ২২শে জানুয়ারী বললেন

"...I know from my long experience of Indian troops how hard it is even for the best and most sympathetic British officer to gauge the inner feelings of the Indian soldier, and history supports me in this view. I do not think any senior British Officer to-day knows what is the real feeling among Indian rank regarding the I. N. A. I myself feel, from my own instinct largely, but also from the information I have had from various sources, that there is a growing feeling of sympathy for the I. N. A.... It is impossible to apply our standards of ethics to this problem or to shape our policy as we would, had the I. N. A. been men of our own race." (১) তিনি বললেন সুভাষচন্দ্র বসুর অসাধারণ নেতৃত্বে আই. এন. এ. পরিচালিত হয়েছে, দেশপ্রীতি তাদের অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তিনি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মকুব করে দিলেন। ভারতবর্ষে এইটেই হয়ে দাঁড়াল কংগ্রেসের পক্ষে মোক্ষম রাজনৈতিক অস্ত্র আর এ অস্ত্র কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে দিল।

আজও মনে পড়ে এ বিচার আরম্ভ হবার আগে নভেম্বর মাসে কলকাতায় এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন—১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আব্দুল রসিদের মুক্তি প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন। সে আন্দোলন গান্ধীজির হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আহ্বানে নয়, মিঃ জিন্নার

1. Jayasree, Chaitra, 1371 B. S.

সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গারের বিরুদ্ধেও নয়, স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণার দাবিতে বাংলার তরুণেরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসিমুখে পুলিশের নির্মম গুলি বুক পেতে নিয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না যে আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষে 'ইংরেজ শাসন অবসান ঘনিয়ে তুলল যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য বিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে নয়, বজ্রনির্ঘোষে ভেঙ্গে যাওয়ার ভেতর দিয়ে।' শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের ভাষায় "দিল্লীর রাজপথে গান গেয়ে বীর বিক্রমে পা ফেলে চলেছে ভারতীয় ফৌজ, তার বিস্ময়কর চমকের সঙ্গে সুভাষের অকস্মাৎ মহামহিমান্বিত মূর্তি মিলে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে যেন ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল। এতদিন নিজের চারিদিকে ভারতীয় ফৌজ যে প্রাচীর তুলে রেখেছিল, অচিরে স্বাধীনতা-লাভের দাবিতে জনসাধারণের উৎসাহের জোয়ারে সে প্রাচীর বহুলাংশে ধ্বসে পড়ল।"

এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ সরকার করল নতুন প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত। ৪ঠা ডিসেম্বর হাউস অফ্ লর্ডসে ভারতসচিব ঘোষণা করলেন যে একটি পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন শীঘ্রই ভারতে পাঠানো হবে। তাঁরা দেশের নেতা ও বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মনোভাব বুঝবেন এবং যাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হিসেবে ভারত তার পূর্ণ অধিকার পায় তার ব্যবস্থা করবেন।

১৯৪৬ সনের ৫ই জানুয়ারী প্রফেসার রবার্ট রিচার্ডের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের দশজন সদস্য ভারতে এসে পৌঁছুলেন। এঁরা প্রায় একমাস এখানে থেকে দেখা করলেন অনেকের সঙ্গে। মিঃ জিন্না পাকিস্তানের দাবি তুলে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে পাকিস্তান ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাঁবেদার হয়েই থাকবে।

ইতিমধ্যে নির্বাচনের ফলে দেখা গেল কংগ্রেস আশাতীত ভাবে

জয়লাভ করছে। কংগ্রেস অমুসলমান কেন্দ্রে শতকরা ৯১'৩ ভোট পেয়েছে আর লাগ পেয়েছে মুসলিম প্রধান অঞ্চলে শতকরা ৮৬'৬ ভোট। কেন্দ্রে কংগ্রেস ৫৭টি, লীগ ৩০টি, নির্দলীয় ৫টি, আকালি শিখ ২ ও ইউরোপীয়ান ৮টি আসন পেয়েছে আর প্রদেশে কেবলমাত্র বাংলা ও সিন্ধুতে হয়েছে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

১৯৪৬ সনের ২৮শে জানুয়ারী বড়লাট ঘোষণা করলেন যে তিনি নতুন কর্মসংসদ স্থির করবেন আর খুব শীঘ্র গড়ে তুলবেন একটি সংবিধান রচনাকারী পরিষদ। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই একজন ব্রিটিশ অফিসার জনৈক ভারতীয় বৈমানিককে অপমান করার ফলে বিমান বাহিনীর সৈন্যদের এক অংশ ধর্মঘট করে বসলেন বোম্বাইয়ে। তাঁদের দাবী বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ ও ব্রিটিশ বৈমানিকগণের সঙ্গে কাজের ও বেতনের সমানাধিকার। প্রায় ১৫০০ জনের বেশী যুগ-সচেতন বৈমানিক যোগ দিলেন এ ধর্মঘটে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর সৈন্যদের ও ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সভ্যদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য থাকায় দিন দিন ঘনিয়ে উঠছিল নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্যের অসন্তোষ। শুধু অন্ন বস্ত্রের হীনতা নয়, দেশীয় সৈন্যদের তরফে সম্মানের লাঘব এত বেশী, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্রায় যে আইনের পক্ষেও অপক্ষপাত বাঁচিয়ে চলা অসাধ্য। অবস্থার এ বেদনাময় অসংগতি সেদিন সত্যিই অনতিক্রমনীয়। তাঁরা তাঁদের অসুবিধের কথা কর্তাদের জানাতে নির্মম বিদ্রুপরায়ণ বক্র বাক্‌চাতুর্যে উত্তর এল 'ভিখিরীর কোন অধিকার নেই।' সেদিন একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ অন্য দিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীর। তখন ভারতের অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের মত। শাসন কর্তাদের জীবনযাত্রা শাসিতের চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য আর প্রভুত্বের অহংকারে, শক্তিমান শাসন শক্তিতে তাদের অন্তঃকরণ নির্মম। কাজেই বিদ্রোহের আগুন

জ্বলে উঠল অনিবার্যরূপে, আত্মপ্রকাশ করল ভারতের ক্ষয়শীল জীবনপ্রবাহের আত্মমুক্তির প্রতিধ্বনি।

প্রথম বন্দী হলেন রেডিও অপারেটর শ্রীদত্ত, তাঁকে কম্যুনিস্ট সন্দেহে বন্দী করা হ'ল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত ব্যারাকের সৈন্যেরা করে বসল ধর্মঘট। রাজকীয় নৌবহরের একটি অংশ বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই সহরে বেধে গেল গোলমাল। বিদ্রোহীরা কয়েকখানা জাহাজ দখল করে তাতে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট ও লীগের পতাকা দিলেন উড়িয়ে। (১) অ্যাড্‌মিরেল গডফ্রে বললেন তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু কোন ফল হ'ল না। ব্রিটিশ অফিসার মিঃ রথরয় এলেন তাঁদের কি দাবী জানবার জন্যে। তাঁরা উত্তর দিলেন বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, ব্রিটিশ অফিসারের পরিবর্তে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ, ভাল আহার্য, ব্রিটিশ সৈন্যদের সমতুল্য সুযোগ সুবিধা, রাজবন্দীদের মুক্তি, আই. এন. এর বন্দীদের মুক্তি আর ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা। তিনি আশা দিলেন কতকটা 'দেউলে হওয়া বর্তমানে সাবেক কালের চেকের মত।' সেইদিনই 'কামিলা' জাহাজ থেকে বন্দী করা হ'ল ৩০০ জনকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সৈন্যধ্যক্ষ করলেন ব্যারাক অবরোধ। ২১শে ফেব্রুয়ারী একজন নৌ-সৈন্যকে ব্যারাক থেকে বেরুবার সময় গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দু'পক্ষেরই মুহুর্মুহু গুলি বিনিময়ের মাধ্যমে চলল জীবন মরণের মঙ্গলোৎসব। 'সিন্ধ্' জাহাজে চারজন নৌ সৈন্য প্রাণ দেবার ফলে মীমাংসা না হয়ে সংগ্রাম রইল অব্যাহত। (২)

অন্য অন্য বন্দরেও এ সংবাদ পড়ল ছড়িয়ে। থানার কাছে 'আকবর' জাহাজে ও ক্রমে ক্রমে করাচি, কলকাতা, বিশাখাপত্তম ও অন্যান্য বন্দরেও আরম্ভ হয়ে গেল ধর্মঘট। ২১শে ফেব্রুয়ারী রাজকীয়

(1) V.V. Balabushevich—A Contemporary History of India p 410—11
(2) Ibid.

নৌবহরের সমস্ত সৈন্য যোগ দিলেন আন্দোলনে। ২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের কল কারখানার শ্রমিকেরা সহানুভূতি দেখিয়ে করল ধর্মঘট। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মিঃ ডাঙ্গে কামগড় ময়দানে বিরাট সভার আয়োজন করলেন। পুলিশ শান্ত ধর্মঘটিদের উপর গুলি চালিয়ে দিল—ফলে তু' পক্ষেরই বেধে গেল সংগ্রাম। এ বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্যেরা অস্বীকার করে বসল তুর্লঙ্ঘনীয় আত্মপ্রশ্নে। বোম্বাই সহরে ব্যাঙ্ক, দোকান, পোষ্ট অফিস থানা ইত্যাদিতে অগ্নি সংযোগের অজুহাতে পুলিশ ও সৈন্যের হাতে প্রাণ দিল প্রায় তু'শো লোক। করাচি, মাদ্রাজ ও কলকাতায় অনুরূপ ঘটনা ঘটায় সৈন্য ও বিমান বাহিনীর অনেকেই স্থির থাকলেন না। মানুষ চিরদিনই নির্ভর করে ক্ষাত্র শক্তির উপর। সংগ্রামশীলতা মানবিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানুষের ধর্ম, সৃষ্টির গোড়ার কথা—তা কোন রকমে ভোলবার উপায় নেই—উচিতও নয়। শেষ পর্যন্ত বল্লভ ভাই প্যাটেলের অনুরোধের উত্তরে তাঁরা জানালেন যে সর্বনাশকে তাঁদের ভয় নেই—ভয় অসম্মানকে। তবুও সর্দারজীর কথায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলেন কিন্তু সর্দার প্যাটেল তাঁদের অসঙ্গত বিচার ও অহেতুক দণ্ড বন্ধ করতে পারলেন না। ইংরেজ বুঝল তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। বিকৃত রাজনৈতিক রুচির অন্তস্তলে শহীদদের আত্মা সারা ভারতে উন্মাদের মত প্রতিহিংসার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হয়েছিল নৌ বিদ্রোহ। ১৯শে ফেব্রুয়ারী হাউস অফ লর্ডসে লর্ড পেথিক লরেন্স ও হাউস অফ কমন্‌সে প্রধান মন্ত্রি মিঃ এটেলী বললেন যে দেশের একান্ত প্রয়োজনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্যাবিনেট মিশন নামে একটি বিশেষ মিশন পাঠাবেন; তাতে থাকবেন তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রি। তাঁরা ভারতের বড়লাট ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত করবেন সে অনুসারে কাজ হবে। এ মিশনে ছিলেন ভারত সচিব স্যার পেথিক

লরেন্স, বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতি স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ আর ফার্ষ্ট লর্ড অফ এডমিরেলটি মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার।

১৯৪৬ সনের ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন নিউ দিল্লী পৌঁছুলেন। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ৩রা এপ্রিল তাঁদের কাছে কংগ্রেসের বক্তব্য পেশ করে বললেন 'ভবিষ্যৎ সংবিধান, একটি সংবিধানরচনাকারী সংসদ রচনা করবেন ও অন্তবর্তীকালের জন্য কেন্দ্রে মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। নির্বাচন শেষ হলে প্রাদেশিক আইন সভার মত বোঝা যাবে। মধ্যবর্তীকালীন সরকারে থাকবেন পনর জন সদস্য তার মধ্যে এগার জন আসবেন প্রাদেশিক আইন সভা থেকে, আর চারজন তফ্সিলী সম্প্রদায় থেকে ; তাঁরা প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নাও হতে পারেন। ভবিষ্যৎ সরকার যুক্ত গভর্ণমেণ্টের (ফেডারেশন) মত হবে। তার মধ্যে থাকবে প্রতিরক্ষা, সংবাদ সরবরাহ ও বৈদেশিক নীতি। আর বাকি ক্ষমতা থাকবে স্বায়ত্ব শাসনযুক্ত প্রাদেশিক সরকারের উপর। কতকগুলি বিষয় থাকবে স্বেচ্ছামূলক বিষয় হিসেবে। সংবিধান রচনা হলে প্রদেশকে যে কোন একটি বিষয় বেছে নিতে হবে— হয় সংবিধানের বাইরে থাকা, না হয় সংবিধানের মধ্যে যুক্ত সরকার হিসেবে কিছু বাধ্যতামূলক ও কিছু স্বেচ্ছামূলক বিষয় নিয়ে থাকা।'

মোট কথা আলোচনার মাধ্যমে মৌলানা আজাদ স্বীকার করলেন যে এ ব্যাপারে মুসলমানেরা দু'টো কি তিনটের বেশী ভোট পাবে না। কিন্তু তাদের বেশী আসন দেবার চেষ্টা করা হবে। প্রাদেশিক আইন পরিষদ, সংবিধান রচনাকারী পরিষদকে একটি যুক্ত কালেজের ভোটিংএর মাধ্যমে নির্বাচন করতে পারবে। (১)

তারপরই ক্যাবিনেট মিশন দেখা করলেন গান্ধীজির সঙ্গে। গান্ধীজি মিঃ জিন্নার দু'জাতি তত্বের নিন্দে করে বললেন যে

(1) V.P. Menon—Transfer of power in India p 237—38

মুসলমানেরা সকলেই ভারতীয় মুসলমানদের বংশধর। আরও বললেন অন্তবর্তী কালে মিঃ জিন্নাকে নিজ মনোমত মন্ত্রি নিয়ে সরকার গঠন করতে বলা হোক্। তিনি না পারলে বা অস্বীকার করলে কংগ্রেস নেতারা সরকার গঠন করবেন।

মিঃ জিন্না পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। বললেন হিন্দু ও মুসলমানের জীবন যাত্রার ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সামাজিক আচার ব্যবহারেও মিল নেই তাদের। "হাজার বছর ধরে একই দেশে বাস করেও তারা এক পাড়ায় বসবাস করে না। সাধারণের একত্ব বোধ না থাকলে নেশন বলে গণ্য হতে পারে না। কেমন করে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই দুই সর্বপ্রকারে বিভিন্ন জাতকে একত্র করবে? কোন লৌহকাঠামো ছাড়া তাও সম্ভব নয়। এতদিন ইংরেজ ছিল লৌহকাঠামোর মত। স্বাধীন ভারতে তা একেবারে অসম্ভব। কাজেই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পৃথক অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন। তবে কতকগুলে বিষয়ে পরস্পরের সম্মতি চলবে কিন্তু তার আগে পাকিস্তানের দাবি পাকাপাকি ভাবে মেনে নিতে হবে। কংগ্রেস কোনদিনই দু'জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়।" মিঃ জিন্না ভুলে গেলেন যে পাকিস্তান হলেও তার মধ্যে বহু হিন্দু বাস করবে আর হিন্দু-স্থানের ভেতর বহু মুসলমান বাস করবে। কাজেই বিভিন্ন জীবন যাত্রার যুক্তি অচল। কিন্তু এ কথা চিন্তা করবার মিঃ জিন্নার সেদিন সময় ছিল না। হয়ত মনে মনে পৃথিবী ব্যাপী মুসলিম রাজত্বের কল্পনায় তিনি ভাবছিলেন ভারতবর্ষ থেকে অর্ধচন্দ্রশিখরী তুরস্কের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত তাঁর করায়ত্ব পরিধি।

তফসিলী সম্প্রদায় ও শিখদের স্বার্থরক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে তফসিলী নেতা ডাঃ আম্বেদকর বললেন যে সংবিধান সভা হলে তাতে বর্ণ হিন্দুরই প্রাধান্য থাকবে। ডাঃ আম্বেদকর অনুন্নত তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা—তাঁর দাবি ছিল যে

তাঁর সম্প্রদায় ভারতের জন সংখ্যার এক সপ্তমাংশ। বর্ণ হিন্দুর জন্যে তারা সামাজিক ও ধর্মীয় নানা বিধি নিষেধে জর্জরিত।

ডাঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ছিলেন দরিদ্র সন্তান কিন্তু খুবই মেধাবী। বরোদার মহারাজার অনুগ্রহে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন ও বিদেশেও লেখাপড়া করার সুযোগ পান। তিনি জীবনে বর্ণ হিন্দুর হাতে অনাদৃত অন্ত্যজের মত বহুবার নিগৃহীত হয়েছিলেন। ইংরেজ একদিন তফসিলীদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লাগাবার জন্যে তাঁকে মিঃ জিন্নার মতই সাহায্য করেছিলেন। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে তিনি আমন্ত্রিত হন। কংগ্রেস প্রথম প্রথম তাঁকে কোন প্রাধান্য দেয় নি, পরে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কাজেই গান্ধীজিকে আবার অনশন করতে হ'ল অস্পৃশ্যতার মালিন্য বর্জনের অজুহাতে, আসলে কিন্তু স্বার্থের প্রবর্তনায়—কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে। (১)

শিখনেতা গিয়ানী কর্তার সিং শিখদের জন্যে পৃথক স্থান দাবি করলেন। আলোচনা চলার সময় মিঃ জিন্না প্রাদেশিক আইন সভার সমস্ত মুসলমানদের দিল্লীতে এক সম্মেলনে আহ্বান জানিয়ে দু'টি প্রদেশে পাকিস্তান কায়েম করবার প্রস্তাব পাশ করালেন। জানালেন যে তাদের দাবি না মেটালে তারা অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবে না এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সব রকমে বাধা দেবে। ১৯৪২ সনের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় ইংরেজের অনুরোধ সত্ত্বেও লীগ কংগ্রেসের সে আন্দোলনের বিরোধিতা করে নি। চৌধুরী খালিকুজ্জমানকে যুক্ত প্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারল অফ পুলিশ বলেছিলেন যে মুসলমানরা নির্বিচারে হিন্দুদের নিধন, গৃহদাহ ও সর্বস্ব লুট করলেও আইনের আওতায় আসবে না। (২) সেদিন তারা কংগ্রেসকে বাধা দেয় নি এখন কিন্তু সব রকমে বাধা দেবে। (৩)

(1) Mosley p 59 (2) Khaliquzzaman p 286 (3) Menon p 246-47

ক্যাবিনেট মিশন একটা মীমাংসার জন্যে মিঃ জিন্নাকে ছু'টি বিকল্প প্রস্তাব দিলেন। প্রথম, হয় পাকিস্তান স্বাধীন রাজ্য হবে তবে তার মধ্যে যে সমস্ত জেলা অমুসলমান প্রধান সেগুলি পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আসবে না; আর না হয় মিঃ জিন্না যে যে জায়গা পাকিস্তান হিসাবে দাবী করছেন সেগুলি পাকিস্তান হবে তবে ভারতের যুক্ত-রাজ্যের অংশ বিশেষ বলে গণ্য হবে। (১) মিঃ জিন্না কোনটাতেই রাজী হলেন না। কয়েকদিন পরে মিশন ৫ই মে সিমলায় কন্‌ফারেন্স ডাকলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হ'ল না।

১৯৪৬ সনের ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশন নিজেদের প্রস্তাব বা প্ল্যান দিলেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও তাতে সম্মতি ছিল। তাঁরা বললেন অবিলম্বে একটি মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠন করে তাঁদের উপর দেশের শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হবে এবং তাঁরাই ভবিষ্যত সংবিধান রচনা করবেন। সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালীন সরকার দেশের শাসন পরিচালনা করবেন। বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করলে ছুই প্রদেশের বহু লোকের যথেষ্ট স্বার্থহানি হবে। মিঃ জিন্নার দাবিমত পাঞ্জাব ভাগ হলে তার ছু'অংশের শিখদের স্বার্থ জড়িয়ে পড়বে, কাজেই বড় বা ছোট কোন রকমের পাকিস্তান দিয়েও সমস্যার সমাধান হবে না। তাছাড়া পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা অবিভক্ত ভারতের ভিত্তিতেই হয়েছে তাদের বিচ্ছিন্ন করা দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। সংযুক্ত প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যবস্থা দেশের নিরপত্তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ভারতের সৈন্যদলকে ছু'ভাগে ভাগ করলে তার ফল খুবই বিষময় হবে। ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষে করবার শক্তি বিভক্ত সৈন্যদের থাকবে না। তারপর দেশীয় রাজ্যগুলি দোটানায় পড়ে যাবে। মিঃ জিন্নার প্রস্তাব মত ছু'জায়গায়

(1) Mazumdar III p 578

পাকিস্তান হ'লে মাঝে দুস্তর ব্যবধান থাকবে এবং পরস্পরের চুক্তি না থাকলে যাতায়াতের সুবিধে হবে না। কাজেই মিঃ জিন্নার দাবি অচল।

তাঁরা বললেন কংগ্রেসের প্রস্তাব মত প্রদেশগুলির স্বায়ত্ব-শাসনের পূর্ণ অধিকার আর দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কাজেই তাঁরা শেষ সিদ্ধান্ত করে একটি প্ল্যান দিলেন। তার ১৫ অনুচ্ছেদে মোটামুটি বললেন যে সমস্ত ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে ভারতযুক্তরাজ্য গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বৈদেশিক পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। ঐ ব্যাপারে তাদের রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রে থাকবে একটি কার্যনির্বাহক ও একটি ব্যবস্থাপক সভা। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য থেকে নির্বাচিত হবে তাদের প্রতিনিধি। গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নগুলি ভোটাধিক্যে বিবেচিত হবে। অন্যান্য সমস্ত বিষয় প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের অধীনে থাকবে। শুধু ১৫(৫) অনুচ্ছেদে বললেন যে প্রদেশগুলি কার্যনির্বাহক ও ব্যবস্থাপক সভার সঙ্গে ইচ্ছেমত জোট বাঁধতে পারবে এবং সেই জোট কোন্ কোন্ প্রধান বিষয় ঐক্যভাবে গ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করতে পারবে। (১)

তাঁরা আরও বললেন যে গত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসন পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাজেই জন-সংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা স্থির হবে—সম্ভবতঃ প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্যে একটি আসন হলে ভাল হয়। জনসংখ্যা অনুপাতে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আসন হবে তার হিসেব দিয়ে বললেন যে সংবিধান সভায় দেশীয় রাজ্যেরও প্রতিনিধি নেওয়া হবে। দিল্লীতে একটি প্রাথমিক সভা আহ্বান করে এবিষয়ে আলোচনা হবে। তাঁরা

(1) 15(5) Provinces should be free to form Groups with Executives and Legislatures and each Group could determine the principal subject to be taken in common.

১৯(৭) অনুচ্ছেদে বললেন "১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন বিষয়ে বা প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়ের কোন রদবদল করতে হলে ভারতের যুক্ত-রাষ্ট্রের গণপরিষদে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের উপস্থিত সভ্যদের ভোটাধিক্যের উপর তা করা চলবে। দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য হলে গণপরিষদের সভাপতি প্রয়োজন বোধে তা' ফেডারেল আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে মীমাংসা করতে পারবেন। (১)

সেদিন কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এমন কারুর দেখা পাওয়া গেল না যিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্যাবিনেট মিশন যে যুক্তি দিয়েছিলেন তার চেয়ে ভালো বা জোরালো কোন যুক্তি দিতে পারেন। তখন দেশে সত্যিই নেতৃত্বের অভাব। দেশের সেই দুর্দিনে গান্ধীজি বাদে সত্যিকারের নেতা বলতে এক শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও দ্বিতীয় শ্রীসাভারকর বাদে আর কেউ ছিলেন না—শ্রীসুভাষ চন্দ্র তখন ভারতের বাইরে আর শ্রীসাভারকর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের লোক বলে অনেকে তাঁকে আমল দেয় নি। কংগ্রেস বা লীগের সে প্ল্যান সরাসরি অগ্রাহ্য করবার কোন যুক্তি সেদিন ছিল না। তাই দু'দলই প্ল্যানের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্ল্যানের ১৫(৫) অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা করলেন তার অসারতা দেখিয়ে দিলেন ক্যাবিনেট মিশন সদস্যেরা। তাঁরা বললেন ১৫(৪) অনুচ্ছেদের সঙ্গে একত্র দেখলে কোনই অসুবিধে হবে না। (২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনস্ এর প্রতিষ্ঠা। সে প্রতিষ্ঠা হয়তো 'রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকাযুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শান্তি বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা। সেখানেও হয়তো অনুরূপ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্যোগ।

---

(1) Vide clause 19 (VII)

(2) 15(4) The states will retain all subjects and powers other than those ceded to the union.

কয়েকদিনের মধ্যে গান্ধীজির অনুরোধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন—পণ্ডিত নেহরু হলেন সভাপতি। শিখেরা প্রথম থেকেই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ভাল চোখে দেখে নি। তাদের আশঙ্কা ছিল যে পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাদের নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। শিখনেতারা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই মনস্থ করলেন। ক্যাবিনেট মিশন তখন দুই সম্প্রদায়কে তুষ্ট করবার জন্যে বললেন যে প্রদেশগুলি ইচ্ছেমত জোট বা দলবদ্ধ হতে পারবে। প্রতি দশ বছর অন্তর তারা আবার এ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। কাজেই অবিলম্বে একটি মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রয়োজন। কংগ্রেস ও লীগ মধ্যবর্তী সরকার গঠন কাজে মনোনিবেশ করল।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারত বিভাগের পক্ষপাতী না হলেও মিঃ জিন্নার প্রস্তাব মত বললেন যে মধ্যবর্তীকালীন সরকারে বারজন সদস্য থাকবেন, কংগ্রেস ৫, লীগ ৫, শিখ ১, দেশী খৃষ্টান ১। এ সংখ্যানুপাতের কোন নৈতিক বা আদর্শগত কারণ ছিল না। সে কারণে কংগ্রেসের পক্ষে পণ্ডিত নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে আসন অনুপাতের কোন যুক্তি বা সামঞ্জস্য নেই। তিনি বললেন কংগ্রেস হিন্দু ৫, লীগ মুসলমান ৪, অ-লীগ মুসলমান ১, অ-কংগ্রেস হিন্দু ১, কংগ্রেস তফসিলী ১, দেশীয় খৃষ্টান ১, শিখ ১, কংগ্রেস নারী ১ মোট ১৫। বড়লাট অসম্মতি জানালেন।

১৯৪৬ সনের ১৬ই জুন লর্ড ওয়াভেল চোদ্দজনের নাম ঘোষণা করে বললেন যে এই চোদ্দজন মধ্যবর্তীকালীন সরকারে থাকবেন—তারমধ্যে অবশ্য পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ জিন্নার নাম ছিল। দেখা গেল সেখানে ১জন তফসিলী সমেত কংগ্রেস ৬, লীগ ৫, শিখ ১, খৃষ্টান ১ ও পার্শী ১। এ প্রস্তাবেরও পেছনে কোন যুক্তি নেই। শিখরা সে প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে বললেন লোক সংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নি—বড়লাটের নিজের খেয়াল খুসীমত নাম

ঘোষণার যদি অধিকার থাকে তাদেরও তাতে সম্মত না হবার অধিকার আছে। কংগ্রেসের মতই বড়লাট লীগের তোষণ নীতি তখন চালিয়েছেন।

লর্ড ওয়াভেল জন সংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নি বা তাঁর এ প্রস্তাবের পেছনে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই জেনেও মিঃ জিন্নাকে ডেকে বললেন যে সদস্যের এই অনুপাত কংগ্রেস ও লীগের সম্মতি ছাড়া রদ বদল হবে না আর দু'পক্ষ বিরোধিতা করলে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নেরও সমাধান হবে না। বড় লাটের এ ভাবে মিঃ জিন্নাকে আশ্বাস দেবার কোন যুক্তি ছিল না বরং কংগ্রেসকে প্রকাশ্য অপমান করবার জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা করলেন। এমন কি বড়লাটের কোন পরামর্শ দাতা বলেছিলেন যে "ভাল করে ভেবে চিন্তে না দেখে বড়লাটের এ কথা বলা উচিত হয় নি। বড়লাট নিজের ইচ্ছেয় এ কাজ করে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবও অকেজো করলেন আর নিজেরও আখের নষ্ট করলেন।" শুধু তাই নয়—কংগ্রেস ও লীগের অসন্তোষও বাড়িয়ে তুললেন। বড়লাটের সঙ্গে মিঃ জিন্নার যে সমস্ত পত্রাদি আদান প্রদান হয়েছিল তা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হ'ল। বড়লাটের মুসলিম প্রাতির অযৌক্তিক নিদর্শনের লিখিত প্রমাণ পেয়ে ২৫শে জুন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলেন। তাঁদের এ প্রস্তাবে ভারতবাসীর অধিকাংশেরই সমর্থন ছিল। তবে তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে প্রস্তাবিত সংবিধান সভায় যোগ দিয়ে তাঁরা অখণ্ড স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করবেন।

কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন মিঃ জিন্নাকে বললেন যে ১৬ই জুনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল কিন্তু দুপক্ষই যখন ১৫ই মের প্ল্যান মেনে নিয়েছে তখন কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট যত সত্বর সম্ভব দু'পক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হোক্। ১৯৪৬
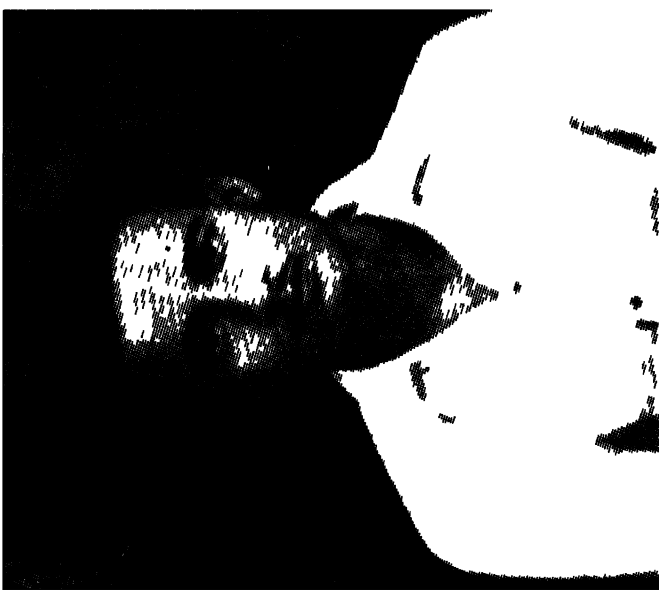
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
(পৃঃ ১৩৭)

শ্রীসত্যেন বর্ধন
(পৃঃ ১০৭)

সনের ২৯শে জুন ক্যাবিনেট মিশন ভারত ছাড়লেন। তখন কিন্তু সকলেরই ধারণা হয়েছে যে ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবেই এবং এ দেশ যাতে কম্যুনিষ্ট দেশের অন্যতম না হয় তার জন্যে তারা চেষ্টা করবে।

১৯৪৬ সনের ৬ই জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণযোগ্য বলে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কেবল কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল বিরোধিতা করল। কংগ্রেসের পক্ষে ২০৫ ভোট ও বিপক্ষে ৫১ ভোটে গৃহীত হ'লো সে প্রস্তাব। ৭ই জুলাই দিল্লীর লাল কেল্লায় নেতাজীর বিশ্বস্ত অনুচর শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র গুহ অত্যাচারের ফলে রোগে প্রাণ দিলেন।

এ সময় কংগ্রেস আস্তে আস্তে তার হৃত গৌরবের কৌলিন্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত। দেশের লোকের আংশিক সমর্থন তাদের সে প্রয়াসকে অনেকখানি সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সকলেরই মনে মনে আশা যে এবার বহুদিনের বঞ্চিত জীবনের পরিবর্তে সুদিনের গৌরব আসন্ন। ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গেলেই আমাদের সমস্যার আমরাই ন্যায় বুদ্ধির অনুশাসনে সমাধান করতে পারব। সেদিনও কংগ্রেস নেতারা ছিলেন ইংরেজের দাক্ষিণ্য ও ঔদার্য্যের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ।

বিস্মরণ অবশ্য মানুষের ধর্ম। সাম্রাজ্য মদমত্ততায় ভারতবাসীর প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসিন্যে ইংরেজের নিষ্পেষণী শাসন-যন্ত্রের চণ্ডনীতি, ঔদ্ধত্যের ছল বল, অপকৌশলের চক্রান্ত, জঘন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানি সবই তাঁরা বেমালুম ভুলে গেলেন।

দশ

যখন সমস্ত সমস্যার সমাধান এক রকম আসন্ন ঠিক সেই সময় ভারতের দুর্ভাগ্য কংগ্রেস সভাপতি এমন একটা মারাত্মক ভুল করে বসলেন যার জন্যে হাজার হাজার নিরপরাধ অসহায় নরনারী শিশুকে প্রাণ হারাতে হ'ল, কত মূল্যবান সম্পত্তি হ'ল নষ্ট—উঠল দেশজোড়া বেদনার হাহাকার। ১৯৩৭ সনে মিঃ জিন্নার কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব পণ্ডিত নেহরু নাচক করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সুদূর-পরাহত করেছিলেন তেমনি এখন এমন একটি বিবৃতি দিলেন যে শুধু দেশের লোক কেন ইংলণ্ডের কর্তারাও বিচলিত হয়ে উঠলেন—কোন রাজনীতিবিদের কাছে কেউ কোনদিন সে জিনিস আশা করে না।

১০ই জুলাই প্রেস কনফারেন্সে তিনি চিরদিনের অভ্যেস মত বক্তৃতা প্রসঙ্গে যা' বললেন তা মোটামুটি এই,—তিনি বললেন "ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান যাই হোক্ না কেন আমরা তা ইচ্ছেমত রূপান্তর করতে পারব। আমরা সংবিধান সভায় গিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করব সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছেমত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদের উপর জোর করে কোন কিছু চাপাতে চায় আমরা তা মানব না। সংখ্যালঘু সমস্যা আমাদের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার—আমরা নিজেরা করে নেবো তার মীমাংসা। বাইরের কোন শক্তির কোন রকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরও না। প্রাদেশিক জোট বা গ্রুপিং এর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আসাম কোন রকম গ্রুপিং মেনে নেবে না। আর ক্ষমতার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে সৈন্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা আর বৈদেশিক নীতি—ফলে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের অধীনে আসতে বাধ্য হবে। বৈদেশিক নীতির অধীনে বৈদেশিক

বাণিজ্য থাকবে কাজেই ইচ্ছেমত করবৃদ্ধি করে অর্থের স্বচ্ছলতা আনতে পারব আর আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাদের মীমাংসার জন্যে কেন্দ্রের কাছে সকলকেই আসতে হবে।"—'ইঙ্গিতের স্ফুলিঙ্গের ভ্রম, ঐক্যের সাধন পথ করিল দুর্গম।'

একথা শুনে সকলে হায় হায় করে উঠলেন। মৌলনা আজাদ বললেন "এ ব্যাপার ইতিহাসের গতিরোধকারী দুঃসহ ঘটনার অন্যতম।" (১) এমন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এ নিয়ে ভীষণ মতভেদ দেখা দিল। সদস্যেরা পড়ে গেলেন উভয় সঙ্কটে—সভাপতির ভাষণ নাকচ করে দিলে কংগ্রেস লোকচক্ষে শক্তিহীন ও আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত বলে প্রকাশ হয়ে পড়বে অথচ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করলে দেশের হবে সর্বনাশ। বাহাদুরির নেশায় দায়িত্ব-বোধ-হীন লঘু কথা দিয়ে সত্যিকারের সংকট কোনদিনই ঠেকানো যায় না। লোকে ভুলে যায়—রাজনীতি হিসেবেও বাক্ সংযমের সার্থকতা আছে। পণ্ডিত নেহেরু যদি প্রেস কনফারেন্সে এ কথা না বলতেন ত ভারতের স্বাধীনতার রূপ আজ অন্য রকম হ'ত। একটি লোকের ভুলের মাশুল দেশকে কি নির্মম ভাবেই না দিতে হয়েছে।

মিঃ জিন্না এক রকম নিরুপায় হয়েই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান স্বীকার করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুর এই উক্তি তাঁর কাছে বোমার আঘাতের মত এল। বেদনার তপ্ত শেলে তাঁর শীর্ণ দেহের উপর দুটো বড় বড় চোখ নিষ্ঠুর বিদ্বেষে আহত শ্বাপদের হিংস্রতায় জ্বল জ্বল করে উঠল। তিনি বললেন "জহরলালের কথায় কংগ্রেসের সত্যিকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস ভবিষ্যতে মুসলমানদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তা আজ স্পষ্ট প্রতীয়মান। কাজেই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নেওয়া নিরর্থক।" ১৮ই জুলাই ভারত সচিব হাউস অফ লর্ডসে আর

(1) Azad—India wins freedom p 154—55

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ হাউস অফ কমন্সে পণ্ডিত নেহরুর কথার তীব্র সমালোচনা করে ও প্রতিবাদ জানিয়ে পরিষ্কার ভাষায় জানালেন যে কংগ্রেস সভাপতির কথা মোটেই সত্য নয়। মিঃ জিন্নাকে জানালেন যে ১৬ই মের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের কোন রকম রদ বদল হবে না। মিঃ জিন্না কংগ্রেসের আসল মনোভাব বুঝে সে কথা কোন মতেই মানতে চাইলেন না।

২৭শে জুলাই মিঃ জিন্না বোম্বাইয়ে আহ্বান করলেন মুসলীম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। ২৯শে জুলাই পাশ করালেন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাব। ধার্য হ'ল ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন। আজও মনে পড়ে মিঃ জিন্নার সে দিনের দম্ভের কথা—"To day we have also forged a pistol and are in a position to use it."

কংগ্রেস তার সাংঘাতিক দুর্বলতা ও মোহাবিষ্ট জড়তায় দীর্ঘ দিন ধরে ও বিশেষ করে গান্ধীজি মানব মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয়ে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছিলেন—কংগ্রেস সভাপতি এক অসতর্ক বিবৃতিতে তা' চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। গান্ধীজির ভাষায় 'তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী' পণ্ডিত নেহরুর একটি ক্ষমাহীন ভুলের জন্যে কতলোক যে প্রাণ হারালো তার ইয়ত্বা নেই। পণ্ডিত নেহরুও এমনি করে পাকিস্তান সৃষ্টির উপক্রমণিকা রচনা করলেন। মিঃ জিন্না বলেছিলেন "আমি কোনদিন আশা করিনি যে পাকিস্তান আমার জীবদ্দশায় হবে।"

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ মশলে বলেছেন "নেহরু বোধ হয় নিজেই বোঝেন নি তিনি কি বলছেন। অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন কোন রাজনীতিবিদের এ রকম কথা বলা মোটেই শোভা পায় না।"

সত্যিই তাই তাঁর এ কথাটা না বললে কলকাতার রাস্তাঘাট হয়ত মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠত না। বড়লাট তার পরেও আর একবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মিঃ জিন্না ৩১শে জুলাই তাঁকে জানালেন

যে তিনি কংগ্রেস সভাপতির এই উক্তির পর মোটেই সম্মত নন। কাজেই ৬ই আগষ্ট বড়লাট পণ্ডিত নেহরুকে মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্যে আহ্বান জানালেন। মিঃ জিন্নার চিঠির উত্তরে বড়লাট তাঁকে লিখলেন যে মুসলিম লীগের ২৯শে জুলাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি স্থির করেছেন যে যখন মুসলিম লীগ সহযোগিতা করল না তখন তিনি কংগ্রেসকেই মন্ত্রিত্ব গঠনের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে কংগ্রেস যদি কোয়ালিশনের জন্যে ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ করে তাহ'লে মিঃ জিন্না তাহাতে সম্মতি দেবেন বলে তিনি আশা রাখেন। ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ওয়ার্দা অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরুকে মধ্যবর্তীকালীন সরকার গঠনের ক্ষমতা দিল। চিরদিন কংগ্রেস মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগকে তোষণ নীতির দ্বারা আয়ত্বে আনতে চেয়ে শুধু বিফলই হয়নি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে তবুও তারা সে ভুল সংশোধন করতে পারল না। পণ্ডিত নেহরু নিজে শিশু রাজনীতিজ্ঞের মত যে মারাত্মক ভুল করলেন সেটা সংশোধনের জন্যে মিঃ জিন্নার মানভঞ্জনের চেষ্টায় তাঁকে পাঁচটি আসন দেবার প্রস্তাব জানালেন। মিঃ জিন্না পণ্ডিত নেহরুকে অপমান করে সে প্রস্তাব নস্যাৎ করলেন অবশ্য বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের মত কারণ দেখালেন যে একজন অ-লীগ মুসলমানকে কংগ্রেসের তরফে নেওয়া হয়েছে।

মুসলিম লীগ কিন্তু তখন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। বাংলার লীগ গভর্ণমেণ্ট ১৬ই আগষ্ট ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে দিল। মুসলমানেরা বের করল বিরাট শোভাযাত্রা কলকাতার রাজপথে। পূর্ব পরিকল্পনামত হঠাৎ সেই দলের লোকেরা হিন্দুদের দোকানপাট লুটতরাজ আরম্ভ করে দিল। বিশ্বাসহীন, চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে আরম্ভ করল তাণ্ডব নৃত্য—চলল পাশবিক অন্ধ বীভৎসতা। চূর্ণ হয়ে গেল মানুষের আত্মীয়তা, চুরমার হয়ে গেল সুন্দরের আসনপীঠ। পিশাচের অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস উঠল

ভ'রে। হিন্দুরা প্রথমটা প্রস্তুত ছিল না। সুরাবর্দী সাহেব তার আগেই সুকৌশলে থানায় থানায় মুসলমান দারোগা বদলি করে আনিয়ে রেখেছিলেন যাতে হত্যাকাণ্ড এক তরফাই হয়। হিন্দুরা প্রস্তুত না থাকার জন্যে প্রথম তাদেরই হ'ল সবচেয়ে ক্ষতি। অনেক জীবন পড়ল বলি, সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে গেল বহু হিন্দু নারীর। আরম্ভ হয়ে গেল হিংসার অন্তহীন উন্মত্ততা—আর্ত নরনারীর মর্মন্তুদ হাহাকার উঠল অভ্র ভেদ করে। দেখা গেল সুরাবর্দী সাহেব দুর্ধর্ষ গুণ্ডাদের আগে হ'তে মোতায়েন রেখেছেন। (১) দরিদ্র পল্লী হয়ে গেল ভস্মস্তূপে পরিণত। হিংস্র প্রলাপের মধ্যে চলল অরাজকতাব কদর্য কাণ্ড—রেখে গেল চিরদিনের অপমানিতের ইতিহাসের সঙ্গে নেতৃত্বের ব্যর্থ পরিহাস। মৌলনা আজাদ লিখেছেন যে তিনি দমদম ও কলকাতায় বহু সৈন্য মোতেয়ান দেখলেন—তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে তাদের শুধু দর্শক হিসেবে থাকবার হুকুম হয়েছে। (২) যে সুরাবর্দী সাহেব এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ইংরেজ গভর্ণর বা বড়লাট তাঁকে কিছুই বললেন না। আর কংগ্রেস সভাপতি যাঁর মন্তব্যের জন্যে এ হত্যাকাণ্ড পরোক্ষভাবে দায়ী তিনিও সে সময় একবার কলকাতায় থাকবার প্রয়োজন বোধ করলেন না বা কংগ্রেস নেতারা তাঁকে এর জন্যে কোন পরামর্শও দিলেন না।

ইংরেজ গভর্ণর তখন কলকাতাতেই ছিলেন—তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন। তাঁর নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায় দেশবাসী সেদিন স্তম্ভিত। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সময় মত সংবাদ পেয়েও কিছু করলেন না। (৩) এ হত্যাকাণ্ড ইংরেজ নরনারী ও শিশুর বিরুদ্ধে মুসলমানরা চালিয়ে যদি পাকিস্তান আদায়ের দাবী জানাত তাহলে গভর্ণর বা বড়লাটের তন্দ্রা এক মুহূর্ত্তেই ছুটে যেত। সরকারকে নিষ্ক্রিয় দেখে হিন্দুরাও নিজেদের জীবন, ধন, মান রক্ষার জন্যে

(1) Majumdar III p 778 (2) Azad—India wins freedcm p 159
(3) Majumdar III p 778

অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী হয়ে নিল। আরম্ভ হয়ে গেল বিভীষিকার রাজত্ব—দেখা গেল মানুষ কেমন করে নিমেষে পশুতে পরিণত হয়। অন্ততঃ তিন দিনের জন্যে অনেকের মধ্যে মনুষ্যত্বের চিহ্নটুকু রইল না। নরহত্যা, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ প্রকাশ্য রাজপথে নারীর লাঞ্ছনা, লুণ্ঠন অবাধে চলবার পর লীগ সরকার দেখল যে শুধু হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, মুসলমানদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছে। হিংসার গোপন বাহু বিস্তারের পরিধি তখন অনেক দূরে। সুরাবর্দী সাহেব বুঝলেন যে তাঁর হিসেবে কোথাও মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে—প্রতিপত্তির প্রলোভনে তাঁর আকাশ কুসুমের কুঞ্জবন লণ্ডভণ্ড, তিনি থামাবার চেষ্টা করলেন। তিন দিনে ৬০০০ লোক নিহত, ২০,০০০ আহত ও প্রায় একলক্ষ লোক গৃহহীন। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথমটা সফল হন নি পরে তাঁর কথায় হিন্দুরা অনেকটা শান্ত হ'ল। এর জন্যে কোনরকম প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা গভর্ণর করলেন না। লীগ গভর্ণমেন্ট একটা লোক দেখানো তদন্ত করবার ব্যবস্থা করল কিন্তু কয়েকজন স্বার্থপর নেতার অর্থ-লোভের জন্যে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য তথ্যের প্রমাণ চিত্রাদি মিঃ সুরাবর্দীর হাতে গিয়ে পড়ল। অথচ অপরপক্ষের গোপন তথ্যাদি লোপ করে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্যে মিঃ সুরাবর্দীর নিয়োজিত মুসলমান গুণ্ডারা নিরপরাধ শিল্পী শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষকে নির্মমভাবে হত্যা করল। এত করেও কিন্তু সুরাবর্দী সাহেব মিঃ জিন্নার কাছে পূর্ণ সমর্থন পেলেন না।

মৌলানা আজাদ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে কলকাতার অবস্থা জানালেন। তিনি শুনলেন সব, বুঝলেন সব, তবুও তখনকার মত কাজে থাকলেন নিষ্ক্রিয়। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সম্ভাবনা এক রকম শেষ হয়ে গেল। আজাদ দুঃখ করে বললেন "জহরলাল আমার পরমবন্ধু কিন্তু তিনিও তাঁর ভুলের পরিণামটা বুঝতে পারেন নি।"(১)

(1) Azad—India wins freedo.n 159—60

পণ্ডিত নেহরু যিনি পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' প্রস্তাব পাশ করাবার জন্যে দায়ী তিনি তখন মধ্যবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের চিন্তায় ব্যস্ত। কলকাতার নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মত ছোটখাট ব্যাপার দেখবার মত সময় হয় তাঁর তখন ছিল না, না হয় তিনি বাংলা দেশের জন্যে কোন কিছু করা প্রয়োজন মনে করলেন না। ১৭ই আগষ্ট যখন কলকাতার পথঘাট নররক্তে রঞ্জিত হচ্ছে তখন তিনি বড়লাটের কাছে মন্ত্রিসভা গঠনের আলোচনা নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করছেন। (১) হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পদ হানির কথা তাঁর নেতৃত্ব-লোভী মনে স্থান পেয়েছিল কিনা জানা নেই। ৭ দিন ধরে আলোচনার পর ২৪শে আগষ্ট তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম প্রকাশ করলেন। (২) দিল্লীর মসনদের অনাস্বাদিত সুখস্বপ্ন তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা।

কলকাতার পথে ঘাটে তখন গলিত শবের দুর্গন্ধ-- নরকঙ্কাল স্তূপাকার। রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বশে একবার এসে দেখবার সময় পণ্ডিত নেহরু করতে পারলেন না। বাংলার রাজধানী তখন নরকে পরিণত। বড়লাট ২রা সেপ্টেম্বর এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলে মুসলিম লীগকে মধ্যবর্তীকালীন সরকারে সহযোগিতার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। মিঃ জিন্না তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রক্তের স্বাদ পেয়েছেন তিনি বড়লাটের অনুরোধে কান দিলেন না। কলকাতায় কত মুসলমান প্রাণ দিল সে হিসেব নেবার তাঁর তখন সময় পর্যন্ত নেই। কংগ্রেস ও লীগ সভাপতিরা তখন একই মননশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। কাজেই অনেকে বললেন এঁদের দুজনের কাছে ব্যক্তিগত প্রাধান্যই বড়, দেশ বা দেশবাসী কিছুই নয়।

বড়লাট তার আগেই যখন বুঝলেন যে অতিরিক্ত মুসলমান প্রীতিতে কাজটা বড় খারাপ হয়ে গেছে, এদেশ ছেড়ে যাবার

(1) Majumdar III p 780 (2) Ibid.

আগে এ কলঙ্ক মোছবার নয় তখন তিনি কলকাতায় এলেন। যা শুনেছিলেন চোখে দেখলেন তার অনেক গুণ বেশী। দেখে শুনে তিনি সত্যিই হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর মনে এতদিনে হয়ত বাস্তব জিনিসটা ধরা পড়ল। তিনি হয়ত ভাবছিলেন যে নিরস্ত্র দেশের লোক অস্ত্র আইনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে কেমন করে এত নরহত্যা করতে পারে। একদিন হয়ত বা তারা ইংরেজদের এমনি করেই শেষ করবে। পাছে এই জিনিসের পুনরাবৃত্তি অমুসলমান-প্রধান প্রদেশে ঘটে তার জন্যে তাঁর চিন্তা আরম্ভ হয়ে গেল। যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটালেন সেই মুসলমান নেতা, খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবকে দিয়ে একটা প্রস্তাব করালেন যে কংগ্রেস যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে প্রাদেশিক জোট বা গ্রুপিংএ তাদের আপত্তি নেই তবে লীগ মধ্যবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে পারে। হীনতার বোধহয় সীমা রেখা টানা যায় না—লর্ড ওয়াভেল তারই প্রতীক। ২৭শে আগষ্ট দিল্লী ফিরে গিয়ে বড়লাট গান্ধীজি ও পণ্ডিত নেহরুকে ডাকালেন।

বড়লাট বললেন কংগ্রেসকে একটা গ্যারান্টি দিতে হবে যে তারা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নেবে। গান্ধীজি বললেন যে কংগ্রেস ত মেনেই নিয়েছে; তবে কংগ্রেস কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের যে ব্যাখ্যা করবেন কংগ্রেস সেই ব্যাখ্যাই স্বীকার করে নেবে। কংগ্রেস নিজেদের মত ব্যাখ্যা করবে—তু'পক্ষের ব্যাখ্যা একরকম নাও হয়ে পারে। বড়লাট আগেই লিখে রেখেছিলেন ড্রয়ার থেকে বের করে এঁদের সম্মতি চাইলেন। গান্ধীজি বা পণ্ডিত নেহরু বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। পক্ষপাতিত্বের সেই চক্রান্তে কেউই রাজী হতে পারলেন না। (১) ফিরে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু ইংলণ্ডের কয়েকজন পার্লামেণ্ট সদস্যকে

(1) Mosley—p 44

এ বিষয়ে পত্র লিখলেন। গান্ধীজিও মিঃ এটিলীকে জানালেন যে ভারতের এখন কোন আইনজ্ঞ বড়লাট প্রয়োজন। লর্ড ওয়াভেলের মত বড়লাট ভারতে থাকলে কোনদিন সমস্যার সমাধান হবে না।

বড়লাটের অনুরোধে পণ্ডিত নেহরু সমস্ত ব্যাপারটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পেশ করলেন। সেখানে প্রস্তাব করা হ'ল যে আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উঠলে ফেডারেল আদালতের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ২৮শে আগষ্ট পণ্ডিত নেহরু এই সিদ্ধান্ত বড়লাটকে জানালেন। বড়লাট নিজ ইচ্ছামত সংবিধান পরিষদ আহ্বান স্থগিত রাখলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মত না নিয়ে বড়লাটের এ ভাবে অধিবেশন স্থগিত রাখা মিঃ এটিলী অনুমোদন করলেন না। বড়লাটের গোপন কার্য্যকলাপে তিনি তখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন তাই কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ না করে পরিষদের অধিবেশন চালু করবার নির্দেশ দিলেন। কাজেই মধ্যবর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। এই সরকারের কাজ আরম্ভ করবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার সাফত আহম্মদ খাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণের ফলে আবার বোম্বাইয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। সকলেই বুঝলেন মুসলিম লীগের এই আক্রমণের পিছনে কয়েকজন ধুরন্ধর সিভিলিয়ানেরও গোপন হাত ছিল।

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা বড়লাটের কাজ সমর্থন না করে কঠোর হয়ে উঠলেন। তাঁদের সে মনোভাব দেখে মিঃ জিন্না বুঝলেন যে বড়লাটকে দিয়ে আর বিশেষ সুবিধে হবে না। কাজেই ১৩ই অক্টোবর মুসলিম লীগ মধ্যবর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবেন বলে পাঁচ জনের নাম পাঠালেন। বড়লাট যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন তফসিলী হিন্দু শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের নাম ছিল। সে নাম দেবার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কংগ্রেস একজন মুসলমানের নাম দিয়েছে তারই প্রত্যুত্তর। লীগের আসল উদ্দেশ্য

দু' একদিনের মধ্যে পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রতিপদে কংগ্রেসকে বাধা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলাই তাদের কাজ হবে।

লর্ড ওয়াভেল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর অভিপ্রায় জানতে পেরে কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। তিনি হয়ত বুঝেছিলেন যে এ ভাবে কিছুদিন চললে মিঃ জিন্না লীগের উপর কর্তৃত্ব হারাবেন এবং মুসলমানেরাও অধৈর্য হয়ে উঠবে। তখনই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে। তিনি দেশ বিভাগ হয়ত অন্তরের সঙ্গে চান নি—নিজে সৈন্যদলের লোক—ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করার ইচ্ছে তাঁর বোধ হয় ছিল না। লর্ড ওয়াভেলের মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করেছিলেন মৌলানা আজাদ। তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সেই ভাবেই চালিত করতে চাইলেন কিন্তু তাঁরা, বিশেষ করে পণ্ডিত নেহরু তখন ক্ষমতা লাভের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। 'রিপু অন্ধ সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করে দেখে—অনাগতকে চিরদিন উপেক্ষা করে।'

মধ্যবর্তীকালীন সরকারে কে কি দপ্তর নেবেন তাই নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন বড়লাট পরামর্শ দিলেন যে লীগকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার দিতে—সম্ভব হলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল নিজে সে দপ্তর নেবার জন্যে জিদ্ ধরলেন এমন কি বললেন 'এ দপ্তর না পেলে তিনি পদত্যাগ করবেন।' শেষে অর্থ অর্থাৎ ফাইনান্স বিভাগের ভার দেওয়া হ'ল মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁকে। তিনি ফাইন্যান্স সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কিন্তু চৌধুরী মহম্মদ আলি তখন সে বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি মিঃ লিয়াকৎ আলিকে সাহায্য করবেন বলে গোপনে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তখন শিল্পপতি ও ধনীরাই কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক—তাঁদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে মিঃ লিয়াকৎ আলি এমন বাজেট পেশ করলেন যে পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল আঁৎকে উঠলেন। লর্ড ওয়াভেল সময় মত সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও সর্দার প্যাটেলের জন্যে

কংগ্রেসকে অসহায় অবস্থায় পড়তে হল। লর্ড ওয়াভেল তাঁকে বার বার বলেছিলেন যে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র বিভাগের কোন গুরুত্ব নেই—তিনি সে কথা না শুনে যে ভুল করেছিলেন তা' তখন উপলব্ধি করলেন—বুঝলেন অর্থ দপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি একটা চৌকিদার পর্যন্ত নিয়োগ করতে পারেন না। (১) কিন্তু তখন তিনি নিজের ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। কংগ্রেসের রাজনীতি আর দেশের রাজনীতি যে এক জিনিস নয় তা' তিনি এতদিনে বুঝলেন। শেষ পর্যন্ত বড়লাটের হস্তক্ষেপে বাজেটের অদল বদল করে যা' হোক করে মুখ রক্ষে হ'ল। কিন্তু সর্দার প্যাটেল মিঃ লিয়াকৎ আলির কাছে সেদিন যে অপমানিত হলেন তা বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। তিনি বুঝলেন যে লীগের সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। বুদ্ধির খেলায় তিনি পরাজিত হয়ে নিজেকে অসহায় মনে করতে লাগলেন। তিনি নিজেও মিঃ নরীম্যান, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীবুলাভাই দেশাইকে এমনি করে অপদস্থ করেছিলেন। কংগ্রেস পদে পদে লীগের কাছে বাধা পেতে লাগল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্রমেই উঠল জটিল হয়ে।

মধ্যবর্তীকালীন সরকার কিছুদিন জোড়াতালি দিয়ে চলবার পর ১৯৪৬ সনের অক্টোবরের মাঝামাঝি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দুদের উপর আবার লীগ গভর্ণমেন্টের সুপরিকল্পিত অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল। নরহত্যা, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ অবাধে চলল। গুণ্ডারা আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালাল, পথ ঘাট নষ্ট করে দিয়ে পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দিল। মধ্যবর্তী-কালীন দু'জন মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসাবৃত্তি বাড়িয়ে চললেন। ২৯শে অক্টোবর গজনফর আলি খাঁ সদম্ভে বললেন যে, তাঁরা মধ্যবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিয়েছেন পাকিস্তানের

(1) Mosley p 85

জন্যে লড়বার উদ্দেশ্যে। তাঁরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলেন নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ব্যাপার আসন্ন গৃহযুদ্ধ ভূমিকার সামান্য অংশ মাত্র। (১) ইংরেজ বড়লাট ও বাংলার ইংরেজ গভর্ণর মনের আনন্দে লীগ নেতাদের কুৎসিত অক্টোপাশ জন্তুর মত অন্তরের পরিচয় উপভোগ করলেন, একটা প্রতিবাদও তাঁদের মুখ দিয়ে বেরুল না। কংগ্রেসও কিছু করতে পারল না।

মুসলিম লীগের মন্ত্রিরা বললেন যে, তাঁরা পণ্ডিত নেহরুকে মধ্যবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলে স্বীকার করেন না এবং তাঁদের কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে কাজ করার কোন ইচ্ছে নেই। কংগ্রেস ও লীগ ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধীনে সরকার পরিচালনা করতে লাগল। (২) নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে লর্ড ওয়াভেল কোন কথাই বললেন না দেখে ও সেখানের হিন্দুদের এ দুর্গতির প্রতিশোধকল্পে সামান্য একটা কারণে বিহারে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। এবার কিন্তু লর্ড ওয়াভেল ছুটে এলেন। যে পণ্ডিত নেহরু কলকাতা ও নোয়াখালির সময় চুপ করেছিলেন তিনিও বিহারে ছুটে এসে মর্মান্তিক বেদনায় বড় বড় বক্তৃতা দিলেন। (৩) অনেকেই প্রশ্ন করলেন কলকাতা ও নোয়াখালির সময় পণ্ডিত নেহরু কোথায় ছিলেন? অসহায় পণ্ডিতজী কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

এতদিন পরে নেতারা হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্যের জন্যে আবেদন জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কলকাতায় সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও শান্তি মিছিলে গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিলেন ছাত্র-নেতা শ্রীশচীন মিত্র, শ্রীসুশীল দাশগুপ্ত, শ্রীস্মৃতিশ ব্যানার্জী ও শ্রীবীরেশ্বর ঘোষ।

যাই হোক্ গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে সফর করলেন,—প্রচার করলেন শান্তি ও অহিংসার

(1) Menon p 319 (2) Ibid p 320—21 (3) Majumdar III p 785

বাণী। মানব জীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি সার্থক করে দেখাবার চেষ্টা করলেন। মানুষের বেদনার বহ্নি-শিখায় তিনি দিতে চাইলেন অমৃত প্রলেপ। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম 'মহাত্মা' হয়ত এতদিনে সার্থক হ'ল। বোধ হয় অনুভব করলেন বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সত্য উৎস—'মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত।' তাঁর জীবনের সেই দিনগুলিই তাঁকে অমর করে রাখবে। সত্যিকারের দেবত্বের পরিচয় ফুটে উঠল তাঁর চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ—সেই মানুষ রূপে ও অরূপে, সেই মানুষ ব্যক্তিতে ও অব্যক্তে।" সে বাণীর সার্থকতা দেখা গেল গান্ধীজির মাঝে। কবির ভাষায় "নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে তিনি এলেন। কর্মের তখন অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই, তখন ভক্ত যেন বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করলেন।" তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রেম, প্রীতি, প্রসন্নতা, সেবা, শুভ ইচ্ছা ও করুণায় সেখানের হিন্দুদের সাহস ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন—রচনা করতে চাইলেন মানব মাহাত্ম্যের অভ্রভেদী মন্দির। ১৯৪৭ সনের ২রা মার্চ তিনি চার মাস সফর শেষ করে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি আসবার পরই আবার অশান্তি আরম্ভ হ'ল। (১) চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ঐক্যের আবেদন বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

সংবিধান পরিষদ আহ্বানের সময় মিঃ জিন্না আবার বড়লাটকে অনুরোধ করলেন যাতে পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকে। বড়লাট তাঁকে ২৯শে জুলাইয়ের লীগের প্রস্তাব নাচক করতে বললেন, কিন্তু মিঃ জিন্না নানা অজুহাতে তা করলেন না। ইংলণ্ডের কর্তারা তখন বড়লাটের ব্যবহারে বিরক্ত ও অস্থির হয়ে

(1) N. K. Bose—My days with Gandhiji p 210—18

উঠছেন। ভারত সচিব বড়লাটকে কড়া করে জানিয়ে দিলেন যে অধিবেশন কোন কারণেই স্থগিত থাকবে না। ২০শে নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হ'ল যে সংবিধান পরিষদের অধিবেশন ৯ই ডিসেম্বর আরম্ভ হবে। মিঃ জিন্না মুসলমান সদস্যদের যোগ দিতে দিলেন না।

এ অবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বললেন যে হয় লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিয়ে সংবিধান পরিষদে যোগ দেবে, না হয় তাদের অন্তবর্তীকালীন সরকার থেকে পদত্যাগ করতে হবে। কংগ্রেস যদি দৃঢ়মনা হয়ে এই ব্যাপারে জিদ ধরে থাকত তা হ'লে অবস্থা অন্যরকম হ'ত। কিন্তু কংগ্রেস চিরদিনই লীগকে মুখে অবহেলা দেখিয়ে গোপনে তা'দের সহযোগিতা পাবার আশায় তোষামদ করে এসেছে—সেই নপুংসক বৃত্তি তারা আর ত্যাগ করতে পারল না। বড়লাট অসুবিধেয় পড়ে গেলেন কেননা কংগ্রেসের যুক্তি ছিল আইন সঙ্গত।

বড়লাট আর একবার আপোষের চেষ্টায় গোপনে ভারত সচিবের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠালেন। বড়লাট, পণ্ডিত নেহরু, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎআলি খাঁকে ভারত সচিব লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। বড়লাট নিজের ভুল বুঝতে পেরে ও জিনিসটা দৃষ্টি কটু হচ্ছে মনে করে শিখদের প্রতিনিধি বলদেও সিংকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৪৬ সনের ২রা ডিসেম্বর লণ্ডন পৌঁছুলেন। কিন্তু কিছুই সুবিধে হ'ল না। শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের ১৫ (৫) ও ১৯ (৮) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা মুসলিম লীগের অনুকূলে করে ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বললেন যে ভারতের ফেডারেল আদালতের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বিবৃতিটি আপতঃ দৃষ্টিতে অপক্ষপাত বলে গণ্য হলেও সত্যিকারের অপকৌশলটা ছিল শেষের দিকে। বলা হ'ল সংবিধান পরিষদ, ভারতের অধিবাসীদের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব বাদ দিয়ে যদি কোন সংবিধান রচনা করে তা

হ'লে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জোর করে এ সংবিধান দেশের অনিচ্ছুক অংশের উপর চাপাতে দেবে না।

লর্ডওয়াভেল কংগ্রেস নেতাদের দুর্বলতা ঠিক অনুমান করে তখন ভারত সচিবকে জানালেন যে লীগকে খুসী করতে পারলেই সব হবে, কংগ্রেসের জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। ভারত সচিব পণ্ডিত নেহরুর সামনে মিঃ জিন্নাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে যদি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আদালতের রায় ব্রিটিশ সরকারের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায় তা'হলে বিষয়টি আবার পুনর্বিবেচিত হবে। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্ল্যান বর্জন করা উচিত ছিল। অন্তরে ইংরেজ প্রীতির কাঠামো ভেদ করে সরাসরি তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন যে তিনি নতুন ভাষ্যটি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন কেননা ১৬ই মে'র বিবৃতি থেকে এটা অন্য রকম জিনিস দাঁড়াচ্ছে।

কংগ্রেস চিরদিনই বলে এসেছে যে কংগ্রেস সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধি। এ ভাষ্যটি মেনে নেওয়ার অর্থ—মিঃ জিন্নার প্রচার মত স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল যে কংগ্রেস একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানান উচিত ছিল। কিন্তু তখন তাঁর মনে কি ছিল জানা যায় না। লীগ যেখানে পরিষদ ত্যাগ করছে কংগ্রেস সেখানে ভারতবাসীর অধিকাংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে সে পরিষদে যোগ দিচ্ছে।

তখন দেশের অনেক লোকই কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। ১৯৪৬ সনের ২১শে নভেম্বর কলকাতায় আজাদ-হিন্দ-বন্দী প্রতিবাদ দিবসে পুলিশের বুলেটে প্রাণ দিলেন শ্রীরামেশ্বর ব্যানার্জি। ১৯৪৬ সনের ৯ই ডিসেম্বর সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম লীগের সদস্যরা যোগ দিলেন না। সে অধিবেশনে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নির্বাচিত হলেন সভাপতি। পণ্ডিত নেহরু উদ্দেশ্য মূলক প্রস্তাবগুলি (Ojective Resolutions) উত্থাপন করলেন।

মহম্মদ আলি—পৃঃ ১৫৫

ডাঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর--পৃঃ ১৩৯

তাতে বলা হ'ল যে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ; প্রদেশগুলি স্বায়ত্ব শাসনযুক্ত—দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এর লক্ষ্য। দেশের প্রত্যেক স্তরের লোকদের উন্নতি এর কাম্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক ও প্রদেশগুলির স্বার্থ রক্ষার জন্যে এ গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট।

মুসলিম লীগ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা যাতে এঁ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে সে জন্যে এ প্রস্তাবের আলোচনা ১৯৪৭ সনের ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত রাখা হ'ল। ইতিমধ্যে ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারের ১৯৪৬ সনের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি মেনে নিয়ে বলল যে কোন প্রস্তাব কোন অনিচ্ছুক প্রদেশের উপর জোর করে চাপানো হবে না বা পাঞ্জাবের শিখদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে না। সে রকম কোন চেষ্টা হ'লে সেখানের অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে।

কিন্তু প্রস্তাবমত কাজ করা হ'ল না। সেদিনের নেতৃবৃন্দ তখন যে কোন প্রকারে ক্ষমতা লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব স্বার্থ বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের দিকে তাঁদের চিন্তা করবার সময় নেই। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীরা ও সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খাঁর আবেদন পর্যন্ত তাঁদের অধৈর্য মনে স্থান পেল না। ভারতের সেই দুর্দিনে নেতারা দিশেহারা হয়ে গেলেন। এমন কি তাঁরা সব বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শও করলেন না।

এগারো

১৯৪৭ সনের ২০শে জানুয়ারী সংবিধান পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়ে ৬ দিন চলবার পর পণ্ডিত নেহরুর উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবগুলি গৃহীত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কমিটি হ'ল গঠিত। ৩১শে জানুয়ারী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি করাচি অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করল যে সংবিধান পরিষদের গঠন ও কার্যসূচী প্রথম থেকেই আইন-সিদ্ধ নয়। এক কথায় মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ও সংবিধান পরিষদ দুইই বর্জন করল। ৫ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বড়লাটের কাছে মুসলিম লীগের মধ্যবর্তীকালীন সরকার থেকে সরে দাঁড়াবার দাবী জানাল।

লর্ড ওয়াভেল এবার সত্যিই মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন কিন্তু অন্তরে মুসলিম প্রীতির প্রাবল্যে কিছুই করলেন না। পণ্ডিত নেহরু ১৩ই ফেব্রুয়ারী লর্ড ওয়াভেলকে একটা কড়া চিঠি লিখলেন। বললেন যে তিনি যেন লীগকে মধ্যবর্তীকালীন সরকার থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন। সর্দার প্যাটেল ভয় দেখিয়ে বললেন তা না হলে কংগ্রেসই সরে দাঁড়াবে। সকলেই বুঝলেন যে এবার পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে আর বড়লাটের অন্ধ মুসলমান প্রীতির ফলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি গুরুতর আকার ধারণ করবে। বড়লাট হয়ত মনে মনে সন্দেহ করলেন যে কংগ্রেস মুখে বললেও আসলে গদি ছাড়বে না কিন্তু আসন্ন গৃহযুদ্ধে সৈন্য ও আমলারা কি করবে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিল।

মিঃ মশলে বলেছেন India was a cauldron steeped in every ingredient calculated to produce the worst kind of noxious brew—obstinacy, venom, malevolence, anger, voilence, jealousy and resentment. Absent in

all hearts was the milk of human kindness.” সেদিনের ভারতবর্ষ সত্যিই ভয়াবহ। দলগত বিবাদ বিসম্বাদ, ব্যক্তিগত আক্রোশ, কলহ, দলীয় নেতাদের অব্যবস্থিত চিত্ততা, মিঃ জিন্নার তিক্ত একগুঁয়েমি, গান্ধীজির দুর্বোধ্য আদর্শবাদ ও সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক রক্তস্রোত ও নারী জাতির প্রকাশ্য অপমান জগতের সামনে ভারতের ঐতিহ্যকে অনেকখানি নীচে নামিয়ে এনেছিল। মিঃ মশলে বলেছেন—এ সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের মূলে ছিল অবিশ্বাস ও সংশয়। মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস বড়লাটকে বিশ্বাস করতে পারলেন না; বড়লাট ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে বিশেষ করে মিঃ এটিলীকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, মিঃ এটিলীও বড়লাটের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। (১)

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বড়লাটের গড়িমসি ভাব বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি স্পষ্ট করে জানালেন যে একটা তারিখ নির্দিষ্ট করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ছেড়ে চলে আসবে। বড়লাট পরম বিজ্ঞের মত সে কথায় মত দিতে পারলেন না। মিঃ এটিলী বললেন যে নির্দিষ্ট তারিখ না হলে কংগ্রেস ও লীগের বিবাদ কিছুতেই মিটবে না। বড়লাট বহু চেষ্টা করেও মিঃ জিন্নার মত পরিবর্তন করাতে পারলেন না।

১৯৪৭ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে প্রাতরাশ করবার সময় বড়লাট পত্র পেলেন যে তাঁর চাকরি শেষ হয়েছে। গম্ভীরমুখে তাঁর পরামর্শদাতা মিঃ জর্জ এবেলকে বললেন “আমাকে ওরা বরখাস্ত করেছে।” (২) সেদিন একজন কংগ্রেস নেতা আমাকে বলেছিলেন যে মিঃ এটিলী ভারতবর্ষের অনেক ক্ষতি করেছেন ও করবেন কিন্তু এ কাজটার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। তখন কংগ্রেসের ধারণা যে বড়লাট ওয়াভেলই যত নষ্টের মূল। কংগ্রেস

(1) Mosley p 48 (2) Mosley 52

সেদিন হয়ত কল্পনা করতেই পারে নি যে তাঁর জায়গায় যিনি আসছেন তিনি কত সাংঘাতিক এবং ভারতের কি পরিমাণ ক্ষতি চিরদিনের জন্যে তিনি করে যাবেন।

১৯৪৭ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। লর্ড ওয়াভেলের জায়গায় অ্যাড্মিরেল ভাইকাউন্ট মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট হয়ে ভারতে যাচ্ছেন। ওয়াভেলকে তাঁর কাজের জন্যে লর্ড সম্মানে ভূষিত করা হবে। তবুও লর্ড ওয়াভেল যে কয়দিন ভারতে ছিলেন সে কয়দিন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু জীবনে তিনি দুর্নামই কিনে এসেছেন। একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন I always get the dirty end of the stick. (১)

এই নির্দিষ্ট তারিখ মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণায় ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিবিদরা একমত হলেন না। স্যার জন এণ্ডারসন বললেন "এটা একটা জুয়াখেলা হচ্ছে সমর্থন করা যায় না।" লর্ড টেম্পল-উড্ বললেন "এর পরিণাম দাঙ্গা আর রক্তস্রোত।" লর্ড সাইমন বললেন "এ ব্যাপারের পরিণামে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না—ব্রিটিশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে।" মিঃ চার্চিল বললেন "In handing over the Government of India to these so-called political classes we are handing over to men of straw of whom in a few years no trace will remain."

তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের পটপরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন এ যুদ্ধ ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের নয়। এ যুদ্ধ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে—ব্রিটিশ শুধু রেফারির কাজ করছে। শিখরা চিরদিনই সৈনিকের জাত, তারা এক সময় ব্রিটিশ রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ ছিল। শিখরা নিজেদের পরিশ্রমে পাঞ্জাবের জমির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে, খাল

(1) Mosley p 53

কেটে সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে শস্যশালিনী করে তুলেছিল। তারা সারা পাঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাস করত। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এসে পৌঁছুবার আগেই রওয়ালপিণ্ডিতে মুসলমানদের হাতে অনেক শিখ মারা পড়ে। তখন থেকেই তাদের মনে প্রশ্ন ওঠে যে পাঞ্জাব পাকিস্তানে গেলে তারা মুসলমানদের অধীনে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় হয়ে বাস করবে কি না? শিখদের তখন দু'জন নেতা—একজন বলদেও সিং আর একজন গিয়ানী কর্তার সিং। কিন্তু তাঁদের উপর তখন তারা ঠিক আস্থা রাখতে পারছিল না। ৭১ বছরের বৃদ্ধ মাষ্টার তারা সিং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে একদিকে যেমন গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ ও সর্দার প্যাটেল অন্যদিকে তেমনি মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ও চৌধুরী মহম্মদ আলি। এঁদের বাদ দিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ডাঃ আম্মেদকর, মাষ্টার তারা সিং ও দেশীয় রাজন্যবর্গ। ডাঃ আম্মেদকর তখন কোন পক্ষে যোগ দিলে বেশী সুবিধে পাবেন তাই নিয়ে ব্যস্ত। মাষ্টার তারা সিং বলতে লাগলেন যে শিখদের রক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে তারা সম্মুখ যুদ্ধেই লড়বে—তাঁর আকালি দল কুচ কাওয়াজ পর্যন্ত আরম্ভ করে দিল।

বোম্বাই প্রদেশের কায়রা জেলার নাদিয়াদের কাছে করমসাদ গ্রামে ১৮৭৫ সনের ৩১শে অক্টোবর সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্ম। ওকালতি পাশ করবার পর বোরসাদে তাঁর দাদা সর্দার বিঠল ভাই এর সঙ্গে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করে কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে ফিরে এসে আমেদাবাদে আইন ব্যবসায়ে তিনি খুবই সুনাম অর্জন করেন। প্রথম জীবনে তিনি পুরাদস্তুর ইংরেজ ভাবাপন্ন—ক্রমে গান্ধীজির সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ১৯১৭-১৮ সনে

কায়রায় খাজনা আন্দোলন সফলতার সঙ্গে চালিয়ে সর্দার প্যাটেল রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। তার পরেই আমেদাবাদ মিলগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘটের সময় তিনি শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ধর্মঘট পরিচলনা করলেন। বরদৌলি ও চৌরসী তালুকে খাজনা বন্ধ আন্দোলনে তিনি সাহস, শৌর্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। স্পষ্ট ভাষণ ও সংগঠন প্রতিভার ভেতর দিয়ে লৌহমানব সর্দার প্যাটেল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

ভারতে দেশীয় রাজ্যের আয়তন সারা ভারতবর্ষের আয়তনের এক পঞ্চমাংশ—লোক সংখ্যা সারা ভারতের লোক সংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। ছোট বড় দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ৬০১টি। দেশীয় নৃপতিগণ একমাত্র ইংলণ্ডের সম্রাটের অধীনে ছিলেন; ভারতে তাঁরা স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করতেন। তবে তাঁদের অনেকেই বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের মধ্যেই ডুবে থাকতেন এবং বছরের অধিকাংশ সময় মণ্টে কার্লো, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে আমোদ প্রমোদেই কাটাতেন। হায়দারবাদের নিজাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনবান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়ে খেতাব ও সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন স্যার ওয়াণ্টার মংকটন। নিজাম মনে মনে মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজন্যবর্গের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন মিতব্যয়ী, প্রজাবৎসল ও নিজ রাজ্যের শুভানুধ্যায়ী। মহীশূরের মহারাজা তাঁর প্রজাদের শিক্ষা ও সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের উন্নতির যথেষ্ঠ চেষ্টা করতেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁর অস্পৃশ্য প্রজাদের জন্যে দিয়েছিলেন মন্দিরে অবাধ প্রবেশাধিকার।

অন্যান্য রাজাদের অনেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রকমের উৎকট বিলাসিতা ছিল। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁর অসংখ্য সেবাদাসী ও সুন্দরী পেশাদার নর্তকীদের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন। একবার লণ্ডনের এক হোটেলে কোন ইংরেজ বারবণিতা মহারাজের শয়ন

কক্ষে একঘণ্টা সময় কাটিয়ে দুর্নাম রটনার ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে ১,৫০,০০০ পাউণ্ড আদায় করেছিল। জুনাগড়ের নবাব তাঁর সখের কুকুরের জন্যে বহু লক্ষ টাকা অপব্যয় করতেন। আলোয়ারের মহারাজা ঘোড়ার জন্যে বিপুল অর্থ নষ্ট করতেন। একবার ঘোড়দৌড়ে জিততে না পারার জন্যে একটা ঘোড়ার গায়ে পেট্রোল ঢেলে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তবু এঁরা স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করতেন এবং কোন বিষয়ে বিশেষ গর্হিত কাজ না করলে তাঁদের রাজত্ব হারাবার কোন ভয়ই ছিল না। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পরামর্শে দেশীয় নৃপতিদের কয়েকজন রাজন্যবর্গের ফেডারেশন তৈরী করে তাঁদের স্বাধীনতার দাবীর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ভূপালের নবাব ছিলেন তখন তার চ্যান্সেলার।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্নে দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভূপালের নবাব ফেডারেশনের তরফ থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গের সার্বভৌমত্ব দাবি করে বসলেন। হায়দারবাদ ফেডারেশনের বাইরে থাকলেও নিজামের পরামর্শদাতা স্যার ওয়াল্টার মংকটনের পরামর্শ মত কাজ করতেন। তাঁর প্রজাদের শতকরা ৯০ জন হিন্দু হলেও নিজামের মুসলমান প্রীতি ছিল অদ্ভুত। মহীশূরের ও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজারা অভিজ্ঞ মন্ত্রী নিয়োগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্য পরিচালনা করতেন। নিজাম এ সময় ছত্রীর নবাব ও স্যার ওয়াল্টার মংকটনকে লর্ড ওয়াভেলের কাছে পাঠালেন তাঁর স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে।

ভারতের ভাগ্যকাশে তখন আরও দু' একটি দুষ্টগ্রহের আবির্ভাব হয়েছিল—তারমধ্যে একজন হলেন স্যার কনরাড করফিল্ড। বার্কসায়ারের ফিনচামষ্টেডের এক পুরোহিত পুত্র করফিল্ড ছিলেন ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের কর্তা। দেশীয় রাজ্যে রিজেন্ট নিয়োগ, পরামর্শদান ও দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কিত সমস্ত

নথিপত্র ছিল তাঁর অধীনে। কাজেই দেশীয় নৃপতিগণ চলতেন তাঁকে একটু সমীহ করে। প্রত্যেকের গোপন ইতিহাস থাকত তাঁর নখদর্পনে। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগ তিনি পুরোপুরি নিয়ে নিজেকে বড়লাটের সমকক্ষ বলে জ্ঞান করতেন। সময় সময় বিশেষ কাজেও বড়লাটের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতেন না।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার পর মুসলিম লীগ পাকিস্তান আদায়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা বুঝল তাদের বিবাদ এখন শুধু কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এবং তার একমাত্র পথ হচ্ছে ১৬ই আগষ্টের মত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। প্রথমে আসামে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে গিয়ে লীগ সুবিধে করতে পারল না। পাঞ্জাবে তারা মালিক খিজির হায়াত খানের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গবার চেষ্টায় আরম্ভ করে দিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। বাধ্য হয়ে মন্ত্রিরা করলেন পদত্যাগ। গভর্ণর লীগকে মন্ত্রিত্ব গঠনের জানালেন আহ্বান আকালি শিখ নেতা মাষ্টার তারা সিং সঙ্গে সঙ্গে শিখদের আহ্বান করে জানালেন "আমরা যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারি তবে মুসলমানদের কাছ থেকে সে জিনিস কেড়ে নিতে কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। লীগের অস্তিত্ব আমরা বিলোপ করব।" (১)

ইংরেজের গুপ্তচরদের প্ররোচনায় সারা পাঞ্জাবে অশান্তি পড়ল ছড়িয়ে। ইংরেজ রাজত্বের অবসান আসন্ন জেনে যাতে ভারতবাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করতে পারে সেই কারণে ইংরেজ গোপনে দিতে লাগল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি। গভর্ণর পাঞ্জাবে নিজ হাতে নিলেন ক্ষমতা—একটু চেষ্টা করলেই হয়ত অশান্তি থামাতে পারতেন কিন্তু তিনি তা' করলেন না। লাহোর, রওয়ালপিণ্ডি ও অমৃতসরে দাঙ্গা বেড়ে চলল দিন দিন। লীগের ভাড়া করা গুণ্ডারা রাইফেল ও মেসিনগান নিয়ে দুধিয়াল গ্রাম আক্রমণ করে সেখানের

(1) G. D Khosla- Stern Reckoning p 100

সমস্ত শিখদের নিশ্চিহ্ন করে দিল। প্রমাণ হয়ে গেল যে পুলিশ ও সৈন্যেরা তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। (১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও বিরোধ আরম্ভ হয়ে গেল। নরহত্যা, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ অবাধে চলতে লাগল। সরকারি হিসেবে পনের দিনে ২০৪৯ জন নিহত ও ১০০০ জন গুরুতর আহত হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হ'ল। সংবাদপত্র মারফত যে খবর পাওয়া গেল তাতে নিহতের সংখ্যা ৪০০০ হাজারের কম নয়। পণ্ডিত নেহরু নিজে রওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে হত্যাকাণ্ড দেখে এলেন। বড়লাটের জনৈক পারিষদ সংবাদ দিলেন যে সেখানে হিন্দু ও শিখদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মুসলমানেরা পরম আনন্দে আছে। ইংরেজের আইন তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। (২) কংগ্রেস কিছুতেই এ অশান্তি বন্ধ করতে পারল না। তাদেব অহিংসার বাণী ফুৎকারে উড়ে গেল। গান্ধীজির এত বছরের পরিশ্রম, এত যুগের ঐতিহাসিক সাধনা, এতকালের প্রার্থনা সবই যেন নিষ্ফল হয়ে গেল।

পণ্ডিত নেহরু নিজে চোখে হত্যাকাণ্ড দেখেও যে কোন কারণে হোক মুসলিম লীগের কোন ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করলেন না। কি মর্মান্তিক অবস্থা! ক্যাবিনেট মিশন সম্পর্কে তিনি ১০ই জুলাই এক সর্বনাশা বিবৃতি দিয়ে কলকাতায় পরোক্ষভাবে ছ'হাজার লোকের জীবন-হানির কারণ হয়েছিলেন—এবারও তাঁর সহকর্মিরা যখন তাঁকে জানালেন যে মুসলমানেরা কংগ্রেস থেকে লীগে চলে যাচ্ছে তিনি স্তোকবাক্যে উত্তর দিলেন "উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে এখনও কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট রয়েছে আমরা কেমন করে মুসলমানদের সহযোগিতা হারালুম?" (৩) 'ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহ মানুষকে চিরদিনই ছোট করে দেয়। তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে সংসারের সমস্ত তুচ্ছ ছোট জিনিস বড় হ'য়ে দেখা দেয়। মানুষ

---

(1) Modern Review April 1947 (2) K-L Punjabi—The Indomitable Sardar p 122. (3) Mosley p 60.

নিজের ছোটকেই বড় ক'রে তোলে, নিজের কলঙ্কের উপরই স্পর্ধার সঙ্গে আলো ফেলে।' পণ্ডিত নেহরু ভাবলেন লীগ তারই প্রমাণ। যে তিনি বললেই দলে দলে মুসলমানেরা লীগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেবে। হায়রে অদৃষ্ট! এরই নাম অসম্ভব কল্পনা। তিনি নিজে পেশোয়ারে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর পৈতৃক প্রাণটা সে মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। ব্যর্থ হ'য়ে অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে তিনি দিল্লী পালিয়ে এলেন—সেদিন সেই চিন্তাশীল মার্জিতমনা দেশ নায়ক অন্তরে উপলব্ধি করলেন যে মুসলমানদের কাছে লীগই একমাত্র কাম্য, কংগ্রেস নয়। (১) আর এই দাঙ্গার পেছনে আসলে ইংরেজের গোপন হাত কাজ করেছে।

সর্দার প্যাটেল লর্ড ওয়াভেলের পরামর্শ না শুনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রিত্ব নিয়ে মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর নির্মম বাজেটের জন্যে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। বুদ্ধির খেলায় সম্পূর্ণ পরাজিত ও হতশ্রী হয়ে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে লীগের সঙ্গে একত্র কাজ করা কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কাছে তখন হয়ত কংগ্রেসই বড় দেশের কল্যাণ নগন্য। তাঁর মনে যাই থাক তিনি বলে বসলেন "হিন্দু মুসলমান দুটো পৃথক্ জাত—তারা এক নেশন হতে পারে না। দু'ভাই পরস্পরের সদ্ভাব হারালে পৃথক্ হয়, আবার পৃথক্ সম্পত্তি ভোগ করবার সময় তাদের সৌহার্দ ফিরে আসে। যদি পৃথক্ না হয়ে একত্র থাকতে বাধ্য হয় তবে তাদের প্রতিদিনই বিবাদ চলে। কাজেই প্রতিদিনের বিবাদের চেয়ে পৃথক্ হওয়াই ভাল।" (২) মিঃ জিন্না এতদিন পরে কংগ্রেস নেতার স্বীকারোক্তি শুনে পরিহাস-কুটিল হাসি হাসলেন।

১৯৪৭ সনের ৮ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্যে সর্দার প্যাটেলের চাপে পাঞ্জাবকে বিভাগ করার প্রস্তাব

(1) Mosley p 80 (2) Azad p 85.

পাশ করল। কংগ্রেসের এত কালের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিষ্ফল হয়ে গেল এবং সর্দার প্যাটেলই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের পক্ষে দেশ বিভাগে স্বীকৃতি জানালেন। এ কথা ধ্রুব সত্য যে কংগ্রেস নেতারা যদি প্রথম থেকে মিঃ জিন্নার দু'জাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে আপোষে লোক বিনিময় করতেন তা হলে অনর্থক এত প্রাণ এত সম্পত্তি নষ্ট হ'ত না। তাঁরা লীগের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর প্রচার চালিয়ে দু'দলের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ তিক্ত করে অনর্থক লোকক্ষয় করিয়ে শেষ পর্যন্ত মিঃ জিন্নার কাছে পরাজয় স্বীকার করে মত দিলেন দেশ বিভাগের। সে প্রস্তাব আনলেন কংগ্রেসের লৌহ মানব সর্দার প্যাটেল। গান্ধীজিকে এ ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও জানান হ'ল না এমন কি তিনি যাতে জানতে না পারেন তার সমস্ত বন্দোবস্ত সর্দার প্যাটেল ও অন্য নেতারা করে ফেললেন। ওয়ার্কিং কমিটি স্বীকার করে নিল যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের যে অর্থ করবে কংগ্রেস সেটাই মেনে নেবে। এটা আগে স্বীকার করে নিলে ত মিঃ জিন্না ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ঘোষণা করতেন না বা দেশ বিভাগ হ'ত না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে লীগকে আমন্ত্রণ জানাল কিন্তু লীগ কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। অনেকদিন পরে গান্ধীজির বার বার বলার পর সর্দার প্যাটেল তাঁকে লিখে জানালেন "অনেক বিবেচনা করে পাঞ্জাব সম্বন্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি কিছু করা হয় নি। আপনার মত যে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তা সংবাদপত্র মারফত জেনেছি। অবশ্য আপনি যেটা ভাল মনে করেন সেটা বলার অধিকার আপনার আছে। পাঞ্জাবের অবস্থা বিহারের চেয়েও ভয়াবহ। সৈন্য মোতেয়ানের ফলে অবস্থা শান্ত মনে হলেও যে কোন সময়ে আবার আগুন জ্বলে উঠবে। তা যদি হয় দিল্লীতে আমরা অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারব।" (১)

(1) Mosley p 100-101

'বারো'

১৯৪৭ সনের ২৭শে মার্চ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করলেন। তিনি নৌ-বাহিনীর লোক—সর্বোচ্চপদ লাভের আকাঙ্খায় তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন—তাই যত তাড়াতাড়ি পারেন ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজের কাজে ফিরে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন ফিল্ড-মার্শল লর্ড ইস্‌মে, স্যার এরিক মেভিল, ক্যাপ্টেন রোনাল্ড ব্রকম্যান, জর্জ নিকোলাস, লেঃ কর্নেল ভারনন এরস্কিন ক্র্যাম ও মিঃ ক্যাম্বেল জনসন্। লর্ড ইসমে বহুদিন সৈন্য বিভাগে ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন তা' ছাড়া তিনি মিঃ চার্চিলের প্রিয়ভাজন। স্যার মেভিলও ভারতবর্ষে কিছুদিন ছিলেন—তখন তিনি লর্ড উইলিংডনের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং পরে তিনি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের অ্যাসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারির পদও পেয়েছিলেন। বাকি কয়জন বর্মার যুদ্ধকালীন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁদের পরস্পরের অনুরাগের জন্যে সহকর্মিরা পরিহাস করে তাঁদের "দি ডিকি বার্ডস্" বলতেন।

রাজকুটুম্ব লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন খুবই সুচতুর কূটনীতিজ্ঞ। অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চেনবার তার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাই কার্য্যভার গ্রহণের সমারোহের মধ্যে 'যতসব দেশীয় নৃপতি, রাজ্যপাল, বণিক সম্রাট, লেখনী বজ্রপাণি সংবাদ পত্রিকার ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যেও' তিনি চিনে নিলেন কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের। প্রথম দিনেই পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তিন ঘণ্টা আলাপ করে তাঁর আসল দুর্বলতা বড়লাট ধরে ফেলে তারই সুযোগ নিতে লাগলেন। বড়লাট বুঝলেন যে তাঁকে একটু খোসামোদ করলেই তিনি অনর্গল

কথা বলে যাবেন এবং সেই কথার মধ্যে অন্য লোকের সমালোচনা প্রকাশ হয়ে পড়বে। সেই কৌশলে বড়লাট প্রথম দিনেই কংগ্রেস নেতাদের প্রায় ভালমন্দ সমস্ত খবর জেনে ফেললেন। (১) বড়লাটের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু মিঃ জিন্না সম্বন্ধে অনুগৃহীতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করে তাচ্ছিল্য মনোভাবের সঙ্গে বললেন যে মিঃ জিন্না এমন কিছু নাম করা আইনজ্ঞ নন—সাধারণ শ্রেণীর। বড়লাট হয়ত মনে মনে হাসলেন কেননা পণ্ডিত নেহরু যে আইন ব্যবসায়ে একেবারে ব্যর্থকাম তার তা' জানা ছিল। বিদায় বেলা সুচতুর বড়লাট তাঁকে বললেন যে তিনি শুধু তাঁকে ভারতের শেষ বড়লাট বলে মনে না করে তাঁকে যেন নব ভারতের পথ প্রদর্শক বলে দেখেন পণ্ডিত নেহরু প্রথম দিনেই বড়লাটের ব্যবহারে ও বহুমূল্য আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। (২)

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন প্রথম থেকেই তাঁর নিজের লোকজন নিয়ে সম্পূর্ণ গোপনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন এবং দেশকে ভাগ করবার জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়ে কাজে নেমেছিলেন আর তাঁকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী এড্‌উইনা ও দুহিতা কুমারী প্যামেলা। বড়লাট প্রথম দিনেই পণ্ডিত নেহরুর কোথায় দুর্বলতা বুঝে নিয়ে স্থির জেনেছিলেন যে শ্রীমতী ইন্দিরার তাঁর পিতার উপর যথেষ্ট প্রভাব। মাতৃহীনা কন্যার জন্যে তিনি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি সেটা কাজে লাগাবার জন্যে মিঃ জনসনকে নিয়োগ করলেন। মিঃ জনসন খুবই কাজের লোক। এক সময়ে তিনি মাউণ্টব্যাটেনের প্রচার সচিব ছিলেন। দু'চার দিনের মধ্যে পণ্ডিত সংসারের পরম বন্ধু বলে পরিগণিত হলেন। প্রতিদিন সকালে চায়ের টেবিলে মিঃ জনসন উপস্থিত লোকের কাছে পণ্ডিত নেহরুর বন্ধু বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। (৩) মিঃ জনসন একে একে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ও সর্দার

---

(1) Mosley 94 (2) Ibid (3) Mosley 102

পাণিকরের সঙ্গে হৃদ্যতা করে ফেললেন। লর্ড ইস্‌মে ও জর্জ এবেল মুসলমান নেতাদের ভার নিলেন এবং একমাত্র মিঃ জিন্না বাদে সকল লীগ নেতারই হৃদয় জয় করতে সফল হলেন।

লেডি মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্বামীর গার্হস্থ্য জীবন ও তাঁর প্রাসাদের ৭৫০০ ভৃত্যের পরিচালনা না করে নিজের ইচ্ছেমত সকলের সঙ্গে গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচিতা হতে আরম্ভ করলেন। নিজ কন্যা পামেলাকে ভারতের রাজনীতিতে অংশ নেবার শিক্ষা দিয়ে প্রতিদিন পাঠাতে লাগলেন গান্ধীজির প্রার্থনা সভায়। তিনি নিজে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গড়ে তুললেন বন্ধুত্ব। তিনি রাজবংশের আত্মীয়া, ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু, বর্ণ-বিদ্বেষ মুক্তা, রূপলাবণ্যবতী, ও সর্বোপরি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে অনেকেরই মন জয় করে ফেললেন। (১) শুধু তাই নয় পাঞ্জাবে নিজের চোখে নরমেধযজ্ঞের মশাল দেখে এলেন। ফিরে এসে বড়লাটের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার মর্মন্তুদ কাহিনী ব্যক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট তাঁকে পণ্ডিত নেহরুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। (২)

লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপের পর পণ্ডিত নেহরুর মন বড়লাট দম্পতির প্রতি আরও প্রসন্ন হয়ে উঠল। পণ্ডিত নেহরু বহুদিন ধরে বিপত্নীক—তাঁর শূন্য হৃদয় লেডি মাউটব্যাটেন তাঁর অমায়িক ব্যবহারে, আতিথ্যে, সৌহার্দ্যে ভরিয়ে দিলেন। মিঃ মশলের ভাষায়—"He had long been a widower, and he was a lonely man. Lady Mountbatten filled an important gap in his life" (৩) বড়লাটের ভোজসভায়, উদ্যান পার্টিতে, বড়লাট পত্নীর আতিথ্যে পণ্ডিত নেহরু তখন বড়লাটের নিজের লোকের মত হয়ে গেছেন। তাঁর অন্তরের সুপ্ত ইংরেজ প্রীতি সোনার কাঠির স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। তাঁর হয়ত তখন ধারণা যে বড়লাট দম্পতি সত্যিকারের ভারত দরদী ও ভারতের মঙ্গলের

(1) Mosley 103 (2) Ibid 105 (3) Ibid 94

জন্যে অকৃত্রিম চেষ্টা করছেন। (১) ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সভ্যতাগর্বিত ব্রিটিশ জাতির চক্রান্ত জালের রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তাই যেখানে পূজার সঙ্গীত উঠত বেজে সেখানে ভরে গেল উপহাসের অট্টহাস্য।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাজের লোক। তিনি ৩১শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ করলেন। গান্ধীজি ঠিকই বুঝেছিলেন—তিনি পণ্ডিত নেহরুর মত ভাবপ্রবণ নন—যে বড়লাট ভারত বিভাগের পক্ষপাতী। বুঝলেন তাঁর প্রচার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হতে চলেছে। কংগ্রেসের সেই চরম দুর্দিনে তিনি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এমন কথা বললেন যে সারা ভারত তার প্রকৃত অর্থ না বুঝে বিস্ময়ে চমকে উঠল। তিনি ভারতের অখণ্ডতা রক্ষের জন্যে বললেন "মিঃ জিন্নার হাতে গভর্ণমেণ্ট গঠনের ভার দেওয়া হোক্। তিনি ইচ্ছে করলে সব কয়জন মুসলমান বা কিছু হিন্দু কিছু মুসলমান মন্ত্রিসভায় নিতে পারবেন—আর বড়লাটের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

বড়লাট মনে মনে বুঝলেন যে কূটনীতিতে তিনি গান্ধীজির কাছে শিশুমাত্র। তাঁর এক বোড়ের চালে বড়লাটের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললেন যে তাঁর প্রস্তাব খুবই ভাল, তবে যদি সেটা কংগ্রেস মেনে নেয় ত তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। বড়লাট আর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন না—কংগ্রেস নেতাদের বললেন যে গান্ধীজি আদর্শবাদী, বাস্তবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কম এবং এখন আদর্শ স্থাপনের সময় নয়। তখন গান্ধীজির চিন্তাধারা ও কংগ্রেস নেতাদের চিন্তাধারার আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাঁরা গান্ধীজির আসল মনোভাব বুঝতে না পেরে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বসলেন।

তারপর বড়লাট মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ করলেন। বুঝলেন

(1) *Mosley 94—95*

গান্ধীজির মতই মিঃ জিন্না কঠিন লোক। প্রথমেই মিঃ জিন্না বলে বসলেন যে তিনি একটিমাত্র সর্তে আলাপ করতে প্রস্তুত। বড়লাট সর্তাদির কথা বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত পরিচয়াদির কথা বলতে অনুরোধ করলেন। জানতে চাইলেন মিঃ জিন্নার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। কিন্তু মিঃ জিন্নার ধারণা ছিল যে বড়লাট মুসলমান-বিরোধী, কংগ্রেস-দরদী ও হিন্দু ভাবাপন্ন। কাজেই তিনি ধরা দিলেন না। অন্তর্দাহ কথায় প্রকাশ না পেলে অন্তরে জমা হতে থাকে। অনির্দিষ্ট সংশয়ের আশঙ্কায় তিনি ফিরে এসে বললেন "বড়লাট কিছুই বোঝেন না।" (১) সত্যি কথা বলতে কি বড়লাট ভারতে আসার অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় নেতাদের নাড়ী নক্ষত্র সমস্ত জেনে ফেলেছিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পাঞ্জাব বিভাগ প্রস্তাবের খবর পেয়ে বড়লাট সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সর্দার প্যাটেল স্বীকার করলেন যে পাঞ্জাব ভাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অভিলাষ পূর্ণ হ'ল—তিনি পারিষদদের ডেকে বললেন 'এবার কাজ হয়েছে'। কিন্তু সর্দার প্যাটেল এ আলোচনার কথা কাউকে জানালেন না। (২) বড়লাট বুদ্ধিমান লোক—বুঝলেন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ভারতে কার্য্যকরী নয় এবং ভারত বিভাগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই—এবং ভারতের যে অবস্থা তাতে সেখানে ইংরেজদের বেশীদিন থাকাও নিরাপদ নয়। ভারতীয় সৈন্যদের উপর আর আস্থা রাখা যায় না কাজেই যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা যায় ততই মঙ্গল।

সর্দার প্যাটেল দেশ বিভাগে রাজী হয়েছেন এবং বড়লাটের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন জানতে পেরে মৌলানা আজাদ অসুস্থ অবস্থাতেই গেলেন পণ্ডিত নেহরুর কাছে। পণ্ডিত নেহরু প্রথম থেকেই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন—

(1) Mosley p 97 (2) Ibid 101

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল—পৃঃ ১৬৫

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন — পৃঃ ১৭২

তিনি এই নিয়ে মিঃ জিন্নাকে বার বার বিদ্রূপ করেছেন—মুসলিম লীগকে অবজ্ঞা জানিয়েছেন কিন্তু তখন বড়লাট দম্পতি তাঁর হৃদয় জয় করে ফেলেছেন। আজীবন অত্যুৎকট ইংরেজ প্রীতি, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্ব, বড়লাট দম্পতির আতিথ্য ও অমায়িক ব্যবহার আর সর্দার প্যাটেলের অনুরোধে পণ্ডিত নেহরু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করে দেশ বিভাগে সম্মতি দিয়েছিলেন। (১) পণ্ডিত নেহরু তাঁর কথা জানালেন মৌলানা আজাদকে। মৌলানা ছুটলেন গান্ধীজির কাছে।

গান্ধীজি মৌলানা আজাদকে দুঃখ করে বললেন "সর্দার প্যাটেল ও জহরলাল ত দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছেন—আপনি কি করবেন ?" মৌলানা আজাদ উত্তর দিলেন "আমি আগেও বিপক্ষে ছিলুম এখনও আছি। আমার দুঃখ যে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরু পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। আমার এখন একমাত্র ভরসা আপনি। আপনি যদি দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তা হলে আমরা এখনও সামলাতে পারি, আর আপনি যদি মেনে নেন তাহ'লে ভারতবর্ষের চরম দুর্গতি।" গান্ধীজি প্রথমটা চুপ করে থাকলেন হয়ত তাঁর মনে পড়ছিল পুরানো দিনের কথা—এই মৌলানা আজাদই সাইমন কমিশনের সময় "সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকারের" জন্যে দাবি জানিয়ে দেশ বিভাগের প্রথম অঙ্কুর পুঁতেছিলেন—সেদিন কংগ্রেসকে নৈতিক পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—সে বেদনার ক্ষত বোধ হয় তাঁর তখনও শুকোয় নি। অনেক ভেবে শেষে বললেন "একথা কি আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ? কংগ্রেস যদি দেশ বিভাগ চায় তাহ'লে সেটা আমার মৃত দেহের উপর দিয়ে পাবে। যতক্ষণ আমি জীবিত ততক্ষণ আমি কিছুতেই সম্মতি দেবো না—যদি পারি ত কংগ্রেসকেও দিতে দেবো না।"

এর দু' একদিন পরে সর্দার প্যাটেল গান্ধীজির সঙ্গে গোপনে

(1) Azad p 185

দু'ঘণ্টা আলাপ করলেন তারপর তাঁর অভিমত দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। মৌলানা আজাদ তাঁকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন শেষে ব্যর্থ হতাশায় ফিরে এলেন। (১) গান্ধীজি প্রতিদিন তাঁর প্রার্থনা সভায় দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন। (২) মুসলিম লীগের পাণ্ডারা এ বিষয়ে বড়লাটের কাছে অভিযোগ জানালেন। ১৯৪৭ সনের ৪ঠা জুন বড়লাট গান্ধীজিকে তাঁর প্রার্থনা সভায় যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলেন। কি কথা হ'ল জানা নেই কিন্তু সেদিন থেকে প্রার্থনা সভার সুর বইতে লাগল অন্য খাদে। তিনি বললেন "দেশ বিভাগের জন্যে ব্রিটিশ সরকার দায়ী নয়। বড়লাটের এতে কোন হাত নেই। সত্যি কথা তিনিও কংগ্রেসের মত দেশ বিভাগ চান না। তবুও যদি আমরা হিন্দু মুসলমান একমত হতে না পারি ত বড়লাটের অন্য কোন উপায় নেই।" (৩)

পণ্ডিত নেহরু তাঁর জীবন চরিত রচয়িতা মাইকেল ব্রীচারকে বলেছিলেন "অখণ্ড ভারত থাকলে প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক অশান্তি লেগে থাকত তাতে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হ'ত না এবং অচিরে স্বাধীনতা পাবার কোন উপায় থাকত না। তাই তিনি দেশ-বিভাগ মেনে নিয়েছেন।" পরে অবশ্য তাঁর বন্ধু মিঃ মশলেকে বলেছিলেন "সত্যিকথা বলতে কি আমরা ক্লান্ত, বার্ধক্যও আসছে। আর জেলের কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই। যদি ভারতের ঐক্যের জন্যে লেগে থাকতুম তা হ'লে আমাদের জেলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠত। পাঞ্জাবে অশান্তির আগুন দেখেছি—প্রতিদিন নরহত্যার খবর পেয়েছি—এ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় দেশ বিভাগ মনে করে এটাই গ্রহণ করেছি। তবুও গান্ধীজি 'না' করলে আমরা সংগ্রামই করে যেতুম। আমরা এই

(1) Azad p 187 (2) Allan Campbell Johnson p 97
(3) Ibid. p 110

মনে করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলুম যে পাকিস্তান হবে স্বল্পায়ু আর আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। আমরা কোনদিনই ভাবতে পারি নি যে এত লোক মরবে ও কাশ্মীর নিয়ে আমাদের এত তিক্ততা বাড়বে।" (১) এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রেখে নিজেদের শূন্য গর্ভ কৈফিয়ৎ রচনা করে নিরুৎসুক নিরুদ্যম চিত্তেরই পরিচয় দিয়েছিলেন বলে অনেকের ধারণা।

কিন্তু সকলেরই ত মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে পরিসমাপ্তির দিকে। তার জন্যে এত দিনের আদর্শ, এত দিনের সাধনা, এত কালের পরিশ্রম, এতকাল ধরে দেশের লোককে সে পথে চালিত করা, জলাঞ্জলি দিতে হবে? এই কি স্বাধীনতাকামী জীবন দর্শনের বিমূর্ত পরিপূর্ণতা? বিশেষ করে যেখানে ইংরেজের সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়—ইংরেজ বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। প্রদীপের শিখার মত আত্মদানেই মানুষের আত্ম উপলব্ধি। 'মনুষ্যত্ব আর নেতৃত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা নয়—সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয় দীর্ঘদিন ধরে। তবেই আসে অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি ভেদ করে মানুষের ইতিহাসের রথে জীবনের সিংহদ্বারে মানুষের পরম কল্যাণ। আমরা ভুলে যাই মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়, আমাদের সমস্ত কীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত।'

গোপনে যে এত ব্যাপার হয়ে গেছে দেশের লোক তা মোটেই জানত না। তাদের ধারণা যে কংগ্রেস তার আদর্শ থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না এবং দেশ বিভাগের পক্ষে কিছুতেই মত দেবে না—গান্ধীজি ত নয়ই। কিন্তু গান্ধীজি তখন জেনেছেন যে কংগ্রেসের দু'জন নেতা দেশ বিভাগ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর নিজের মধ্যেও তখন সংশয় এসে গেছে—তিনি মনে মনে অশান্তি ভোগ করছেন। মনে করছেন কোথায় গেল তাঁর গত পঞ্চাশ বছরের

(1) Mosley—p 248

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আবেদন, কোথায় গেল তাঁর অহিংস নীতি? রক্তের তরঙ্গ স্রোতে তখন তাঁর অহিংস বাণীর জীর্ণ তরী অন্তহীনের পথে, কোথায় গেল তাঁর এতদিনের সাধনা-লব্ধ কংগ্রেস? তবুও তাঁকে বলতে হ'ল "দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বলতে গেলে রাজ্যশাসন নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে—কংগ্রেসের প্রাচীন ও অভিজ্ঞ নেতাদের অপসারণ অবিবেচনার কাজ হবে।" (১) তিনি জানতেন নতুনত্ব কালের ধর্ম। প্রাচীনের উত্তরাধিকারী পুরাতনের ক্রীতদাস নয়—অথচ তিনি একথা বললেন।

বড়লাট কেবল এই যুক্তিই দেখাতে লাগলেন "দেশ বিভাগ না হলে দুর্বল কেন্দ্রের অধীনে স্বাধীন প্রদেশগুলি থাকবে। ভারতের মত বিরাট দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, লোকের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। এদের সংহতি রাখতে গেলে শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজন। মুসলমান গরিষ্ঠ প্রদেশগুলো পৃথক্ হয়ে গেলে বাকি অংশের জন্যে কংগ্রেস শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করতে পারবে।" প্রকারান্তরে তিনি দেশ বিভাগের পক্ষেই ওকালতি করতে লাগলেন। সেদিনের নেতৃবৃন্দ তখন বড়লাটের সততার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সে যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলেই অবস্থা অন্যরকম হ'ত। যে পণ্ডিত নেহরু ভারতকে বলকানের মত করতে দিতে অন্তরের সঙ্গে নারাজ ছিলেন তিনিও সম্মতি জানালেন। অথচ জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও কর্মে সেদিনের নেতারা ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ, দেশের লোকের পরম শ্রদ্ধাভাজন। তাঁরা ইংরেজের চক্রান্ত বুঝেও কিছু করতে পারলেন না। জীবন সমস্যার নতুন নতুন সমাধান—সংহতি রক্ষা তলিয়ে গেল সর্বনাশের অতলে। তাঁরা বাধ্যহয়ে করে বসলেন সংহতি সংহারের এক দুঃসাহসিক সূচনা। রাজনীতিতে অবশ্য 'কাজের চেয়ে কথা বেশী, কথার চেয়ে কলহ বেশী, কলহের চেয়ে দলাদলি বেশী, দলাদলির চেয়ে ষড়যন্ত্র বেশী।'

(1) N. K. Bose—Studies in Gandhism p 284—294

সেদিনের নেতারা গোপনে ভারত বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফুর খাঁ সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক সেই সীমান্ত গান্ধী পর্যন্ত এ ব্যাপার জানতেন না। তিনি আগে কংগ্রেসের মনোভাব বুঝতে পারলে পাখতুনিস্তানের জন্যে আন্দোলন চালাতেন। কংগ্রেস তাঁর প্রতি শুধু অবিচার করল না তাঁকে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল। ঠিক এমনি করেই কংগ্রেস মিঃ জিন্না, শ্রীনরীম্যান, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীবুলাভাই দেশাই ও শেষ পর্যন্ত খান আবদুল গফুর খাঁয়ের সঙ্গে একই ব্যবহার করল। মুসলিম-লীগ-বিদ্বেষী, একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী সেই আজানুলম্বিতভুজ সীমান্ত গান্ধীকে কংগ্রেস নির্বিচারে শত্রুব্যূহের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিল— তাঁর দুঃখ ভোগের আজও সীমা নেই। গান্ধীজিও কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। এত করেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বললেন গান্ধীজি 'না' করলে তাঁরা দেশ বিভাগ মেনে নিতেন না।

গান্ধীজি অন্যসময় কথায় কথায় প্রয়োপবেশনের অভিপ্রায় জানিয়ে বা প্রায়োপবেশন করে তাঁর নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করতেন কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁকে সে পথে যেতে দিলেন না। তিনি বুঝলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁর মতের বিরোধী—সময় সংকীর্ণ, তাঁর অন্তরে তখন বিষণ্ণ গোধূলির মালিন্য। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাণী তখন পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তির মত বেসুরো বাজছে। আজও মনে পড়ে গান্ধীজির জীবনের সেই দিনগুলি। শোনা যায় নিরুপায়ের মত তিনি গোপনে ডাকলেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে— তিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন কিনা? কোন আশা না পেয়ে ছাত্র নেতাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা এ শেষ সংগ্রামে তাঁর পাশে দাঁড়াবে কিনা? বৃদ্ধ সাজাহানের মত কোন খান থেকে কোন ভরসা পেলেন না।

এতদিন পরে তাঁর জীবন সায়াহ্নে কংগ্রেস নেতারা তাঁকে এক-

রকম বয়কট করলেন। সেদিন হয়ত তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে তিনি কি সত্যিই অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশকে ঠিক পথে চালিত করতে পারেন নি? আজীবন 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য' ও 'অহিংসনীতি' এই দু'টো ছিন্নতন্ত্রীতে তাঁর রাজনীতির বীণা বাজিয়ে সত্যিই কি আলেয়ার পিছনে পিছনে দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে ছুটেছেন? সেদিন আত্মাভিমানের ব্যর্থ বোঝা গুরুভার পাষাণের মত বুকের উপর চেপে বসেছিল। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে কিন্তু হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের ভেতর দিয়ে নয়—চরম কলহ ও অনৈক্যের ভেতর দিয়ে—অহিংসার বদলে লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্তে তখন রাজপথ রঞ্জিত। তাঁর ঐতিহাসিক জীবন সাধনার অন্ত্যেষ্টিসংকার হয়ে গেল পরাজয়ের মহাশ্মশানে। মিঃ জিন্না তাঁর অভিলষিত পাকিস্তান, দু'জাতি তত্ত্ব ও অনৈক্যের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে জয় করলেন মুসলমানদের হৃদয় সিংহাসন।

কংগ্রেস দেশ বিভাগে সম্মত আছে জেনে মিঃ জিন্না পাঞ্জাব ও বাংলার সবটাই পাকিস্তানের জন্যে চেয়ে বসলেন। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। সেদিন হিন্দু মহাসভা ও শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু চেষ্টা না করলে হয়ত সমগ্র পাঞ্জাব ও বাংলা বা তার অধিকাংশ অংশটাই পাকিস্তানে চলে যেত। কংগ্রেসও রাজী হ'ল না। সে সময় বাংলার প্রধান মন্ত্রী সহীদ সুরাবর্দী ও শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার দাবি তুললেন কিন্তু কংগ্রেস বা লীগ তাতে রাজি হ'ল না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বললেন যে পাঞ্জাব ও বাংলার অধিবাসীদের ইচ্ছের উপরই সমস্ত নির্ভর করবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা ভারতে এল। (১)

(1) Pyarilal II Chapter III

তেরো

দেশ বিভাগ কার্যকরী করার মূলে আর একজনের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর ছিল না কোন বিদ্যার খ্যাতি বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা আইনের কোন সনদ। তাঁর নাম শ্রী ভি. পি. মেনন। ১৮৮৯ সনে মালাবারে তাঁর জন্ম। পনর বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তিনি কোন সার্টিফিকেট পেলেন না। দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের জন্যে তিনি অনেকদিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে আর এক বছর স্কুলে থাকতে বলা হ'ল। কিন্তু তখন পিতার মৃত্যুতে ও আর্থিক দুরবস্থায় তাঁর সংসার অচল। বেরিয়ে পড়লেন চাকরির আশায়। সার্টিফিকেটের অভাবে কোন ভাল চাকরি জুটল না। তিনি সকলকেই বললেন যে তিনি ইংরেজী ভাল বলতে ও লিখতে পারেন, অঙ্কে তাঁর দখল ভালই তবুও কোন ফল হ'ল না—তিনি বুঝলেন এ দেশে বিদ্যার চেয়ে সার্টিফিকেট ঢের বড় জিনিস।

শেষে রেলের এক দোকানে সামান্য মাইনের চাকরি জুটল। এসময় একজন সহৃদয় ইংরেজ তাঁর সহায় হলেন। মাদ্রাজের মেল পত্রিকায় মহীশূরের স্বর্ণখনিতে একজন কেরাণীর দরকার বলে বিজ্ঞাপন ছিল আর তার পরে ঐ জায়গার জন্যে একজন ঠিকেদার দরকার বলে খবর ছিল। ইংরেজ ভদ্রলোকের চেষ্টায় সাক্ষাতের অনুমতি মিলল। ইংরেজ ম্যানেজার তাঁর দুটি দরখাস্ত দেখে তাঁকে কেরাণীর চাকরি নিতে বললেন কিন্তু মেনন অর্থের লোভে ঠিকেদারীর কাজটাই চেয়ে বসলেন। ম্যানেজার তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে তাঁর উপদেশমত কাজ করতে বললেন। অনভিজ্ঞ মেনন অর্থের লোভে সে উপদেশ না শুনে কয়েক মাসের মধ্যে শুধু সর্বস্বান্তই নয় কোম্পানীর কাছে বহু টাকার জন্যে দায়ী হয়ে পড়লেন। ম্যানেজার

তখন তাঁকে কথা না শোনার জন্যে ধমক দিয়ে তাঁর হাতে একটা মোড়া খাম দিয়ে সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

চিঠি খুলে মেনন দেখলেন একশ' টাকার দু'খানা নোট, ফেরৎ দেবার কোন কথাই নেই আর বাঙ্গালোরের কোন তামাকু প্রতিষ্ঠানের ইংরেজ ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি। চাকরি হ'ল কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে পেট ভরল না—আরম্ভ হ'ল দুর্গতি। কোন বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে ফিরে চললেন দেশে। রেল ষ্টেশনে এক পরিচিত ইংরেজের সঙ্গে ভাগ্য ক্রমে দেখা হয়ে গেল। তিনি দিল্লীর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তখন সর্বময় কর্তা। মেননের দুর্গতি শুনে তাঁকে তাঁর অধীনে চাকরি দিয়ে বললেন "রাতের স্কুলে পড়াশুনা কর।" অদৃষ্টের চাকা এতদিনে ঘুরে গেল। ১৯৪০ সনে মেনন ভারতের সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। ১৯৪১ সনে তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের ফেডারেশনের একটা খসড়া তৈরী করে বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে দিলেন। বড়লাট সেটা পড়ার কোন প্রয়োজন নেই মনে করে ফেলে দিলেন। একদিন মেননকে ধমক দিয়ে বললেন "তুমি কি মনে কর তোমাকে আমি রিফমর্স কমিশনার করে দেবো ? তা হবে না—ও চাকরি ভারতীয়দের জন্যে নয়।"

রিফমর্স কমিশনারের পদ খালি হবার পর বড়লাট মিঃ এইচ. ভি. হড্সন্ নামে এক ইংরেজকে সে পদে নিয়োগ করলেন। মেনন চিরদিন ইংরেজের কাছে উপকৃত তাই কোন প্রতিবাদ করলেন না। ১৯৪৩ সনে মিঃ হড্সনের সঙ্গে বড়লাটের মতের মিল না হওয়ায় মিঃ হড্সন কাজে ইস্তফা দিয়ে ইংলণ্ড চলে যান। সেই শূন্যপদ পূরণের জন্যে বড়লাট অভিজ্ঞ লোক খুঁজতে লাগলেন। তাঁর দপ্তরের লোকেরা বললেন যে মেননের চেয়ে অভিজ্ঞ বা যোগ্যতর লোক সারা ভারতে আর কেউ নেই। এতদিন পরে তাঁর জীবনের আকাঙ্খা পূর্ণ হ'ল তিনি রিফমর্স কমিশনারের পদ পেলেন। (১)

---

(1) Mosley 86

কংগ্রেস দেশ বিভাগে সম্মত হয়েছে জেনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কি ভাবে দেশ ভাগ হবে তার খসড়া তৈরী করলেন। খুব গোপনে কাজ করতে লাগলেন যাতে সেটা খুব তাড়াতাড়ি কার্যকরী করে তুলতে পারেন। তাঁর ধারণা হ'ল যে দেরী হলেই নানা রকম অসুবিধের সৃষ্টি হবে। তিনি কোন ভারতীয়কে তাঁর কাজের মধ্যে ডাকলেন না—এমন কি রিফমর্স কমিশনার মিঃ মেননও বাদ পড়লেন। বড়লাটের পরামর্শদাতা মিঃ জর্জ এবেল বার বার বড়-লাটকে অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে মেননের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে। লর্ড ইস্‌মে জানালেন যে ভারত সম্বন্ধে মেননের চেয়ে কোন অভিজ্ঞতর ব্যক্তি নেই তবুও কোন ফল হ'ল না। ইতিমধ্যে তিনি একটা দেশ বিভাগের খসড়া করে ১৯৪৭ সনের ২রা মে লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রীর কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠালেন। এই 'ডিকি বার্ড খসড়ায়' ভারতবর্ষকে ছোট ছোট অনেক অংশে ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ইংলণ্ডে পাঠিয়ে বড়লাট অধীর আগ্রহে তার অনুমোদনের আশায় দিন কাটাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সনের ১৭ই মে তিনি ভারতের নেতৃবৃন্দকে ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের দিল্লীতে একটা সম্মেলনে আহ্বান করলেন। তখন বড়লাট সিমলায় এবং পণ্ডিত নেহরুও সেখানে ছিলেন। ১০ই মে বড়লাট পণ্ডিত নেহরুকে নৈশভোজের শেষে আতিথ্যের নিমন্ত্রণ জানালেন। সেই নিমন্ত্রণে দেখালেন তিনি পণ্ডিত নেহরুকে ডিকি বার্ড-প্ল্যানের নকল। পণ্ডিত নেহরু সেটা পড়ে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে কংগ্রেস বা তিনি এটা অনুমোদন করবেন না। পণ্ডিত নেহরু সেদিন এ প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্যে দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি জানতেন বড়লাট দেশ বিভাগে বদ্ধপরিকর—কিন্তু তবুও তিনি সেদিন দেশের কল্যাণের জন্যে ও কংগ্রেসের ঐতিহ্যের জন্যে বড়লাটের আতিথ্য সত্ত্বেও সে প্ল্যান নাকচ করেছিলেন।

অবস্থার চাপে পড়ে তিনি দেশ বিভাগে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন—বড়লাট হয়ত তারই সুযোগ নিয়ে তাঁকে এই প্ল্যান মঞ্জুর করাবার আশায় ছিলেন কিন্তু সেদিন তিনি বড়লাটের অনুরোধ উপেক্ষা করতে কুণ্ঠিত হন নি। সাধারণ মানুষ 'আত্ম অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়ে অনুকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়ে নিজেকে ব্যর্থ করে দেয়।' কিন্তু সেদিন তিনি অকৃত্রিম নিষ্ঠায় নিজ চরিত্রের বিশুদ্ধ পরিচয় দিয়েছিলেন। বড়লাট পরিচয় পেলেন তাঁর চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মনের—দেখলেন অপরূপ মহিমার সর্বগ্রাসী চেহারা, শক্তির বিপুল অগ্নিকুণ্ড। মিঃ মশলে বলেছেন যে যখন পণ্ডিত নেহরু কাগজ খানা পড়ছেন তখন বড়লাট ক্লান্ত পঙ্গু আড়ষ্ট মন নিয়ে সশঙ্কে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। শেষে যখন না বললেন বড়লাট মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন—পরে লণ্ডন থেকে খবর এল যে ডিকি বার্ড প্ল্যানের সংশোধন প্রয়োজন।

পরের দিন বড়লাট পারিষদবর্গের পরামর্শে মিঃ ভি. পি. মেননকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে বললেন যে সেই-দিনই সন্ধ্যেয় পণ্ডিত নেহরু দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন তার আগে একটা প্ল্যান করে দিতে হবে যেটা কংগ্রেস, লীগ ও ব্রিটিশ ক্যাবিনেট অনুমোদন করবে। পণ্ডিত নেহরু সিমলে ছাড়বার আগে তাঁকে তিনি সে প্ল্যান দেখাতে চান।

বেলা তু'টোর সময় মেনন তাঁর হোটেলে ফিরে এসে মদের বোতল ও কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে তাঁর লেখা শেষ হওয়া মাত্র স্যার এরিক মেভিল সেটা নিয়ে ছুটলেন বড়লাটের কাছে। বড়লাট পড়ে খুসী হয়ে পণ্ডিত নেহরুকে দেখালেন—তিনি বললেন 'এটা হয়ত চলতে পারে কংগ্রেস যদি মেনে নেয় ত তাঁর আপত্তি নেই।' পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তখন কিছু কিছু জ্ঞান বড় লাটের হয়েছে তাই বলে উঠলেন

"সারা ভারতের চেহারা বদলাতে মাত্র চার ঘণ্টা সময় লাগল।" (১) সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট মিঃ এটিলীকে তার করে জানালেন যে নতুন প্ল্যান পাঠানো হচ্ছে। দিল্লীর প্রস্তাবিত সম্মেলন ১৭ই মের বদলে ২রা জুন ধার্য করে সকলকে জানান হ'ল।

রাত্রি নয়টায় বড়লাট দম্পতির ভোজ সভায় সস্ত্রীক মেনন নিমন্ত্রিত হলেন। বড়লাট মেনন পত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন আর বড়লাট পত্নী মেননের গালে আদরের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চুপি চুপি বললেন 'পণ্ডিত নেহরু অনুমোদন করেছেন।' তাঁর অনুমোদন মানে সারা ভারতের ও কংগ্রেসের অনুমোদন। পরের দিনই বড়লাট সংবাদ পেলেন যে তাঁর ১৭ই মে লণ্ডন যাবার অনুরোধ এসেছে। প্রথমে তিনি যেতে রাজী হলেন না কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও মেননের পরামর্শে তাঁদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

এই অবসরে দেশীয় রাজন্যবর্গের সার্বভৌমত্ব রক্ষের জন্যে ব্যাকুল হয়ে স্যার কন্‌রাড করফিল্ড বড়লাটের অজ্ঞাতে ভারত সচিবের সঙ্গে পত্রাদি বিনিময় করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং ডিকি বার্ড প্ল্যান পাঠানোর সময় তিনিও লর্ড ইসমের সঙ্গে লণ্ডন গিয়ে ভারত সচিবকে ভুল বুঝিয়ে তাঁর কাজের অনুমোদন লাভ করে আসেন। বড়লাট কিছুই জানতেন না। বড়লাট লণ্ডন আসছেন জেনে তিনিও লণ্ডন থেকে ভারতে ফিরলেন। তাঁর এ ভাবে লুকিয়ে পালিয়ে আসাটা বড়লাট খুবই সন্দেহের চোখে দেখলেন। (২) স্যার করফিল্ড ফিরে এসেই দেশীয় রাজন্য বর্গের নথিপত্র থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত রিপোর্ট ছিল সেগুলো বের করে প্রায় চার টন কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে তাঁদের সাহায্য করলেন আর অনেক মূল্যবান দলিল লণ্ডনে পাঠালেন। শুধু তাই নয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে হুকুম দিলেন যেন দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে পূর্বেকার সমস্ত বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়।

যে সমস্ত ঘটনার জন্যে দেশীয় রাজন্যবর্গ মাঝে মাঝে তিরস্কৃত

(1) Mosley 126 (2) Ibid 163

হয়েছেন যে সমস্ত কদর্য ব্যবহারের জন্যে তাঁদের গদিচ্যুত করা হয়েছিল তার সমস্ত প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেল। কাশ্মীর ও আলোয়ারের মহারাজার ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ ও সুন্দরী নর্তকী মুমতাজ মহলের হত্যা সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলাদি ভস্মীভূত হয়ে গেল। ব্যর্থ আক্রোশে ও ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে ক্ষমতার অহংকারে করকিল্ড ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি করলেন। (১)

বড়লাট লণ্ডনে পৌঁছুলেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেনন প্ল্যান অনুমোদন করলেন। বড়লাট মিঃ এটিলীকে বললেন যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের বদলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন হলে হস্তান্তর ত্বরান্বিত হবে। প্রধানমন্ত্রী রাজী হলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আপন কৃতকার্যতার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন মজার ব্যাপার বটে—"মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তার অনুমোদন করে ২৫০,০০০,০০০ জন হিন্দু, ৯০,০০০,০০০ জন মুসলমান ও ১০,০০০,০০০ খৃষ্টান ১৫,০০০,০০০ শিখের ভাগ্য নিরূপণ করে দিল। (২)

৩১শে মে বড়লাট বিজয়ীর গর্বে ভারতে ফিরে এলেন—সকলে বুঝলেন যে দেশ ভাগ আসন্ন। মিঃ জিন্না এ সুযোগে ভারতের ভেতর দিয়ে এক হাজার মাইল পথ দাবি করে বসলেন—কংগ্রেস তা শোনামাত্র অগ্রাহ্য করে দিল। গান্ধীজি দিল্লী ছুটলেন বললেন "গান্ধীজি দেশ বিভাগের সমর্থক একথা লোকে যেন না ভাবে। আজ সকলেই স্বাধীনতার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছে। এতে তাদের হাতে কাঠের রুটি দেওয়া হয়েছে—খেলে পেটের যন্ত্রণায় মারা যাবে, না খেলে অনাহারে মরবে।" (৩) দিল্লী আসবার পথে তাঁর সারা জীবনের একমাত্র সঙ্গী ও বহু দিনের সঞ্চিত ঘড়িটি বালিশের নীচে থেকে হারিয়ে গেল।

(1) Mosley (2) Ibid 163 (3) Ibid 128

দেশের এই একান্ত বিপদের দিনেও তাঁর প্রিয় জিনিসটি হারাবার দুঃখ নিয়ে তিনি দিল্লী ষ্টেশনে নেমে বললেন "আমি সারা জীবন যুদ্ধ করেই এসেছি এবার হারা-যুদ্ধ লড়তে এসেছি।" (১)

গান্ধীজিকে দিল্লী আসতে দেখে বড়লাট সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। সেদিনের কংগ্রেস নেতাদের তখন সেই বিষাদম্লান বৃদ্ধ তাপসটির দিকে চাইবার সময় নেই। শুধু মৌলানা আজাদ একবার শেষ চেষ্টার জন্যে ছুটলেন বড়লাটের কাছে। বড়লাট বললেন যদি দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে ত তিনি কঠোর হস্তে সেটা দমন করবেন—সৈন্য মোতেয়ান ত থাকবেই দরকার হলে ট্যাঙ্ক ও বিমান ব্যবহার করা হবে। (২) মৌলানা বুঝলেন যে বড়লাট কিছুই করবেন না, রক্তস্রোত অনিবার্য—বড়লাটের ভরসার কোন মূল্যই নেই। ৩রা জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্ল্যান মেনে নিল। মিঃ জিন্না এক হাজার মাইল পথ না পেয়ে বাংলার স্বাধীনতার জন্যে গণভোট নেবার অনুরোধ জানালেন—চক্ষু লজ্জার বালাই তাঁর ছিল না। বড়লাট তা সরাসরি নাকচ করে দিলেন। ৩রা জুন পণ্ডিত নেহরু, মিঃ জিন্না ও মিঃ বলদেও সিংকে নিয়ে বড়লাট জোর করে দিল্লীর বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দেশবাসীকে শোনালেন তাঁদের কথা।

প্রথমে বড়লাট বললেন "আজ একশ বছরের বেশী ভারতবাসীরা এক জায়গায় একদেশে বাস করেছে। দেশকে অখণ্ড রাখবার কোন ব্যবস্থাতেই তারা একমত হতে পারল না। কোন গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জায়গা জোর করে অন্য এক সরকারের অধীনে দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই দেশ বিভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

সেদিন পণ্ডিত নেহরু তাঁর প্রতিভার অম্লান দর্পণে ভবিষ্যতের পরিণতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশে বিষাদময় কণ্ঠে বললেন "আমি এ প্রস্তাব সমর্থন

(1) Mosley 129 (2) Ibid 130

করছি কিন্তু আমার মনে আজ নিরানন্দের নিকষ কঠিন কালো ছায়া। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা যে অংশ নিয়েছি তাতে আমাদের সন্দেহ নেই যে আজকের পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই—এইটেই সব চেয়ে ভাল পথ। আমরা ক্ষুদ্র লোক—মহৎ কাজের জন্যে চেষ্টা করেছি। কাজটা মহৎ কাজেই তার চেষ্টার জন্যে মহত্ত্বের কিছু অংশ আমাদের উপর এসে পড়েছে।"

মিঃ জিন্নার কোন ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। ছোট্ট কথায় বললেন "আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট যে প্ল্যান আমাদের দিয়েছেন সেটা 'আপোষে 'মিটমাট' না 'নিষ্পত্তি' ? পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

সর্দার বলদেও সিং বললেন "এটা আপোষে মিটমাট নয় এটা নিষ্পত্তি। এ প্ল্যান সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে না—শিখ সম্প্রদায়কে ত নয়ই। তবুও এর মধ্যে কিছু আছে আমরা এটাই গ্রহণ করেছি।"

বড়লাট দেশের নেতাদের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি আদায় করিয়ে নিয়ে তাঁব রাষ্ট্রনীতির দালালির বা সওদাগবির কৃতিত্ব দেখালেন। কংগ্রেস তার আদর্শের এত বড় অধঃপতনেও কোন রকম প্রতিবাদ করতে পারল না অথচ তাদের কাছ থেকে কৌশলে জোর করে সম্মতি আদায় করে সুচতুর বড়লাট নিজের আখের ও কৃতিত্বের নজীর সৃষ্টি করলেন। রেখে দিলেন 'নব যুগের সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মত ভারতবর্ষকে'। ছারখার করে দিলেন ভারতবাসীর মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে বড়লাট জানালেন যে ১৯৪৮ সনের জুন পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন নেই তিনি ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শেষ করবেন।

ভারতের দুর্ভাগ্য সেদিনের কংগ্রেসকে ঠিক পথে চালিত করবার জন্যে চিন্তাশীল কোন নেতার আগ্রহ দেখা গেল না। তাঁরা নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষার দিকেই সচেতন হয়ে রইলেন। দেশ

বিভাগের আসন্ন ফল যে কি হতে পারে তা বোঝবার দূরদৃষ্টি তাঁদের খুবই ছিল। তবুও তাঁরা আপাত বক্তব্যের অন্তরালে নীরবে ইংরেজের কূটনীতিকে মেনে নিলেন। সেদিনের কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করে নি—যখন স্বাধীনতা এল তখন তাকে অখণ্ড ভাবে রক্ষা করবার উপায়ও তাদের ছিল না। ইংরেজ জোর করে দেশ ভাগ করে তাদের দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছে। যদি সেদিনের কংগ্রেস নিজ শক্তিতে নিজেদের সংগ্রামের পরাক্রমে স্বাধীনতা আনত, তা হলে ভারত চিরদিনই অখণ্ড থেকে যেত। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যাঁরা বীর তাঁরা বাহুবলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনতা ভোগ করেন। ভিক্ষুকের দাবি করবার কোন অধিকার নেই—সে দাবি সব সময় অগ্রাহ্য—যেমন সেদিনের কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের দাবি ইংরেজ অগ্রাহ্য করে দিয়েছিল। ভারতের এ স্বাধীনতা ভিক্ষার দান, এ স্বাধীনতা বীর্যশুল্কা স্বাধীনতা নয়।

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের খান ভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেসের শুধু সমর্থক নয়—একনিষ্ঠ কর্মী। গান্ধীজি যখন দেশ বিভাগ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না তখন খান আব্দুল গফুর খাঁ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন যে লীগ গভর্ণমেণ্ট তাঁর ও খোদাই খিদমতগারদের উপর কঠোর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠবে এবং তাঁর দেশের কংগ্রেস সমর্থকদের অবস্থা সঙ্গিন হবে। এখন কংগ্রেস যদি তাঁদের সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে লীগের দয়ার উপর তাঁদের ছেড়ে দেয় তা হলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হবে। (১) আসন্ন ক্ষমতা লাভের নেশার অন্ধ মোহে কংগ্রেস ন্যায় নীতির সম্পর্ক ঘুচিয়ে সেই নীরব একনিষ্ঠ সীমান্ত গান্ধীর আবেদনে কর্ণপাত করল না। বড়লাট অবশ্য উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে গণভোটের কথা

---

(1) Azad—India wins freedom p 193

বলেছিলেন কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ ও পূর্ববাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে সে রকম কোন কথা বললেন না। এর মধ্যেও যথেষ্ঠ চাতুরী ছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১২ই জুন দেশ বিভাগের একটা খসড়া প্রণয়ন করে ১৪ই ও ১৫ই জুন কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে সেটা পাশ করিয়ে দিলেন। প্রস্তাব উত্থাপন করলেন শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ। আজও মনে পড়ে সেদিনের কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সিন্ধুর কংগ্রেস নেতা শ্রীচৈতরাম গিধোয়ানী, শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, পাঞ্জাব প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ডাঃ কীচলু ও মৌলনা হাফিজুর রহমানের মর্মস্পর্শী বক্তৃতা—যেন জ্বালামুখী থেকে জ্বলন্ত লাভাস্রোতের মত বেরিয়ে এল ধিক্কার ও লাঞ্ছনা। তাঁরা পশু শক্তি ও হিংসাবৃত্তির কাছে বিকৃত রাজনৈতিক রুচির অন্তস্তলে কংগ্রেসের পরাজয়কে নির্মম ভাষায় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ও সমালোচনা করলেন। সেদিনের অসহায় কোন কংগ্রেস নেতাই তাঁদের এ বাস্তব নিষ্ঠুর আত্মঘাতী স্বীকৃতির দহন যজ্ঞের সমালোচনার যথাযথ উত্তর দিতে না পেরে গান্ধীজির শরণাপন্ন হলেন। তিনি বললেন "ওয়াকিং কমিটি যখন দেশ বিভাগ মেনেছেন তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের সেটা গ্রহণ করাই উচিত। তা যদি না হয় তা হ'লে জগতের লোক কি ভাববে? কাজেই তখন নেতৃত্ব নতুন লোকের হাতে গিয়ে পড়বে। কংগ্রেস অভিজ্ঞ লোকদের সহায়তা থেকে দেশ বঞ্চিত হবে। সেটা কাম্য হতে পারে না।"

অসঙ্গত সহানুভূতি—গান্ধীজি ভুলে গেলেন যে আজ যারা জঞ্জাল আবর্জনা, কাল তারাই শক্তিমান শাসন শক্তি। আজ যারা অনাদৃত, অনাগত দিনের তারা যুগ-সচেতন রাষ্ট্র গুরু—ভাবীকালের মানুষ বিপুল ভবিষ্যতের মহিমায় নতুন ফসল ফলাবার অধিকারী। প্রতিভা বিবর্তনের নিয়মে প্রতিভার প্রভাত সূর্য একদিন মধ্যাহ্ন দীপ্তির তেজে ভাস্বর হয়ে উঠে আর অতীত দিনের মধ্যাহ্ন সূর্য চলে

যায় অস্তাচলের পরপারে—এইটেই জগতের নিয়ম আবহমান কালের শাশ্বত সত্য।

সভাপতি আচার্য কৃপালিনী প্রস্তাব ভোটে দিলেন। ৩২ জন থাকলেন ভোটদানে বিরত প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭ আর বিপক্ষে ২৯ ভোট গৃহীত হ'ল।

মুসলিম লীগ ১০ই জুন তাদের প্রকাশ্য অধিবেশনে পাশ করাল দেশ বিভাগ সম্বন্ধে ৩রা জুনের প্ল্যান স্বীকৃতির প্রস্তাব। হিন্দু-মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি এ সময় দিল্লী অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করাল যে ভারত এক এবং অখণ্ড। যতদিন খণ্ডিত ভারত আবার অখণ্ড এক ভারতে পরিণত না হয় ততদিন তারা সংগ্রাম চালাবে। নেতৃবৃন্দ "পাকিস্তান বিরোধী দিবস" পালনের জানালেন আহ্বান। (১)

সত্যিই সেদিন ভারতের চরম দুর্দিন। গান্ধীজি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে 'মানুষের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ এক। সেজন্যেই পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্যে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফল ভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ 'অতীতে ও ভবিষ্যতে দূর দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।' তাঁর অন্তরের এ অখণ্ড বিশ্বাস সত্বেও সেদিন তিনি একা। 'বড় আদর্শ যাঁদের তাঁদের দুঃখের শেষ নেই—তাঁরাই ত ভবিষ্যৎ যুগ তৈরী করেন।' পণ্ডিত নেহরুর দূরদৃষ্টি ছিল তিনিও অন্তরের সঙ্গে বুঝেছিলেন যে ভারত বিভাগ মেনে নেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। তবুও তাঁর সহযোগিদের চাপে পড়ে তিনি নিরুপায় হয়ে গেলেন। অন্য নেতারা কর্তৃত্বের অন্ধ নেশায় পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থার দিকে একবারও তাকালেন না। বরং বললেন "পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হ'লে হিন্দুস্তানে

(1) Menon—382

মুসলমানদের উপর তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয়ের কোন কারণ নেই—ভারতে চারকোটি পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান আছে।" (১) কংগ্রেসের পক্ষে অহিংস নীতির নতুন ভাষ্যে অহিংস নীতি পরিমাণহীন পণ্ডতাতে পর্যবসিত হয়ে গেল।

পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে চলে গেল। সিলেটে ২৩৯,৬১৯ জন পাকিস্তানের পক্ষে ও ১৮৪,০৪১ বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

১৯৪৭ সনের ৪ঠা জুলাই ভারতের স্বাধীনতা বিল Indian Independence Bill হাউস অফ কমন্সে উত্থাপিত হ'ল। ১৫ই জুলাই সে বিল পাশ হয়ে ১৬ই হাউস অফ লর্ডসে পাশ হয়ে ১৮ই জুলাই সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে ১৯৪৭ সনের ভারতের স্বাধীনতা আইন বলবৎ হয়ে গেল।

আজও মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে বলেছিলেন "ভারত ইতিহাসের পরিচ্ছদ পরিবর্তন কালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের উপর রেখে যাবে আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণ সাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্ট বিশ্বাস—বহু কোটি নরনারীকে। রেখে যাবে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী। তবে আমাদের সেই চিরদৈন্য পীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্যে কাকে দায়ী করব ?" (২) কি গভীর দূরদৃষ্টি! কি যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশ!

যুদ্ধ চলার সময় আমেরিকা বার বার ইংরেজ সরকারকে চাপ দিয়েছিল ভারতবাসীদের সঙ্গে একটা সুমীমাংসা করবার জন্যে। আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধের সর্বময় কর্তা ছিলেন জেনারেল ম্যাক্ আর্থার —সৈন্য বাহিণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'পাঁচটি তারকার' অধিকারী। একমাত্র প্রেসিডেণ্ট ছাড়া তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কারও

(1) Azad 198 (2) Rabindranath—Kalantar.

ক্ষমতা ছিল না। শোনা যায় যুদ্ধ শেষ হবার প্রায় দশমাস আগে থেকে জাপান সরকার বার বার সন্ধির সর্তের জন্যে অনুরোধ জানাতে আরম্ভ করে কিন্তু জেনারেল ম্যাক্আর্থার বা ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাদেব সে অনুরোধে কর্ণপাত কবেন নি। তারপর হঠাৎ যখন হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা পড়ে ৭৮,০০০ ও নাগাসাকিতে ৭৪,০০০ লোকের জীবন শেষ হয়ে গেল—তখন সমস্ত জগৎ চমকে উঠল সেই পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতার ভয়াবহ পরিণতিতে। সকলেরই মনে প্রশ্ন উঠল কেন এই ধ্বংস লীলা? জাপান যখন পরাজয়ের পথে তখন এ বোমা ফেলার প্রয়োজন কি ছিল?

কোন আমেরিকান অফিসাবেব সঙ্গে আমার আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু পবিচয় ও হৃদ্যতা হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন "জাপান সন্ধিব সর্তের অনুরোধ কবে চলেছিল ঠিকই, কিন্তু তখন যদি 'বোস'কে আমরা বন্দী করতে পারতুম তবে যুদ্ধ তখনই মিটে যেত। জেনারল ম্যাক্আর্থার আশা করেছিলেন যে 'বোস' ঐ অঞ্চলেই আছেন তাই বোধ হয় বোমা ফেলা অনিবার্য হয়ে ওঠে। পবে অবশ্য জেনাবল ম্যাক্ আর্থার প্রেসিডেণ্টকে জানান যে তথাকথিত বিমান ধ্বংসেব পবেও তাঁকে পথে ঘাটে হোটেলে রেঁস্তোরায় দেখা যায়। Subhas Chandra Bose has escaped again. এ শোনা কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ অবশ্য শক্ত। যিনি আমাকে এ কথা বলেছিলেন সেটা হয়ত তাঁর নিজের অনুমান মাত্র। তিনি আরও বলেছিলেন যে "শুধু কোরিয়ার যুদ্ধের জন্যে নয়—এ কারণের জন্যেও জেনারেল ম্যাক্আর্থার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন।" নেতাজীর মৃত্যুর মতই অ্যাটম্ বোমা ফেলার কারণ ও জেনারল ম্যাক্ আর্থারের ক্ষমতাচ্যুতি আজও রহস্যাবৃত।

যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ চলা কালীন আমেরিকার অনুরোধ উপেক্ষা করে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায় নি—এখন তা' নিজেদের গরজেই দিতে স্বীকৃত হ'ল।

চোদ্দ

নেতারা দেশ ভাগ মেনে নিলেন কিন্তু তাকে কার্যকরী করবার সময় দেখা গেল সমস্যা। ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক প্রথম থেকেই সৈন্য বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি ভারতীয় বেতনভুক সৈন্যদের জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৈন্য বলে মনে করতেন তাই সৈন্য বিভাগের প্রস্তাব শুনেই তিনি অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও বড়লাটের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হলেন ধর্মের ভিত্তিতে সৈন্য ভাগ করতে। সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কংগ্রেস নেতারা এতদিনে বীর সাভারকরের দূরদর্শিতার কথা স্বীকার করলেন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দুই ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল হবার ইচ্ছে খুবই প্রবল ছিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিনা দ্বিধায় তাঁকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে মেনে নিতে রাজী ছিলেন। মিঃ জিন্না অনেক দিন টাল বাহানা করে শেষে জানালেন যে তাঁর নিজের পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হবার ইচ্ছে আছে। বড়লাটের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পরিচয় দিলেন মিঃ জিন্না।

এবার বড়লাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে দাঁড়ালেন স্যার কনরাড করফিল্ড। তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গকে নানা রকমের পরামর্শ দিতে লাগলেন যাতে তাঁরা হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষে করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে গোপনে সাহায্য করতে লাগলেন ইংরেজ সিভিলিয়ানরা। তাঁরা বুঝলেন যে

সম্রাটের অনুগ্রহে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করে ব্রিটিশ জাতকে সর্বরক
সাহায্য করেছেন তাই যাতে তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষে হয় তার চে
করা তাঁদের নৈতিক কর্তব্য।

ভূপালের নবাব বড়লাটের অভিপ্রায় অনুমান করে তাঁ
চ্যান্সেলার পদ ত্যাগ করে স্থির করলেন যে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চ
গেলেই তিনি নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তাঁর প্রজাদে
বেশীর ভাগই হিন্দু কাজেই স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে কংগ্রেসে
দয়ার উপরই তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হবে।

বড়লাট প্রথমটা দেশীয় রাজন্যবর্গকে নানা রকমের যুক্তি দেখি
পরে একরকম জোর করে তাঁদের বললেন যে তাঁদের হয় হিন্দুস্থা
না হয় পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। একদিকে স্যার করফি
তাঁদের স্বাধীনতার জন্যে উৎসাহ ও কুমতলব দিচ্ছেন আর অন্যদি
বড়লাট মেননের সাহায্যে অন্য কথা বলছেন। দেশীয় রাজন্যব
কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। বিকানীরের মহারাজ
ও অন্য কয়েকজন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার মনস্থ করে ফেললে
কিন্তু করফিল্ড তখন মহা উৎসাহে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে দেশী
রাজ্য কংগ্রেসের কুক্ষিগত না হয়। তিনি আগেই অনেক নথিপত্র
নষ্ট করে দিয়ে কয়েক জনের খুব সুবিধে করে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত
নেহরু এর জন্যে প্রকাশ্য সভায় বড়লাটের সামনে তাঁকে নিতান্ত
অভদ্র ভাষায় অপমান করলেন। মিঃ জিন্নাও তাঁকে মৃদু ভর্ৎসন
করলেন। তাঁর উপদেশে হায়দারাবাদের নিজাম ও ত্রিবাঙ্কুরে
মহারাজা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। স্যার করফিল্ড
অন্যান্য রাজাদের ঐ ভাবেই চলবার পরামর্শ দিলেন।

নিজাম চিরদিনই কংগ্রেস বিদ্বেষী কিন্তু তখনও ভারতের এব
ডিভিসন সৈন্য তাঁর রাজ্যে। স্যার ওয়াল্টার মংকটন স্যার
করফিল্ডের কথা মত সর্দার বলদেও সিংকে সৈন্য সরিয়ে নেবার
অনুরোধ জানালেন কিন্তু কোন ফল হল না। সর্দার প্যাটেল

বুঝলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গকে ভারতের মধ্যে আনতে একটি মাত্র লোক পারেন তিনি হচ্ছেন শ্রী ভি. পি. মেনন ; অন্যের দ্বারা এ কাজ অসম্ভব। মেনন ইংরেজ রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি থেকে অবসর নেবার সংকল্প করেছিলেন—কংগ্রেসের অধীনে বা ভারতীয়ের অধীনে তিনি চাকরি করতে অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত সর্দার প্যাটেলের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও বড়লাটের আদেশে তিনি সম্মত হলেন।

এবার বড়লাটের সঙ্গে স্যার করফিল্ডের আরম্ভ হ'ল বুদ্ধির লড়াই —বড়লাটের পাশে থাকলেন মেনন। মিঃ মেননের পরামর্শে বড়লাট ১৯৪৭ সনের ২৫শে জুলাই রাজন্যবর্গকে দিল্লীতে এক সম্মেলনে আহ্বান জানালেন। (১) তাঁদের বললেন যে তাঁদের হয় হিন্দুস্থান না হয় পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে আর সেই যুক্ত হবার সনদে (Instrument of accession) স্বাক্ষর করতে হবে। দিল্লীর সেই ১০৮''৪" গরমে ঘর্মাক্ত কলেবর রাজারা স্কুলের ছাত্রের মত বড়লাটের মিঠে কড়া অনুশাসন শুনতে লাগলেন।

বড়লাট সে সময় কোন মহারাজের দেওয়ানকে মহারাজার মত জিজ্ঞাসা করায় দেওয়ান বাহাদুর জানালেন যে তিনি তখনও পর্যন্ত কোন নির্দেশ পান নি। বড়লাট তবুও বললেন "আপনি ত তাঁর মনের কথা জানেন।" দেওয়ানজি ঘাড় নেড়ে না বললেন। বড়লাট সঙ্গে সঙ্গে তাঁর টেবিলের উপর থেকে কাঁচের কাগজ চাপাটা তুলে নিয়ে বললেন "এর ভেতর দিয়ে আপনার মহারাজার মনের কথাটা জানা যাবে।" তিনি সেটা তাঁর চোখের সামনে ধরে গম্ভীর হয়ে বললেন "আপনার মহারাজা সনদে সই করতে বলছেন।" (২) সকলেই হেসে উঠলেন গম্ভীর পরিবেশ লঘু হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিকানিরের মহারাজা সনদে সই করলেন। পরে এলেন বরোদার গায়কোয়াড়। তিনি সই করেই মেননের গলা জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মত ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। (৩) আর একজন সই

---

(1) Mosley 172 (2) Ibid 173 (3) Ibid 176

করেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। (১) একে একে অনেকেই সই করলেন কেবল হায়দারাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, ভূপাল, কাশ্মীর, যোধপুর, ইন্দোর ও জুনাগড়ের রাজা স্বাক্ষর করলেন না।

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার পি. সি. রামস্বামী আয়ার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে তাঁর মহারাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মেনন তাঁকে জানালেন যে তাঁর রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে ভারতসরকার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে না। মিঃ মেননের পরামর্শে সর্দার প্যাটেলের কংগ্রেস কর্মিরা ত্রিবাঙ্কুরে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। স্যার রামস্বামী একজন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে ভীষণ ভাবে ছুরিকাহত হলেন। বাধ্য হ'য়ে মহারাজা তার করে বড়লাটকে তাঁর সনদে স্বাক্ষর করার সম্মতি জানালেন—আন্দোলন বন্ধ হ'ল।

মিঃ মেনন ছিলেন ধুরন্ধর লোক। তিনি না থাকলে সর্দার প্যাটেলের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা অসম্ভব হ'ত। তাঁর গুপ্তচরেরা সংবাদ এনে দিল যে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পরামর্শে ও প্ররোচনায় যোধপুরের মহারাজা পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্যে মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করছেন। যোধপুরের মহারাজা হনওয়ান্ত সিং পোলো ও আনন্দ নিয়েই জীবন কাটাতেন। তিনি যশল্মীরের মহারাজাকে সঙ্গে করে মিঃ জিন্নার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন যে তাঁরা পাকিস্তানে যোগ দিলে কি কি সুবিধে পাবেন? সুচতুর মিঃ জিন্না সঙ্গে সঙ্গে একখানা সাদা কাগজ বের করে দিয়ে বললেন "আপনারা যে যে সর্ত চান লিখে দিন আমি সই করে দেবো।" (২)

যোধপুরের মহারাজা যশল্মীরের মহারাজাকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে এক সর্তে তিনি যোগ দিতে পারেন সেটা হচ্ছে যে তাঁর রাজ্যে হিন্দু মুসলমান বিরোধ বাধলে তিনি

(1) Mosley 176 (2) Ibid 177

নিরপেক্ষ থাকবেন এই সর্ত লিখিত ভাবে স্বীকার করতে হবে। মিঃ জিন্না মনে মনে বুঝলেন যে যশল্মীরের প্রজারা প্রায় সবই হিন্দু ; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে ও মহারাজার সৈন্যেরা নিষ্ক্রিয় থাকলে একজনও মুসলমান বাঁচবে না—তবুও তাতে কি এসে যায় রাজ্য ত পাকিস্তানের মধ্যে থাকবে এবং যদি এরকম পরিস্থিতি হয় তবে এ সর্ত উপেক্ষা করতে পাকিস্তানের দেরী হবে না। তাই মিঃ জিন্না তাতেই রাজী হয়ে গেলেন কিন্তু যোধপুরের মহারাজা এ কথাটা আগে চিন্তা করে দেখেন নি এখন তাঁর চৈতন্যোদয় হ'ল যে তাঁর হিন্দু প্রজা নিয়ে মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিপদ অনেক। তিনি বললেন যে এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে তিন স্থির করবেন। তাঁরা ফিরে এলেন এবং যোধপুরের মহারাজা দিল্লীতে তাঁর হোটেলে ফিরলেন।

মিঃ মেনন সমস্ত খবরই রাখছিলেন। সেদিন সন্ধ্যেয় তিনি যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হোটেলে গেলেন কিন্তু দেখা করার অনুমতি মিলল না কাজেই মেনন তাঁকে লিখে পাঠালেন যে বড়লাটের কাছ থেকে তিনি একটা জরুরী খবর এনেছেন। সাক্ষাতের অনুমতি মিলতেই মেনন মহারাজাকে জানালেন যে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বড়লাট তাঁকে একবার এখনই ডাকছেন। (১)

বড়লাট এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। মেনন মহারাজাকে অতিথিদের বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে বড়লাটকে সংবাদ দিলেন যে তাঁর একটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজন আছে —তখন মেননের প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ। বড়লাট সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শয়নকক্ষে ডেকে পাঠালেন—সমস্ত খবর শুনে তখনই মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য রক্ষা করে বললেন যে মহারাজার পাকিস্তানে যোগ দেবার যথেষ্ট

(1) Mosley—p 178

স্বাধীনতা আছে কিন্তু তিনি কি ভেবে দেখেছেন যে তাঁর প্রজাদের অধিকাংশই হিন্দু। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধলে তাঁর রাজ্যের কি অবস্থা হবে? (১)

মহারাজা বললেন যে মিঃ জিন্না তাঁকে একখানা সাদা কাগজ দিয়ে তাঁর সর্তাদি লিখে দিতে বলেছেন এবং তিনি সমস্ত সর্তই মেনে নিতে রাজী হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মেনন বললেন যে তাঁরাও একখানা সাদা কাগজ দিচ্ছেন এবং মিঃ জিন্নার মত সমস্ত সর্ত মেনে নিচ্ছেন। মিঃ জিন্না যেমন মিথ্যা আশ্বাস তাঁকে দিয়েছেন কংগ্রেসও তেমনি আশ্বাস দেবে। বড়লাটের মধ্যস্থতায় ঠিক হ'ল যে মহারাজাকে কয়েকটি বিশেষ সুবিধে দেওয়া হবে আর দু'একদিনের মধ্যে মেনন চুক্তিপত্র তৈরী করে তাঁর স্বাক্ষর করিয়ে নেবেন। এই বলে বড়লাট দু'জনের পিঠ চাপড়ে দিলেন। এমন সময় বড়লাটকে কোন প্রয়োজনে দু'এক মিনিটের জন্যে অন্য ঘরে যেতে হ'ল। সেই অবসরে মহারাজা মেননকে বললেন 'মিথ্যে কথা বলে আপনি আমাকে এখানে এনেছেন তার শাস্তি ভোগ করতে হবে।' এই বলে তিনি পকেট থেকে রিভলভার বের করে বললেন 'আপনাকে শেষ করে দেবো—আপনার কর্তৃত্ব আমি মানব না।' মেনন বললেন "আমাকে মেরে আপনি কি মনে করেন যে বেশী সুবিধে পাবেন—ছেলে মানুষী করবেন না।" বড়লাট এসে পড়লেন—এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন "এখন ছেলেমানুষীর সময় নয়। কখন চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবেন?" (২)

তিন দিন পরে মিঃ মেনন চুক্তি পত্র নিয়ে মহারাজার স্বাক্ষরের জন্যে যোধপুর গেলেন। রাজপ্রাসাদের প্রবেশ মুখে মেনন দেখলেন মারমুখী প্রায় লক্ষ লোকের জনতা তাঁর ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিচ্ছে। অতিকষ্টে মহারাজার দেহরক্ষীদের সাহায্যে মেনন মহারাজের কাছে গেলেন। মহারাজা জানালেন যে তিনিও প্রজাদের

---

(1) Mosley 178 (2) Ibid 179

নিয়ে আন্দোলন করাতে পারেন। যাই হোক্ মহারাজা তাঁর ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরের মাঝেই নিরুপায় হয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন।

কয়েকদিন পরে ভূপালের নবাবও স্বাক্ষর করলেন। জুনাগড়ের নবাবের তখন চারজন বেগম ও কয়েক ডজন উপপত্নী ও অনেকগুলি কুকুর। সাধের কুকুরগুলির জন্যেই নবাব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মেননের পরামর্শে নবনগরের জাম সাহেবের উপর সর্দার প্যাটেল নবাবের সঙ্গে আলোচনার ভার দিলেন। জুনাগড়ের প্রজাদের শতকরা ৮০।৯০ জন হিন্দু তবুও নবাবের পাকিস্তানে যোগ দেবার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সীমান্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা থেকে ২৪০ মাইল।

এ সময় মুসলিম লীগের আব্দুল কাদের মহম্মদ হোসেন নামে এক ধুরন্ধর জুনাগড়ে এসে নবাবকে পরামর্শ দিলেন যে তাঁর দেওয়ান নবী বকস্ তাঁর রাজ্যকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করবার পক্ষপাতী কাজেই তাঁকে পদচ্যুত করা প্রয়োজন। নবাবকে বোঝান হ'ল যে ভারতে যোগ দিলে তাঁর সাধের কুকুরগুলোকে কংগ্রেস শেষ করে দেবে— তার উপপত্নীদের নানারকমে নাজেহাল করে ভাতা বন্ধ করে দেবে —তিনি ইচ্ছেমত গিরজঙ্গলে সিংহ শিকার করতে পারবেন না। কিন্তু পাকিস্তানে যোগ দিলে তাঁর সকল বিষয়েই অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। (১)

এদিকে সর্দার প্যাটেল ও মিঃ মেনন জুনাগড়ের গড়িমসি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সংবাদ পত্রে জানলেন যে জুনাগাড়র নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। মিঃ জিন্না বুঝলেন যে এ সিদ্ধান্ত অসম্ভব কেননা জুনাগড়ের চারিদিকেই বরদা, গোণ্ডাল, ভবনগর প্রভৃতি ভারতে যোগদানকারী হিন্দুরাজ্য। কিন্তু নবাব সে কথা বুঝলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লিয়াকৎ আলিকে

(1) Mosley 184

ভারত সরকার তার করে জানতে চাইলেন যে পাকিস্তান জুনাগড়কে তার মধ্যে নিতে সম্মত কি না—কিন্তু কোন উত্তর এল না। লীগ নেতারা বুঝলেন যে এ ব্যাপারে কংগ্রেস অনেকটা গোলমালে পড়ে যাবে—তাঁদের তাতেই আনন্দ। শেষ পর্যন্ত অনেকদিন পরে পাকিস্তান সম্মতি জানাল।

দু' একদিনের মধ্যে দেখা গেল নবাবের অত্যাচারে দলে দলে হিন্দুরা জুনাগড় ছেড়ে চলে আসছে। জুনাগড়ের অন্তর্গত মংগ্রল রাজ্যের অধিবাসীরা ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চাইল। নবাব সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠিয়ে মংগ্রল ও বাবারিয়াদ রাজ্য দখল করলেন। (১) ভারতীয় সৈন্যেরাও মংগ্রলের দিকে চলল। কয়েকদিন অবরোধের পর ভারতীয় সৈন্যেরা রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতেই নবাব তাঁর চারজন বেগম ও রাজ্যের যাবতীয় ধনরত্ন ও তাঁর অনেকগুলি কুকুর নিয়ে বিমান বন্দরে এসে পৌঁছুলেন—নিজস্ব বিমানে ওঠবার সময় দেখা গেল একজন বেগম অসাবধানতায় তাঁর সন্তানকে রাজপ্রাসাদে ফেলে এসেছেন—তিনি নবাবকে একটু অপেক্ষা করতে বলে সন্তানের জন্যে প্রাসাদের দিকে ছুটলেন। নবাবের কাছে বেগমের চেয়ে কুকুর ঢের বেশী মূল্যবান তাই সেই অবসরে তাঁর বেগম ও সন্তানের জায়গায় আরও দুটি কুকুর নিয়ে পাকিস্তান রওনা হলেন। বেগম ও সন্তান জুনাগড়ে পড়ে রইল। (২) তাঁর কুকুর-প্রীতি যে অকৃত্রিম তা তিনি ব্যবহারে প্রমাণ করে দিলেন। ইংরেজ অনুগ্রহের পক্ষপুটে নিশ্চিন্ত নীরবে এই চরিত্রের লোকই জুনাগড়ের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা ছিলেন। নবাবের চেয়ে তাঁর ধনরত্নের দিকেই পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল।(৩) অনর্থের চেয়ে অর্থ ঢের বেশী কাম্য।

কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং প্রজাদের দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখতেন না। তাঁর বিলাসিতা, উপপত্নী ও সুন্দরী নর্ত্তকীদের নিয়েই সময় কাটত। মহারাজা কোন পক্ষে যোগ দেবেন না বলে

(1) Edwardes 194 (2) Mosley p 186 (3) Ibid.

মনস্থ করে বসেছিলেন। কংগ্রেস তাঁর দু'চোখের বিষ—কংগ্রেস নেতা শেখ আব্দুল্লা তখন বন্দী—তিনি কংগ্রেস কর্মিদের উপর তখন যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন—কঠোর হস্তে আন্দোলন বন্ধ করছেন—নেতাদের জেলে পাঠাচ্ছেন এমন কি পণ্ডিত নেহরু যখন কাশ্মীর যেতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁকেও গ্রেপ্তার করবেন বলে শাসিয়ে ছিলেন। তবুও পণ্ডিত নেহরু তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর মতামত জানবার মনস্থ করলেন। গান্ধীজি নিজে যেতে চাইলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়লাট নিজে গেলেন। তাঁর মনে কি ছিল জানা নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। দেশের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ মহারাজ হরি সিং এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুললেন। আরম্ভ হ'ল "কাশ্মীর ছাড়" ধ্বনি। (১) কাশ্মীর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সীমানায় কাজেই তার ভৌগলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান ইংলণ্ডের উপর চিরদিন নির্ভরশীল হবে সেজন্যে হয়ত বড়লাট মহারাজাকে পাকিস্তানে যোগ দেবার বুদ্ধি দিতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু এ ব্যাপারটা সন্দেহ করে নিজে যেতে চেয়েছিলেন বোঝাপড়া করবার জন্যে কিন্তু বড়লাট নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় তাঁকে বা গান্ধীজিকে যেতে না দিয়ে নিজে গেলেন। মহারাজ বড়লাটের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে বেরুলেন, যথেষ্ঠ আদর আপ্যায়ন করলেন কিন্তু ঠিক কাজের সময় মাথা ধরার অজুহাতে আলোচনায় যোগ দিলেন না। মহারাজ হয়ত বুঝেছিলেন যে কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁর নিত্য নতুন বিলাসিতা ও সাধের রিরংসা বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে।

নিজামও নিজের স্বাধীনতা রক্ষের জন্যে বড়লাটকে লিখিত ভাবে অনুরোধ জানালেন। সে সংবাদে মিঃ চার্চিল আনন্দ প্রকাশ করলেন। (২) নিজাম কিন্তু বিলাসিতায় সময় কাটাতেন না।

(1) V. Kumar—Anglo-American Conspiracs against Kashmir (Moscow 1954) p 66.

2) A. Millor—India Since Partition (London 1951) p 85.

তিনি মিতব্যয়ী ও কবি,—সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মুসলমান ধর্মের তিনি বিশেষ অনুরাগী। বড়লাট তাঁকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে বললেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতা তাঁকে অন্য রকম বোঝালেন। নিজাম ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পরামর্শে তাঁর সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন এবং রাজাকার নামে একদল গুণ্ডা দিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার আরম্ভ করিয়ে দিলেন। (১)

১৫ই আগষ্টের আগে জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দারাবাদ বাদে সব রাজ্যগুলিই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যাঁরা ২১ বা ১৯টি তোপের সম্মানের অধিকারী ছিলেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পতির মালিক হয়ে থাকলেন এবং বছরে ১৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৩৫,০০০ পাউণ্ড হিসেবে পেন্সনের অধিকারী হয়ে গেলেন। অন্যান্য রাজাদের রাজ্যের আয়তন ও আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পেন্সনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব মেননের। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে ছিলেন কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব মেননের—তিনি না থাকলে আজ ভারত বলকান রাজ্যে পরিণত হয়ে যেত। নিজের চাতুরি ও বুদ্ধি বলে তিনি সুচতুর বড়লাটকেও অনেক ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে দেন নি। বড়লাটের আন্তরিক পাকিস্তানপ্রীতি ও রাজনীতির দালালির গূঢ়-রহস্য একমাত্র মেননই ভেদ করতে পেরেছিলেন।

(1) Mosley p 191

পনের

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করার পর ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি এই আইন ইংলণ্ডের সংবিধান বিরোধী ও অসঙ্গত প্রমাণ করবার আয়োজন করলেন। তাঁরা মনে করলেন যে এ আইনকে নাচক করতে পারলে ভারত বিভাগ আপাততঃ বন্ধ হবে এবং বড় লাটের গূঢ় অভিসন্ধি ও স্বার্থসিদ্ধি বানচাল হয়ে যাবে। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা বাংলা দেশের একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার (বর্তমানে মাননীয় বিচারপতি)-কে দিয়ে প্রিভি কাউন্সেলে এ বিলের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপনের বন্দোবস্ত করলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সে গোপন সংবাদ জানতে পেরে তার প্রতিকূলতা করে সে চেষ্টা পণ্ড করে দিলেন। সেদিনের নেতারা তখন যে কোন প্রকারে কর্তৃত্ব হাতে নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—অনেকে বললেন বড়লাট নেতাজীর জন্যে শঙ্কিত হয়ে আছেন তিনি আত্মপ্রকাশ করলে তাঁর দেশ বিভাগ ব্যাহত হবে কাজেই তাঁর মতে সত্বর দেশ বিভাগই কাম্য।

দেশ বিভাগ মেনে নেবার পর দেখা দিল দু'দেশের সীমারেখা নির্ধারণ ও দেশের সম্পদ বিভাগের প্রশ্ন। পাঞ্জাবে তখন ১৬,০০০,০০০ মুসলমান, ১২,০০০,০০০ হিন্দু ও শিখ আর বাংলা দেশে ৩৩,০০০,০০০ মুসলমান ও ২৭,০০০,০০০ হিন্দু খৃষ্টান ও তফসিলী হিন্দু। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দু' দেশের সীমারেখা নির্ধারণ কমিটির সভাপতি হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ (বর্তমানে লর্ড র‍্যাডক্লিফ)-এর নাম প্রস্তাব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের নেতারা লণ্ডনে তাঁদের নিজেদের লোকের কাছে তাঁর সম্বন্ধে সংবাদ নিয়ে জানলেন যে তিনি শুধু খ্যাতিমান পুরুষই নন—অপক্ষ-

পাত বলে তাঁর সুনাম আছে। কাজেই তাঁর নিয়োগ সম্বন্ধে কোন পক্ষ থেকেই আপত্তি উঠল না।

স্যার র‍্যাডক্লিফ ১৯৪৭ সনের ৮ই জুলাই দিল্লী এলেন। তাঁকে বলা হ'ল যে তিনি শুধু দু'টো দেশের ভৌগলিক সীমারেখা টেনে দেবেন—সম্পত্তি ভাগ করার জন্যে অন্য কমিটি নিযুক্ত হবে। এই বিভাগ-কমিশনের তিনি সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন। বাংলা বিভাগের জন্যে তাঁর সঙ্গে দু'জন কংগ্রেস মনোনীত ও দু'জন মুসলিম লীগ মনোনীত সদস্য থাকবেন। মিঃ মশলে বলেছেন যে বাংলা দেশের চারজন সদস্যই মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি এবং সকলে (দু'জন বাদে) বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি।(১) মাননীয় ডাঃ বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় চারুচন্দ্র বিশ্বাস কংগ্রেসের পক্ষে এবং মাননীয় সালে মহম্মদ আক্রাম ও মানমীয় এস. এ. রহমান লীগের পক্ষে কমিশন সদস্য মনোনীত হলেন। আর পাঞ্জাব বিভাগের জন্যে মাননীয় মেহের চাঁদ মহাজন ও মাননীয় তেজা সিং কংগ্রেসের পক্ষে আর মাননীয় দীন মহম্মদ মুনীর লীগের পক্ষে মনোনীত হলেন। সম্পদ বিভাগ কমিশনের সভাপতি হলেন স্যার প্যাট্রিক্ স্পেন্স্।

স্যার র‍্যাডক্লিফ দিল্লী পৌঁছেই সেদিন সন্ধ্যায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। করলেন পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর সঙ্গে আলোচনা। বললেন যে তাঁকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তা' খুবই শক্ত ও জটিল। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, লোক সংখ্যা প্রচুর এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস এবং সব দিক লক্ষ্য রেখে জনস্বার্থ রক্ষে করে দেশকে বিভাগ করা খুবই কঠিন কাজ এবং সময় সাপেক্ষ। খুব ভেবে চিন্তে কাজ করতে গেলে কয়েক বছর সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু বড়লাট তাঁকে স্পষ্ট করে জানালেন যে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে

(1) Mosley p 194

তাঁর কাজ শেষ করতে হবে। স্যার র‍্যাডক্লিফ বুঝলেন যে এ বিভাগের পরিণাম কি ভয়াবহ—ভবিষ্যতে কত অসুবিধেরই না সৃষ্টি হবে।

স্যার র‍্যাড্‌ক্লিফ তাঁর প্রধান কার্য্যালয় দিল্লীতে রাখলেন এবং বাংলার জন্যে কলকাতায় ও পাঞ্জাবের জন্যে লাহোরে অফিস রাখার সিদ্ধান্ত করলেন। বাংলায় তাঁর কমিশন সদস্যেরা অকপটে জানালেন যে সভাপতির মতই বলবৎ হবে তাঁরা কোনদিনই একমত হতে পারবেন না। এখানে আইন বা দেশবাসীর সুবিধে অসুবিধের কথা নয়। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সবার উর্ধে। কাজেই একমত হওয়া অসম্ভব। পাঞ্জাবের সদস্যেরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেও অনিচ্ছুক, এমনকি মাননীয় বিচারপতি তেজা সিং মুসলমানদের সঙ্গে একঘরে বসতেও রাজী হলেন না। কয়েকদিন আগে রাওয়ালপিণ্ডিতে মুসলমানেরা পুলিশের সামনে ও রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় তাঁর স্ত্রী ও দুটি সন্তানকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান্স জেনকিন্স লীগ নেতাদের এ ব্যাপারের জন্যে মাননীয় বিচারপতির কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে বলেছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ লীগ নেতারা তাঁর প্রস্তাবে কান দেন নি।

বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ ও প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী হয় বাংলাকে স্বাধীন রাজ্য না হয় কলকাতাকে "মুক্ত সহর" করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা তাতে সম্মত হলেন না। বাংলার গভর্ণরের অসাধুতার নগ্নরূপ লোকচক্ষে ধরা পড়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তব্য বার বার বলতে আরম্ভ করলেন। গভর্ণর বললেন যে বাংলাকে ভাগ করলে দুটো জিনিস হবে। একটা হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তস্রোত বইবে আর দ্বিতীয়, পূর্ববঙ্গ চিরদিনই "পল্লী বস্তি" হয়ে থাকবে। শেষেরটার জন্যেই তাঁর যত চিন্তা। কিন্তু কলকাতায় কোন রক্তস্রোত বইল না। শেষ পর্যন্ত স্যার র‍্যাড্‌ক্লিফ বিভাগের কাজে মন দিলেন। খুলনার ও মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা পশ্চিম

বঙ্গে থাকবার জন্যে শেষ পর্যন্ত অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত হলেন—কিন্তু খুলনা পাকিস্তানেই রয়ে গেল।

পাঞ্জাবের অবস্থা তখন শোচনীয়। স্যার র‍্যাড্‌ক্লিফ লাহোরে পৌঁছে অবস্থা দেখে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে কোন মুহূর্তে দাবাগ্নির মত আগুন ছড়িয়ে পড়বে। সব পক্ষই দরখাস্ত, ম্যাপ, যুক্তি ও শেষ পর্যন্ত অর্থের প্রলোভন নিয়ে হাজির হলেন। (১) তিনি বুঝলেন যে কোন পক্ষেরই ম্যাপ ঠিক নয়। দেখলেন পাঞ্জাবের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা জলসেচ ব্যবস্থা। সমস্ত নদী ও খাল শিখদের রক্ত, অর্থ ও পরিশ্রমের বিনিময়ে হয়েছে। যদিও দেশ মুসলমান প্রধান তবুও শিখেরাই এই প্রদেশকে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শস্যশালিনী ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। প্রধান প্রধান নদীগুলিই পূর্ব পাঞ্জাবের দিকে। শিখদের পাঞ্জাব থেকে বঞ্চিত করা শুধু নির্দয়তার পরিচয় নয় ভবিষ্যতের তিক্ততা চিরস্থায়ী হবার কারণও বটে। তিনি বড়লাট, পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ জিন্নাকে জানালেন যে যদি পাঞ্জাবের জলসেচের ব্যবস্থাটা ভারত ও পাকিস্তানের যুক্ত ব্যবস্থা হয় তবেই দেশের মঙ্গল। মিঃ জিন্না সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বললেন "পাকিস্তান যদি মরুভূমিতে পরিণত হয় তবুও তিনি হিন্দুদের দয়ার উপর নির্ভর করবেন না।" এটাই হ'ল মিঃ জিন্নার অন্তরের সত্যিকারের পরিচয়। দেশ বা দেশবাসীর কল্যাণ কিছু নয়—তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রধান মন্ত্রিত্বের প্রলোভনই বড়। (২) তাঁরও বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না—এমনই গদীর মোহ। পণ্ডিত নেহরু বললেন যে ভারতের নদীর ব্যাপার ভারতেই থাক্। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত নেহরু অবশ্য তাঁর মানবতার প্রমাণ স্বরূপ যুক্ত জল সেচের চুক্তি ১৯৬০ সনে স্বাক্ষর করেছিলেন।

স্যার র‍্যাডক্লিফ ভারতের নেতাদের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্

(1) Mosley p 199 (2) Ibid

হয়ে গেলেন—বুঝলেন এদের না আছে কোন সুপরিকল্পিত প্ল্যান, না আছে দেশপ্রীতি। দেশ বিভাগ হলে কি করতে হবে এবং দেশকে বাঁচাতে গেলে কি কি প্রয়োজন তার প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত এ দেশের নেতাদের নেই। এঁদের কাছে কর্তৃত্বই বড়, দেশ বা দেশবাসীর সুখসুবিধে নগন্য। স্যার র‍্যাডক্লিফ ৯ই আগষ্ট পাঞ্জাবের বিভাগ রোয়েদাদ সম্পূর্ণ করলেন—একখানা বড় মানচিত্র নিয়ে পেন্সিল দিয়ে সীমা রেখা টেনে দিলেন—নাই বা রইল প্রাকৃতিক সীমারেখার কোন নদী বা পাহাড়। রয়ে গেল ১৪৩টি বিরোধের জায়গা। তিনি ১৫ই আগষ্ট ইংলণ্ড রওনা হলেন—পরে দুঃখ করে বলেছিলেন "অদ্ভুত দেশের লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন—strange chaps. Just didn't do their home work. (১)

বড়লাট গোলমাল বন্ধ করবার জন্যে রোয়েদাদ গোপন রেখে আরও ক্ষতি করলেন। মুখে বললেন বটে যে নরহত্যা বন্ধ করবার জন্যে সৈন্য মোতেয়ান রাখবেন কিন্তু কোন মতেই তা' বন্ধ করতে পারলেন না। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান জেনকিন্স বার বার বড়লাটকে জানালেন যে পাঞ্জাব ভাগ করলে অনর্থক রক্তস্রোত বইবে সেটা বন্ধ করার কোন উপায় থাকবে না। স্যার ইভানের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পাঞ্জাবে। তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসীদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। শিখদের শৌর্য ও বীর্যে তিনি ছিলেন মুগ্ধ—বুঝেছিলেন যে ভারতের সবচেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ পাঞ্জাব বিভক্ত হলে সে দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বার বার সেই কথাই পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নেতাদের বোঝালেন। দেশের সংবাদ পত্রগুলি না বুঝে তার বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করল যে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য কায়েম রাখবার জন্যে তিনি ষড়যন্ত্র করছেন—তবুও স্যার জেনকিন্স সমস্ত বিষয় জানিয়ে বড়লাটকে অনুরোধ করলেন যেন

(1) Mosley p 200

পাঞ্জাবের সর্বনাশ করা না হয়। কিন্তু বড়লাট তখন ভারতের নেতাদের মনের অবস্থাটা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছেন তার সুযোগ নিয়ে কিছুই করলেন না।

গিয়ানী কর্তার সিং গভর্ণরকে জানালেন যে অবিলম্বে লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—কিন্তু শিখ বা মুসলমান কেউই লাহোর ছাড়তে রাজী হলেন না। বড়লাট ২০শে জুলাই নিজে গেলেন লাহোরে—সকলের সঙ্গে দেখা করলেন তবুও ইচ্ছে করে কাজের কিছুই করলেন না। হয়ত তখন তিনি নিজের কথাই ভাবছেন যে যাহোক্ করে কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি না ফিরে গেলে নৌ বিভাগের সর্বোচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। সকলেই তখন নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত তবে লাহোর থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ফিরলেন তাতে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে রক্তপাত অনিবার্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়ে বললেন পাঞ্জাবের শান্তি রক্ষার জন্যে সৈন্য মোতেয়ান রাখতে হবে। এ কথা বলেই তিনি করলেন তাঁর কর্তব্য সম্পাদন। কিন্তু বড়লাট যদি সে সময় কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের নিয়ে পাঞ্জাব সফর করে লোকদের শান্ত থাকতে বলতেন তা হলে হয়ত এত নরহত্যা, গৃহদাহ হ'ত না। ইংরেজের চিরদিনের এ কলঙ্ক থেকে তিনি বাঁচতে পারতেন—ভারতের এত বড় শত্রুতা বোধ হয় অন্য কোন বড়লাট করেন নি। বড়লাট ২২শে জুলাই দু'দলের নেতাদের কাছ থেকে লোক দেখানো শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আশ্বাস লিখিত ভাবে আদায় করে তাঁর কাজ শেষ করলেন। নেতারা স্বীকার করলেন যে তাঁরা নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন অর্থ সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষে করবেন।

৩০শে জুলাই বড়লাট বাংলায় এলেন। মিঃ সুরাবর্দী আর একবার স্বাধীন বাংলার জন্যে শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বড়লাট তখন সুরাবর্দীর অবস্থা সম্যক্ জেনে ফেলেছেন। তিনি জেনেছেন

যে মিঃ জিন্না মিঃ সুরাবর্দীকে কোন প্রাধান্য না দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করেছেন কাজেই পাকিস্তানে সুরাবর্দীর কোন স্থান নেই। কলকাতার যে সমস্ত জায়গা গুণ্ডা ও দুষ্কৃতকারিদের প্রধান আশ্রয় সেগুলি সুরাবর্দীর নখদর্পণে আর সেগুলিই তাঁর শক্তির কেন্দ্র। বড়লাট তাঁর কোন কথাই শুনলেন না। বড়লাট লেঃ কর্ণেল টুকারের সঙ্গে দেখা করে জানালেন যাতে দেশ বিভাগের ফলে বাংলায় ১৬ই আগষ্টের মত নরহত্যা না হয়। লেঃ কর্ণেল টুকার তাঁকে ভরসা দিলেন।

গান্ধীজির এ সময় আর একবার নোয়াখালি যাবার ইচ্ছে ছিল। স্বাধীনতা উৎসবের সময় তিনি দিল্লী বা করাচিতে থাকতে চাইলেন না। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে এ দিন আনন্দের দিন নয় নিরানন্দের দিন। তিনি নোয়াখালি যাবার জন্যে কলকাতা এলেন। কিন্তু বাংলার গভর্ণর ও কয়েকজন মুসলমান নেতা তাঁকে কলকাতায় থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তখন মুসলমান পুলিশ অফিসাররা অধিকাংশই পাকিস্তানে চলে গেছেন কাজেই মুসলমানরা অসহায় হয়ে পড়েছে এবং তাদের হয়ে গভর্ণর তাঁকে বোঝালেন যে তিনি না থাকলে এখন হিন্দুরা গতবারের প্রতিশোধ নেবে এবং স্বাধীনতার সময় কলকাতা রক্তস্রোতে লাল হয়ে উঠবে। তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন যে গভর্ণরের ঔদাসীন্যে ও পরোক্ষ-প্ররোচনায় ১৬ই আগষ্টের নরমেধ যজ্ঞের আগুন জ্বলেছিল।

গান্ধীজি বুঝলেন লাটসাহেবের নির্লজ্জ দরদ কোনখানে। তিনি বললেন যে মুসলমানেরা যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে নোয়াখালিতে কোন রকমের গোলমাল হবে না তবেই তিনি কলকাতায় থাকবেন এবং নোয়াখালিতে কোন রকমের গোলমাল হলে অনশনে প্রাণ দেবেন। মুসলমানেরা গোপনে পরামর্শ করে অতিকষ্টে গান্ধীজিকে সেই প্রতিশ্রুতি দিলেন। লীগ নেতারা তখন বুঝেছেন যে

নোয়াখালিতে গোলমাল হ'লে কলকাতায় মুসলমান নিশ্চিহ্ন হ
যাবে। তখন সুরাবর্দী যে কোন প্রকারে কলকাতায় থাকতে চা
কেননা কলকাতার নৈশ ক্লাবগুলি ও অর্ধনগ্ন ইঙ্গ বঙ্গ মহিলাদে
সাহচর্য ও ঘৃণ্য রিরংসাবৃত্তি তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। (১
তাঁর প্রতিপত্তি তখন অস্তগমনোন্মুখ তাই তিনি কলকাতা ছাড়
রাজী নন। তিনি গান্ধীজির কাছে আত্মসমর্পণ করতে গান্ধীজি
বললেন যে তাঁকেও তাঁর পাশে থাকতে হবে। সুরাবর্দীর তখ
রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে হায়দারি ম্যানসন নামে পরিত্যক্ত
বাড়ীটিতে থাকবার মনস্থ করে গান্ধীজি সুরাবর্দীকে জানালেন
চারিদিকে বস্তির নোংরা দুর্গন্ধ ময়লা জল ও পাঁক, আশে পা
দেশী মদের দোকান—দুষ্কৃতকারীদের গোপন আস্তানা, মশা মাছি
নানা রকমের আবর্জনাব মাঝেই গান্ধীজি থাকতে চাইলেন। (২
সুরাবর্দীও তাঁর সঙ্গে থাকলেন—কিন্তু সে জন্যে তাঁকে কম দুর্ভোগ
বইতে হ'ল না। জনতার আক্রমণ থেকে সুরাবর্দীকে রক্ষে করতে
গিয়ে তাঁকে নাজেহাল হতে হ'ল কিন্তু গান্ধীজির ব্যক্তিত্বেরই
হ'ল জয়।

আর পাঞ্জাবের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বড়লাট ১লা আগষ্ট
থেকেই শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালা, শেখপুরা, লয়ালপুর, মণ্টো-
গোমারি, লাহোর, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর,
ফিরোজপুর ও লুধিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে সৈন্য মোতেয়ান করলেন।
সৈন্যেরা মেজর জেনারেল রীজের অধিনায়কত্বে রইল। তাঁকে
সাহায্য করবার জন্যে ভারতের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার দিগম্বর সিং ও
পাকিস্তানের পক্ষে কর্ণেল আয়ুব খাঁ নিযুক্ত হলেন। বড়লাট মৌলানা
আজাদকে আশ্বাস দিয়ে বললেন সৈন্য মোতেয়ান আছে কোন
লোকক্ষয় হবে না। গভর্ণর স্যার জেনকিন্স বড়লাটকে বললেন

(1) Mosley p 220 (2) Ibid 222

যে পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলকে ধরে যদি রোয়েদাদের আগে লাহোরের দাবী ভারত ত্যাগ করে তাহলে লাহোরের পরিবর্তে মিঃ জিন্নাকে দিয়ে মণ্টেগোমারি জেলা পূর্ব পাঞ্জাবে দেওয়া সম্ভব হবে এবং তার ফলে লয়ালপুরের হিন্দু ও শিখেরা সেখানে বাস করতে পারবে আর মুসলমানেরা লয়ালপুরে থাকতে পারবে। (১) কংগ্রেস নেতারা সে প্রস্তাব ভাল করে বিবেচনা করার আগেই না করে দিলেন—ভালোমন্দ যাচাই করবার তখন তাঁদের সময় কম। সবাই আশা করতে লাগলেন যে রোয়দাদে লাহোর ভারতের ভেতর আসবে।

মিঃ জিন্না কোন দিন আশা করতে পারেন নি যে তাঁর জীবদ্দশায় পাকিস্তান হবে তবুও পাকিস্তান পাবার আনন্দে হয়ত লাহোরের পরিবর্তে মণ্টেগোমারি জেলা দিতে রাজী হতেন কিন্তু বড়লাট কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিঃ জিন্নাকে কিছুই বললেন না। মেনন বড়লাটকে বললেন যে মিঃ জিন্নাকে অনুরোধ করে যদি লাহোরের বারো মাইল উত্তরে শিখদের পীঠস্থান নানকানা-সাহেব মহামান্য পোপের ভেটিক্যান সহরের মত করা যায় ত শিখরা অনেক পরিমাণে শান্ত থাকবে। বড়লাট ও তাঁর পারিষদবর্গ জানতেন যে নানকানা সাহেব শিখদের পবিত্র তীর্থ তবুও তিনি কিছু করলেন না। তখন বড়লাটের আর মেননকে প্রয়োজন নেই। তাঁর কার্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেননের গৌরবও অস্তমিত। ২৭শে জুলাই শিখেরা কোন রকমে সংবাদ পেয়ে গেল যে নানকানা সাহেব পাকিস্তানে চলে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তারা সংগ্রামের জন্যে তৈরী হয়ে গেল। বৃদ্ধ তারা সিং বরাবরই তাদের উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে ৭ই আগষ্ট থেকে তাঁরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। দু'পক্ষেরই অস্ত্রাদি সংগ্রহ হয়ে গেল—সৈন্যরাও দিল গোপন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

(1) Mosley p 212

বড়লাট সমস্ত জেনে শুনেও এ হাঙ্গামা বন্ধ করবার কোন চেষ্টা করলেন না। তখন হিন্দু ও শিখরাও নিজেদের ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় ক্ষিপ্তপ্রায়।

আজও মনে পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মনীষি রোঁমারোঁ্যালার বাণী, "আমরা পশ্চিমের লোকেরা বিকট জাতীয়তার অতি সাংঘাতিক অপব্যবহার, ভ্রান্তি ও অপরাধের কুফল মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। কাজেই আশা করি, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা যে জিঘাংসা ও হত্যানীতির অনুসরণ করেছে ভারতবর্ষকে সে বন্ধুর পথে চলতে হবে না। আমরা ভারতের কাছে আরও আশা করি যে ভারতবাসী উর্ধতর মানব সভ্যতার জন্যে এক বিরাট আদর্শ স্থাপন করে যাবে আর পৃথিবীর সর্বমানবতার জন্যে একদিন সমস্ত ধর্ম, শক্তি ও ভাবের এক মহৎ সমন্বয় বিধান করবে। * * ভারতবর্ষ সেই পবিত্র দেশ—যে দেশ থেকে সভ্যতা ও মহৎভাবের আনন্দময় স্রোতের ঢেউ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে ভাবে ও সম্পদে উন্নত করে পুনরুত্থানের শক্তি দান করেছে।" কিন্তু কোথায় তলিয়ে গেল মহাপুরুষের সে আশা!

৬ই আগষ্ট দিল্লীর লাল কেল্লায় দু'পক্ষের সৈন্যদের হ'ল বিদায় সম্মেলন। ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে ভারতের নতুন প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা ও কয়েকজন ব্রিটিশ সেনা নায়ক উপস্থিত ছিলেন। সে অনুষ্ঠানে পণ্ডিত নেহরু ও বলদেও সিং ছিলেন অতিথি। কারিয়াপ্পা বিদায়ী বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন যে উভয় দেশের সৈন্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে। দু'পক্ষের বন্ধুত্ব যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। পাকিস্তানের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার রেজা তার উত্তর দিলেন—অনুষ্ঠানটি হ'ল সর্বাঙ্গ সুন্দর।

৭ই আগষ্ট মিঃ জিন্না স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্যে করাচি রওয়ানা হলেন। বড়লাট তাঁর জন্যে সরকারি ডাকোটা বিমানখানির

বন্দোবস্ত করে দিলেন আর উপহার স্বরূপ তাঁর নিজের রোলস্ রয়েস গাড়ীখানি ও তাঁর এ. ডি. সি. লেঃ হাসানকে দিলেন। দিল্লী ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে মিঃ জিন্না হিন্দু মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে অতীত ভুলে যেতে বললেন ও করলেন ভারতের শুভ ও সমৃদ্ধি কামনা। পরদিন সর্দার প্যাটেল যা' বললেন তাতে যেন মিঃ জিন্নার মুখে এক বালতি জল ঢেলে দেওয়া হ'ল। সাধারণ শিষ্ঠাচার বিসর্জন দিয়ে তাঁর পুরানো অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে বললেন যে ভারতের শরীর থেকে বিষ বেরিয়ে গেছে এখন আমরা এক এবং অখণ্ড। সমুদ্র বা নদীর জল যেমন ভাগ করা যায় না তেমনি মুসলমানদের সব কিছু ভারতেই রইল। অল্পদিনের মধ্যে তাদের ভারতে ফিরে আসতে হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এ পরিণতি হয়ত গান্ধীজি কোন দিন কল্পনাই করতে পারেন নি। মিঃ জিন্নার শুভেচ্ছা বাণীর উত্তরে কংগ্রেস নেতার এ কথা শুনে মিঃ জিন্না ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠলেন।

৯ই আগষ্ট সংবাদ পাওয়া গেল যে লালকেল্লায় সম্বর্ধিত পাকিস্তানী সেনানায়কদের ট্রেণে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছে আর পাকিস্তানের ১৫০ জন সরকারি কর্মচারির পরিবারবর্গও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল। তার উপর বড়লাট যদি স্যার র‍্যাড-ক্লিফের রোয়দাদ সঙ্গে সঙ্গে জানাতেন তা হলে সকলেই নিজ নিজ এলাকায় এসে পড়তে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে সেটা চেপে বসে থেকে দু'দেশেরই করলেন অবর্ণনীয় ক্ষতি।

ষোল

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস থেকে নভেম্বরের মধ্যে পাঞ্জাবে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তার বীভৎসতা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। চেঙ্গীস খাঁর মত আধুনিক রাষ্ট্রীয় উন্মাদনার যূপকাষ্ঠে বলি পড়ল লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী। আর কত যে নিরপরাধ ও শিশু অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল তা হয়ত কোন ঐতিহাসিকই কল্পনা করতে পারবেন না। সভ্যজাতির ইতিহাসে এর তুলনা মেলা অসম্ভব। লাহোর, অমৃতসর, লয়ালপুর ও ডেরা ইস্‌মাইল খাঁর জায়গা জায়গা শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল।(১) দলে দলে লোক দেশ ছেড়ে চলল প্রাণের ভয়ে শেষ সম্বলটুকু সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে। পথের মাঝে হ'ল অতর্কিত আক্রমণ—অসহায় মানুষের কান্নার রোল উঠল আকাশে। চলার পথ মানুষের রক্তে পিছল হয়ে গেল। শিশুদের শূন্যে তুলে আছাড় মেরে শেষ করে দেওয়া হ'ল। যুবতীদের ধরে নিয়ে পাশবিক অত্যাচারের পর স্তন কেটে ফেলে দেওয়া হ'ল।(২) সভ্যজাতির সভ্যতার নিদর্শন—সুন্দরী যুবতীদের বিবস্ত্রা করে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল দুধারে লোক দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ উপহাস ও বিদ্রূপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে এমন একজন মানুষও দেখা গেল না যিনি জননী ও ভগিনীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন। রেল ষ্টেশনগুলো তখন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সম্প্রদায়ের রেলকর্মি অন্য সম্প্রদায়ের সহকর্মির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে হিংস্র বাঘের মত। এমন কি বেলুচী সৈন্য ও হিন্দু ডোগরা সৈন্যদের মধ্যেও চলল গুলি বিনিময়।(৩) ৩০০,০০০. হিন্দু ও শিখ

---

(1) M. S. Vairanapillai—Are we two nations p XXI—XXII

(2) Mosley ch. VIII

(3) V. P. Menon—Transfer of power in India p 418—22

অধিবাসীদের অধিকাংশ লাহোর ছেড়ে চলে এল। পাঁচ হাজারের কম লোক রইল পড়ে—আরম্ভ হ'ল তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার। পরশ্রীকাতর নীচ ব্রিটিশ কর্মচারীরা প্রকাশ্যে তাদের সাহায্য করতে লাগল। (১)

যারা অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পালিয়ে এল তাদের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা মাত্র প্রতিহিংসার আগুন উদগ্রমূর্তিতে উঠল জ্বলে। লাহোর, লয়ালপুর ও অন্যান্য জায়গার অবর্ণনীয় অত্যাচারের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী, রাজপুতানা, আলোয়ারে আরম্ভ হয়ে গেল অনুরূপ ঘটনা। ক্রোধোন্মত্ত বাস্তুহারার দল বীভৎস প্রতিহিংসা পরায়ণ জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে লাগল অন্য সম্প্রদায়ের উপর। পাশবিকতায় হিন্দু মুসলমান কোন প্রভেদ রহিল না। পাকিস্তানে লীগ, রাজাকার ও ন্যাশনাল গার্ড আর ভারতে আকালী শিখ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ দেশের সর্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে তুলল। সেই মসীধূমকেতন পল্লী অঞ্চল থেকে দলে দলে মুসলমান বাস্তুহারার দল চলল পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে আর দয়াহীন দুর্গম পথে হিন্দু বাস্তুহারা চলল ভারতের দিকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে। কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না—দেবতা আছেন ভবিষ্যতে—মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

শিখদের মধ্যে জাঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা দুর্ধর্ষ—তারা ধর্মান্ধতা ও হীনমন্যতায় নির্মমভাবে মুসলমানদের ধন প্রাণ নষ্ট করতে লাগল। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেরাও নির্দয়তার সঙ্গে শিখ নিধন আরম্ভ করল। তবে শিখদের চেয়ে তাদের শঙ্কা হীন আসল লক্ষ্য ছিল শিখদের সম্পত্তি ও যুবতীদের উপর—'অনাদি ক্ষুধার লেলিহান লোল জিহ্বা—ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা।'

(1) M. S. Vairanapillai—Are we two nations XXII—XXIV

দিল্লী লাহোরগামী ট্রেন ভর্তি মুসলমানদের রক্তাক্ত মৃতদেহ এসে পৌঁছুল—গাড়ীর গায়ে লেখা ছিল "পাকিস্তানকে উপহার" আর লাহোর থেকে দিল্লীগামী ট্রেণে অনুরূপভাবে লেখা ছিল "ভারতকে উপহার।" পাশবিকতার প্রতিযোগিতায় মানুষ চিরদিন পশুকে হার মানিয়েছে। ভারতের ঐতিহ্য সেদিন ধূলায় লুণ্ঠিত।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি থেকে ১৮৪৭ সনের পর প্রথম ইউনিয়ন জ্যাক্ ১৩ই আগষ্ট নামান হ'ল তার জায়গায় উড়ল ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। প্রধান সেনাপতি সেটি ইংলণ্ডের সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন উইণ্ডসর দুর্গের যাদুঘবে সেটিকে রক্ষা করা হ'ল। ১৪ই আগষ্ট লাহোর বিমান বন্দরে তিনজন মিলিত হলেন—প্রধান সেনাপতি, মেজর জেনাবল রীজ ও পাঞ্জাবের গভর্ণর। প্রধান সেনাপতি দিল্লী থেকে বিমানে আসবাব সময় দেখে এলেন অগণিত নরনারী রাস্তা ধরে চলেছে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলছে—ধোঁয়ায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—সহরের অলিতে গলিতে আগুন। 'দাবাগ্নি বেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয় নিনাদের মত' মানুষের আর্তনাদ। তিনজনে আলোচনা করলেন কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। সেই হিংসা কণ্টকিত অন্তহীন ধর্মান্ধতার পঙ্ক-স্রোতের ঘূর্ণতাণ্ডবী উন্মাদনার মধ্যে নির্বাক দর্শক হয়ে রইলেন। জেনারেল রীজ ও তাঁর পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজ যাদের উপর বড়লাট এতদিন ধরে ভরসা করে এসেছেন তারা কিছুই করতে পারল না। প্রধান সেনাপতি মর্মাহত হয়ে গেলেন।

এই হস্তান্তর কাজের পুরস্কার স্বরূপ বড়লাট আর্ল উপাধিতে ভূষিত হবেন বলে সংবাদ এল। বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে ব্যারণ ও লর্ড ইসমেকে K. G. S. I. উপাধি দেবার সুপারিশ করবেন বলে স্থির করেছেন জেনে দু'জনেই অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু দু'জনের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ ক্ষমতা হস্তান্তর ইংরেজের পক্ষে গৌরবের বা সম্মানের নয় বলে লর্ড ইসমে বললেন তাঁর

সম্মান নিষ্প্রয়োজন। আর প্রধান সেনাপতির কারণ হল যে তিনি ও তাঁর সৈন্যদল থাকতে বীভৎস নরহত্যা, মর্মন্তুদ গৃহদাহ, নিষ্ঠুর নারী নির্যাতন নিজের চোখে দেখেও বন্ধ করতে পারলেন না। আর দেখলেন তাঁর স্বজাতীয়দের কীর্তিকলাপে কেমন করে ব্রিটিশ জাতির গালে চুণকালি পড়ছে। নিদারুণ মর্মদাহে তিনি নিজেকে কোন উপাধির উপযুক্ত বলে মনে করতে পারলেন না। তবুও একজন ইংরেজকে মানুষের মত মানুষ দেখা গেল।

তারপর যখন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর স্যার ফ্রান্সিস মুদীর মিঃ জিন্নাকে লেখা পত্রখানার কথা শুনলেন তখন তিনি লজ্জায় মরে গেলেন—লেখা ছিল I am telling every one that I don't care how the sikhs get across the border ; the great thing is to get rid of them as soon as possible ইংরেজ সভ্যতার এ শোচনীয় পরিণতি সত্যিই মর্মস্পর্শী। পণ্ডিত নেহরুর পরম শ্রদ্ধাভাজন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এ চিঠির কথা জানলেন কিন্তু কিছুই করলেন না। আপন জয়ের আনন্দে বহু অপমানে দীক্ষিত ভারতবাসীর কথা চিন্তা করবার তাঁর সময় ছিল না। কোথায় গেল তাঁর মৌলানা আজাদ ও স্যার জেন্‌কিন্স্‌কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ?

সেদিনের নেতারা তাঁদের বুদ্ধি, হৃদয় ও কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ও অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজের চক্রান্তের কাছে কিছুই করতে পারলেন না।

সরকারি হিসেবে দেখা গেল পাঞ্জাবে ৬০০,০০০ লোক নিহত ১৪০০০,০০০ লোক গৃহহারা ও ১০০,০০০ অপহৃতা যুবতী ধর্ষিতা বা ধর্মান্তরিতা তাদের নীলামে বিক্রি করা হয়েছে। মুসলমানেরা জানে যে অপহৃতা হিন্দু নারীদের সংস্কারান্ধ হিন্দুরা সমাজে নেবে না কেননা তাদের সতীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে।

আজও মনে পড়ে বিশ্ব কবির কথা—"মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে তেমন আর

কিছুতে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে তার সংখ্যা নেই সে বলি কেবল মাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। মানুষ ধর্মের নাম করে নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করার নিত্য অধিকার দাবী করে ভারবাহী বলদের মত জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা বয়ে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছে। মানুষ ভুলে যায় যে কল্যাণের আরাধনা মানুষের কোন অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয় মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি।"

অগণিত অসহায় নিরপরাধ নরনারীর জীবনোৎসর্গ, মর্মন্তুদ হাহাকার ও লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিতা রমণীর দীর্ঘশ্বাস ও রক্ত প্লাবনের পঙ্কিল পথে ধর্ম বিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্ত কলুষিত বীভৎসতার মধ্যে ১৫ই আগষ্ট হ'ল ভারতের স্বাধীনতার সূর্যোদয়। যুদ্ধোত্তর যুগের সভ্যতাভিমানী ইংরেজের কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়ে রয়ে গেল খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ। নির্বিকার মহাকাল শুধু চেয়ে রইল অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ইতিহাসের দুর্গম দূরত্যয় পথে অহল্যার মত শাপমোচনের নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

জয়হিন্দ্

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	২৪	বিটিশ	ব্রিটিশ
৪১	২০	১৯৪৯	১৯৪০
৪৬	১০	বেত্রাঘাতে	বজ্রাঘাতে
৪৬	১৮	১৯৪০	১৯৪১
৪৭	২১	গ্রন্থাগারে	গ্রন্থাকারে
৬০	১	রুজভেল্ড	রুজভেণ্ট
১৬০	২০	বিরুদ্ধে	জন্যে
১৬৪	৩	চিরদিনেব	চিরদিনের
১৭০	২	পণ্ডিত নেহরু ভাবলেন লীগই তারই প্রমাণ	লীগই তার প্রমাণ— পণ্ডিত নেহরু ভাবলেন
১৭২	১৯	সংবাদ পত্রিকার	সংবাদ পাত্রিকের
১৭৭	৬	সন্মতি	সম্মতি
১৮২	১৯	মন্ত্রী	মন্ত্রী

যে যে গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে সংকলিত হইয়াছে

A Bunch of old Letters
A, curren—Militant Hinduism in Indian Politics.
A. Millor—India Since Partition.
Amrita Bazar Patrika—Independence Number.
Azad—India Wins Freedom.
Banker--London
B. C. Ghosh—A study of Indian Money Market.
Bombay Labour Gazette
Bombay Chronicle
Brecher Michael—A Political Biography
Coupland Sir Reginald—The Constitutional Problem in India.
D. G. Tendulkar--Life of Mohondas Karamchand Gandhi.
G. D. Khosla—Stern Reckoning.
Harijan
Hector Bolitho—Jinnah
Hindusthan Standard
Hindusthan Times
Hiren Mukherjee—The Gentle Colossus.
Hugh Toyes—The Leaping Tiger.
India Review of Commercial Conditions.
Jayasree
Kali Charan Ghosh—The Roll of Honour
Khaliquzzaman—Pathway to Pakistan.
K. L. Punjabi—The Indomitable Sardar.
Leonard Mosley—The Last days of British Raj.
Leverkuchan P—German Military Intelligence.
Louis Fischer—Gandhi—His Life and Message for the world
Masani—The Communist Party of India.
Michael Edwardes—The Last years of British India.
M. K. Gandhi—The Story of my Experiment with Truth.
Modern Review
M. S. Vairanapillai—Are we two nations ?

Nehru—On Gandhi.
N. G. Ranga—Kishan Hand Book.
N. K. Bose—My days with Gandhiji.
On to Delhi
Pratap
R. C. Majumder—History of Freedom Movement.
R. Palme Dutt—India to-day
Shaw Nawaj—My memories of the I. N. A and its Netaji
Statistical year book of League of Nations.
Subodh Chakravorty—Bilplabi Bangalee
Survey of Current Business.
Tarini Sankar Chakravorty—India in Revolt.
The Dhyan Sagar
The Eastern Economist
The Times of India
Thivy
V. P. menon--Transfer of Power in India.
V. P. Balabushevich—A Contemporary History of India.
V. Kumar—Anglo American Conspiracy against Kashmir.

ক্রমিক বর্ণসূচী

অ

আ

ই

উ

এ

ঐ

ও

ক

খ

প

ফ

ব